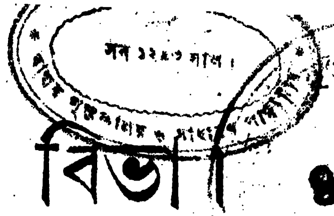
౪౨౦/2

Shikdar Bagan
Bandhab Pustakalaya
Public and Reading Room.



বিভা

৪১০।২

[২য় খণ্ড   সন ১২৯৫ সাল   ১ম, ২য় সংখ্যা]

মহাকাব্যের পার্থক্য।

আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে দার্শনিক তত্ত্ব সমুদায়ের বিকাশ ও প্রসারণ বিশাল মহাভারত ও রামায়ণ, ব্যাস তাহা ভগবদ্গীতায় বিবৃত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা মহাভারতের মেরুদণ্ড ও অস্থি স্বরূপ। গীতার সম্প্রসারণই মহাভারত। মহাভারত স্থূল দেহ, গীতার তত্ত্বসমুদায় তাহার আত্মা। গীতার সহিত মহাভারতের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ট, এতই গভীর ও এতই নিগূঢ়। গীতার স্থূল বিকাশ শুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণ ও তাহার স্থূল বিকাশ। তবে রামায়ণের সহিত মহাভারতের যে বাহ্য পার্থক্য আপাততঃ প্রতীত হয়, তাহা ব্যাস ও বাল্মীকির কল্পনার পার্থক্য জন্য। বিষয় এক হইলে কি হইবে, কল্পনাকারী [illegible]ত এক নহে। গ্রন্থকারের পার্থক্য জন্য বিষয়-কল্পনার পার্থক্য। "মহাকাব্যের সাদৃশ" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি, একই বিষয় ব্যাস এবং বাল্মীকির কল্পনায় কেমন বিভিন্ন আকারে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের কল্পনার যে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে, "বনবাস" নামক প্রবন্ধে তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাবে ব্যাস ও বাল্মীকির পার্থক্য আরও কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

ব্যাস "কৃষ্ণচরিত্রে" নারায়ণাংশ কাব্যমধ্যে পৃথক রাখিয়াছেন। মহাভারতীয় মহাব্যাপার মধ্যে নারায়ণ কেমন নিগূঢ় ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাহা আমরা কৃষ্ণচরিত্রে দেখিতে পাই কিন্তু সেই নারায়ণাংশ বাল্মীকি "রামচরিত্রে" প্রক্ষেপ করিয়াছেন। রামচরিত্রে যে দ্বিভাব বর্ত্তমান, সেই দ্বিভাব বিশ্লেষণ করিয়া

স্বতন্ত্র রূপে তাহা দেখাইবার জন্য ব্যাস দুইটি স্বতন্ত্র চরিত্রের কল্পনা করিয়াছেন। সেই দুইটি চরিত্র—কৃষ্ণ ও [illegible]নি বাল্মীকির রাম-চরিত্র বুঝিতে চান, তিনি একদা কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই কৃষ্ণ, সেই যুধিষ্ঠির রামচরিত্রে সংশ্লিষ্ট। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির রূপে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন; কিন্তু তাঁহার আত্মবিস্মৃতিতে নারায়ণের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

বাল্মীকি শুদ্ধ রামচরিত্রে এই নারায়ণাংশ প্রক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। রামায়ণের প্রথমাংশে আমরা রামচরিত্রে যে নারায়ণের অংশ দেখিতে পাই, ক্রমে যখন সীতাহরণের পর কার্য্য পরম্পরায় কাব্য-ব্যাপার ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন রামচন্দ্রকে বীরকার্য্যে শূর রূপে ব্যাপৃত হইতে হইল, যখন তাঁহাকে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সঙ্গে মাতিয়া মহা বৈরনির্য্যাতন কার্য্যে অনুলিপ্ত থাকিয়া নররূপে অনুষ্ঠান করিতে হইল, যখন তাঁহাকে বীরগণের মধ্যে কাব্যকল্পনায় হারাইতে থাকি, তখন তাঁহার নারায়ণাংশ কবি অন্য এক চরিত্রে ফুটাইতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র বীর, মহাবীর, শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর। তখন তিনি মহা বৈরব্যাপারে অনুলিপ্ত। তাঁহার নারায়ণাংশ কার্য্যপরম্পরায় আচ্ছন্ন। তখন সেই নারায়ণাংশ অন্য এক চরিত্রে দেখা দিল। সেই চরিত্র হনুমান। নারায়ণাংশ তখন হনুমানে কার্য্য করিতে লাগিল। নারায়ণের সংসারচক্রের চক্রিতা তখন হনুমানের বুদ্ধিকৌশলে উদ্ভাসিত হইল। এই হনুমানের আত্মবিস্মৃতিতে নারায়ণ প্রচ্ছন্ন রহিলেন।

এই হনুমান চরিত্রে বাল্মীকি একত্রে নারায়ণের কৌশল ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাস সেই চরিত্রেরই বিশ্লেষণ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রে নারায়ণাংশ দিয়া হনুমানের ভীমাশক্তি ভীমচরিত্রে কল্পনা করিলেন। মহাযুদ্ধে যেমন রামচন্দ্র শূরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহায়তায় সর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি করিতেছেন, ব্যাস তেমনি যুধিষ্ঠিরকে মহাধর্ম্মবীর্য্যস্বরূপ অর্জ্জুন এবং ধর্ম্মবলস্বরূপ ভীমের সহায়তা দিয়া ভারতীয় মহাব্যাপার মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। ধর্ম্মবীর্য্য এবং ধর্ম্মবল অপর সহায়তা ভিন্ন একা একাই সমুদায় পাপবল পরাস্ত করিতেছে। পবনদেব প্রচণ্ডবলে একাকী যেমন সম্মুখে সমস্ত বিধ্বংস করিয়া চলিয়া যান, ভীম ও হনুমান তেমনি একা একাই পাপের শত সহস্র মূর্ত্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন একাকী শতবার পাপ বিপক্ষে জয়লাভ করিতেছেন। বাল্মীকি রাম ও লক্ষ্মণকে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন বিপত্তির উপর জয়লাভ করিতে কল্পনা করিয়াছেন। এরূপ বীরত্ব কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মক্ষেত্রেই সম্ভব। মানুষী যুদ্ধব্যাপারে তত সম্ভব নহে। ধর্ম্মের সূর্য্যোদয়ে পাপের সমস্ত কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হয়। যিনি এই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ভীম ও অর্জ্জুন একা একা কিরূপে শত সহস্র বিপক্ষবলের উপর জয়লাভ করিতেছেন; তিনিই বুঝিতে পারিবেন হনুমান একাকী

কি রূপে অদ্ভুতব্যাপার সমস্ত সম্পন্ন করিতেছেন এবং রামলক্ষ্মণ একা একাই কিরূপে অত্যাশ্চর্য্য অবদান পরম্পরায় বিজয়ী হইয়া উঠিতেছেন। এ সমস্ত সংগ্রাম সামান্য বাহ্য সংগ্রাম নহে,এ সংগ্রাম অধ্যাত্ম রাজ্যের ঘোর যুদ্ধব্যাপার—যে যুদ্ধে সংসারের বিষয়াসক্তি, মায়ামোহ ও পাপ তাপ এক দিকে, অন্যদিকে ধর্ম্মের মহা বল বিক্রম, শৌর্য্য ও বীর্য্য, তুমুল কাণ্ড বাঁধাইয়া মহোল্লাসে জয়শ্রীর উচ্চকেতনে নৃত্য করিতেছে।

রামায়ণে আমরা ধর্ম্মপক্ষে রামলক্ষ্মণ, ভরতশত্রুঘ্ন ও হনুমান রূপ পঞ্চশক্তির সংযোগ দেখিতে পাই, মহাভারতেও তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরের পঞ্চভ্রাতার সংযোগ। রামায়ণে ধর্ম্মের দৈবসহায় নারায়ণ বিলুপ্ত ভাবে আছেন, ব্যাস সেই দৈব সহায় নারায়ণকে পঞ্চপাণ্ডবের কৃষ্ণরূপে পরিদৃশ্যমান করাইয়া সংসার চক্র তদীয় হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবকল্পনা কোন কাব্যে এত উচ্চতায় উঠে নাই। কোন কাব্যকার ঐশীশক্তিকে কাব্যচরিত্র আকারে এত পরিপাটিরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি সকল ঐশীচরিত্রকল্পনাকার ব্যাসের নিকট পরাস্ত। বাল্মীকি যাহা রামচন্দ্রে ও হনুমানে প্রচ্ছন্নভাবে দেখাইয়াছেন, ব্যাস তাহা কৃষ্ণচরিত্রে উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান করিয়াছেন। এত বড় প্রকাণ্ড মহা ঐশী-চরিত্র কল্পনার যোগ্য বটে। এত নিগূঢ় কল্পনা, ও অসীম চক্রিতাপূর্ণ অনন্তের ছায়া-রূপী কৃষ্ণ ভগবান চরিত্রের উপযুক্ত বটে। সেই কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে সমুদায় মহাভারত ও সংসারকে যেন ছাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার বিশাল দেহ, সংসারে যেমন, তেমনি ভারত-ময়ওত প্রোত হইয়া বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা,—ভারতে সর্ব্বেসর্ব্বা,—সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা। মহাভারত সমাপ্ত হইলে তুমি ভগবানের প্রকাণ্ড লীলা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলে। তোমার মন কৃষ্ণমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইল।

কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা যে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখিতে পাই, তাঁহারা যেন পঞ্চজনে একত্রীভূত একমাত্র বল। কোন কাব্যে পঞ্চজনে এমত ঘনিষ্টরূপে মিলিত হয় নাই। আবার কোন কাব্যে সেই পঞ্চজনের একৈকশক্তি স্বতন্ত্র রূপে তত বিরাটমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হয় নাই। যদি আর কোন কাব্যে পাঁচজনে একপ্রাণে মিলিত হইয়া থাকে, তাহা বাল্মীকির মহাকাব্যে। কেবল রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই—রামলক্ষ্মণ, ভরতশত্রুঘ্ন ও হনুমান এক প্রাণে সবাই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আবার স্বতন্ত্রভাবে উঁহাদের বিরাটমূর্ত্তি দেখ, এক এক জনের চরিত্রাঙ্কনে তোমার মন পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। পরিপূর্ণ কি, বুঝি মনে সে বিশালচিত্র ধরিয়া উঠে না। এই দুই মহাকাব্যের এই পঞ্চজনের চরিত্র এক অদ্ভুত চিত্র—এক অনুপম কল্পনা। সবাই বিচিত্র অথচ এক। সবাই স্বতন্ত্র শক্তি অথচ একত্রীভূত মহাশক্তি। ব্যাস ও বাল্মীকি এই স্থানেও অতুলনীয়।

কিন্তু এই স্থলেই ব্যাস ও বাল্মীকির

বিভিন্নতা। ব্যাস, বাল্মীকির সৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাসত বাল্মীকি নহেন। ব্যাসের কল্পনায় বাল্মীকি অদৃশ্য হইয়াছেন। বাল্মীকি কল্পনার স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া যে সৃষ্টিরাজ্য বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, ব্যাস তাহা দেখিয়া মোহিত হইলেন। কিন্তু ব্যাস মোহিত হইয়া ভাবিলেন, আমি এই সৃষ্টিরাজ্যের পর পারে এক সদৃশ সৃষ্টি-রাজ্য বিস্তীর্ণ করিব। বারাণসীর পুণ্য-ধামের পরপারে আরএক সদৃশ পুণ্যধাম সৃষ্টি করিব। অধ্যাত্ম দেশের পুণ্য সলিলা সাত্ত্বিকীপ্রবৃত্তিরূপিণী ভাগীরথীর একপারে বাল্মীকির স্বর্ণচূড়া, অপর পারে ব্যাসের স্বর্ণচূড়া হাসিতে থাকিবে। বাল্মীকি যে মোক্ষপথে কল্পনা বিস্তার করিয়াছেন, সেই মোক্ষপথ উত্তীর্ণ হইয়া আত্মা যে পথে বিচরণ করে, ব্যাস সেই দেশে স্বীয় কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাসের কল্পনা সেই দেশে অবাধে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বসংসার ছাইয়া ফেলিল। বাল্মীকির তীর্থধাম—ভক্তি, ব্যাসের মোক্ষধাম—জ্ঞান।

বাল্মীকি হৃদয়ে বলবান, ব্যাস জ্ঞানে মহীয়ান। বাল্মীক যে হৃদয়ে ক্রৌঞ্চমিথুন শোকে ব্যথিত হইয়াছিলেন, সেই হৃদয়ের আবেগে রামায়ণ-কল্পনায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস যে তপোবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করায়ত্ত করিয়াছিলেম, সেই তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বোধিত হইয়া ভারতীয় কল্পনাকে সজ্জিত করিলেন। বাল্মীকির ধর্ম্মক্ষেত্র হৃদয়, ব্যাসের কুরুক্ষেত্র জ্ঞান। এই জ্ঞানের কুরুক্ষেত্রে পাপকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। বাল্মীকির কল্পনারাজ্যে হৃদয়ের প্রস্রবণ একেবারে শত ধারায় বিমুক্ত, ব্যাসের কল্পনারাজ্যে জ্ঞানের অসংখ্য দেশ বিরাজিত। বাল্মীকির পাত্রগণ হৃদয়া-নুরাগে পরিপূর্ণ, ব্যাসের পাত্রগণ জ্ঞান-বলে বলীয়ান্। রাম চন্দ্রের ভ্রাতৃগণ হৃদয়ানুরাগে যাহা করে, তাহা যুধিষ্টিরের ভ্রাতৃগণে জ্ঞানবলে উত্তেজিত হইয়া সম্পন্ন করে। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান, সবাই রামানুরাগে পরিপূর্ণ; সবাই বীর বটে, কিন্তু ভক্তবীর। তাঁহাদের বীরত্বভক্তিতে উত্তে-জিত। ভক্তিতে, অনুরাগে ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া লক্ষ্মণ বনবাসে রামের অনুসরণ করি য়াছিলেন। মাতা বল, পিতা বল, কলত্র বল, বন্ধু বল কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে নাই। বিষয় বল, সুখ বল, ঐশ্বর্য্য বল কিছুতেই তাহার রামানুরাগ ফিরাইতে পারে নাই। আর সীতা—আজিও সীতা রামানুরাগে ও পতিভক্তিতে সর্ব্বজন-আরাধ্যা হইয়া আছেন। যে পতিভক্তিতে তিনি দেবোপমা, সেই পতিই বনবাসকালে তাঁহার অনুসরণ ব্রত হইতে সীতাকে বিরত করিতে পারেন নাই। আবার ভরত—যে ভরতের জন্য তদীয় জননী রামকে বনবাস পাঠাইলেন, সেই ভরতের ভ্রাতৃঅনুরাগ কি প্রগাঢ়! সে ভ্রাতৃ অনুরাগের কি আর তুলনা আছে? তিনি চিরদিন সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদপূজা করিয়া আত্মজীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়া ছিলেন। ওদিকে দেখ হনুমান—ওরূপ বীর—ওরূপ ভক্তবীর কি আর জগতে কখন দেখা দিয়াছিল। শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃঅনুরাগে

উত্তেজিত হইয়া কত দুঃসাধ্য ব্রতে, কত শঙ্কটে না পদার্পণ করিয়াছেন! এ সমুদায় ভক্তিরাজ্য—ভক্তিতে পাত্রগণ উচ্ছলিত। এই ভক্তবীরগণের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞান অবনত। উহারা ভক্তিতে ও হৃদয়ানুরাগে উত্তেজিত হইয়া যাহা করিতেন, তাহাই কর্ত্তব্য। তাহাদিগের হৃদয় কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া চলিত না, কিন্তু যাহা স্বতঃই আবেগবলে করিত, তাহাই কর্ত্তব্য হইয়াছিল। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি তাঁহাদের হৃদয়াবেগ সঙ্গে নৈসর্গিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এমনি মিশিয়াছিল যে, তাঁহাদের হৃদয়াবেগ যেন অজ্ঞাতসারে কর্ত্তব্যের প্রণালীতে চলিয়া যাইতেছে। সেই হৃদয়াবেগ প্রশমন করিতে ধর্ম্মের আবশ্যক হইত না, কিন্তু তাহা স্বতঃই চালিত হইয়া যে পথে ধাবিত হইত, সেই পথই ধর্ম্মপথ বলিয়া প্রতীত হইত। এই ভক্তিই সাত্ত্বিক ভক্তি—এই ভক্তিই মোক্ষদাত্রী। এরূপ হৃদয় লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হয় না; তাঁহারা ধর্ম্মপথ জগতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্য উদিত হন। এই গেল বাল্মীকির ভক্তিরাজ্য।

অন্যদিকে ব্যাসের ছবি দেখুন। ব্যাসের "পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী" কিরূপ কার্য্য করিতেছেন। সেই বনবাস ব্যাসের ও আছে। কিন্তু যে বনবাসকালে বাল্মীকি জগৎকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন, সেই বনবাসকালে ব্যাস কি করিতে পারিয়াছেন? তাঁহার বনবাসযাত্রীরা যেন শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে নীয়মান হইয়া, শুদ্ধ ধর্ম্মভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া বনে যাইতেছেন। একবার কুন্তীদেবী কাঁদিলেন, আর সব ফুরাইয়া গেল। দ্রৌপদী কি বনবাসের যোগ্যা, না বনবাসে যাইতে চাহেন? সীতা যেমন বনলতার মত রামের দেহাশ্রিতা হইয়াছিলেন, রাম যেখানে যাইতেছেন সেই বনলতা ও তৎসঙ্গে যাইতেছেন, দ্রৌপদী কি তদ্রূপ বনলতা, না তাঁহার কোন প্রভিন্নতা ছিল? আমাদের বোধ হয়, দ্রৌপদী লতা বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের যেন কতক স্বাধীন বৃত্তি আছে, যেন নিজে নিজে কতক দাঁড়াইতে পারেন। তথাপি দ্রৌপদী লতা ধর্ম্মিণী বলিয়া বনস্পতির আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের হ্রাস বৃদ্ধি বনস্পতির গাত্রে হেলাইয়া দিয়াছিলেন। বনস্পতির অবলম্বনে তাঁহার শিরোদেশে চড়িয়া নৃত্য করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার নিজ ইচ্ছা ও হৃদয়াবেগ যে দিকে যাক, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজ্ঞান তাহাদিগকে অবনত করিয়া দিয়াছিল। যাহা দ্রৌপদীতে প্রত্যক্ষ, ভীমে তাহা ততোধিক প্রত্যক্ষ। ভীমের হৃদয়বল বুঝি দুঃশাসনীয়। সে বল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ প্রমাণ, ঝটিকার প্রচণ্ড প্রবাহ; কিন্তু সেই বল, সেই তরঙ্গ ও সেই প্রবাহ যেন এক দৈব শক্তিতে প্রশমিত হইয়া যাইতেছে। আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে,—আবার তখনই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। কোন্ শক্তি এ হৃদয়াবেগ ফিরাইল? এ আশীবিষকে কে শান্ত করিল? সে শক্তি যুধিষ্ঠিরের বাক্য,—সে শক্তি ধর্ম্মের বাক্য,—সে শক্তি কর্ত্তব্য জ্ঞান। যে কর্ত্তব্যজ্ঞান

ব্যাস গীতায় শিক্ষা দিয়াছেন, ব্যাস যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের ধর্ম্ম এরূপ নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, সর্ব্ব সংসার এক দিকে আর কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্য দিকে—সেই অসীম-প্রভাবসম্পন্ন, ধর্ম্মতেজে তেজীয়ান্ কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ব্যাস অযুত বলে বলীয়ান্ করিয়া ভীমপরাক্রম ভীমের সমক্ষে যেই ধরিলেম, ভীম অমনি মস্তক অবনত করিলেন। কুরু সভায় দ্রৌপদীনিগ্রহকালে এই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজ্ঞান কি অমানুষী ব্যাপার না সম্পন্ন করিয়াছে? যাহা রক্তমাংসসমন্বিত মানবশরীরে কখনই সহ্য হয় না, সেই ভয়ানক দ্রৌপদীবিগ্রহব্যাপার যখন সম্পন্ন হইতেছে, যখন পঞ্চমহাবল স্বামীসমক্ষে স্ত্রীর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা হইতেছে, তখন কোন্ শক্তি যুধিষ্ঠিরকে অচল ও অটল করিয়া দেবোপম করিয়া ছিল, কোন্ শক্তি ভীমের তর্জ্জন গর্জ্জন থামাইয়া ছিল, কোন্ শক্তি অর্জ্জুনাদি অপর তিন ভ্রাতাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? যে স্থলে যুধিষ্ঠিরের একবার একটা বাক্য মাত্রে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠে, মর্ত্ত্যধাম রসাতলে যায়, সে স্থলে যুধিষ্ঠির কি জন্য নীরব হইয়াছিলেন? এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার উত্থাপিত করিয়া ব্যাস দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্ব সংসার এক দিকে, কর্ত্তব্য জ্ঞান আর এক দিকে হইলেও, কর্ত্তব্যজ্ঞান ধর্ম্মজীবী গণে কখন পরাজিত হইবে না। আবার একবার দেখ, কুরুক্ষেত্রের প্রতি চাহিয়া দেখ, যুদ্ধের প্রাক্কাল উপস্থিত, সমস্ত সংসার যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে, এমত সময় অর্জ্জুনের মহা মোহ উপস্থিত। অর্জ্জুন কি বলিয়া আত্মকুলক্ষয়ে লিপ্ত হইবেন? তখন তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন দ্বিগুণ উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। এমত স্থলে ও এমন অবস্থায় বল দেখি, কার কবে কর্ত্তব্য জ্ঞানজাগরিত হইয়াছে? কিন্তু অর্জ্জুন সেই ভয়ানক অরাতি-নিপাতসময়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ঘোর সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইয়া একদা ধনুর্ব্বাণ পরি ত্যাগ করিলেন। যখন বুঝিলেন, নিঃসন্দেহ বুঝিলেন,যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, তখন তিনি আবার সেই ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। এইরূপ সঙ্কট স্থল বিরচন করিয়া ব্যাস শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার বীরগণ, তাঁহার পঞ্চ পাণ্ডব, সবাই জ্ঞানবীর ছিলেন। এই জ্ঞানের কাছে ভীমের প্রমত্ততা প্রশান্ত; অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও বীর্য্য পরাস্ত, এবং দ্রৌপদীর বীরদর্প বিচূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা সবাই এই জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ছিলেন। এই জ্ঞান যুধিষ্ঠিরকে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, স্থিরতার সাগর, গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার প্রশান্ত প্রতিমা গড়িয়াছিল। কাব্যের অনেক স্থলেই যুধিষ্ঠিরকে দেবতা অপেক্ষাও মহীয়ান্ বলিয়া বোধ হয়। যে স্থলে দেবকোপও প্রধূনিত হয়, সে স্থলেও যুধিষ্ঠির স্থির—অবাতবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় স্থির—পর্ব্বতের ন্যায় অচল, অটল ও অভেদ্য। কোন্ শক্তি প্রভাবে যুধিষ্ঠির দেবতা অপেক্ষা গরীয়ান্? সেই শক্তি জ্ঞান। এত বড় জ্ঞান-বীর কোন কাব্যে কল্পিত হয় নাই। রামচন্দ্রও একদা সীতা দেবীকে হারাইয়া ত্রিভুবন কাঁদাইয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ অধীর ক্রন্দনে যুধিষ্ঠির কখন বিহ্বল

হন নাই। পঞ্চ শিশু হত্যায় তিনি একেবারে কাঁদিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাঁদিয়া অধীর হয়েন নাই। আত্মকুল সবাই বিধ্বংস, তথাপি যুধিষ্ঠির স্থির। যুধিষ্ঠির আত্মকুলক্ষয়ে সংসার-বিরাগী হইয়া প্রশান্তভাবে ভীষ্মের পাদমূলে বসিয়া তত্ত্বকথা শুনিতে লাগিলেন। জ্ঞানবীররে চূড়ামণি যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে অন্য পাঁচ জন জ্ঞানবীর অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী। যুদ্ধাবসানে এই পঞ্চজন রাজ্যলোভী হইয়া যখন যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনারূঢ় হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, বনবাসে গিয়া সময়ে সময়ে এই পঞ্চজনের অন্যতম যখন রাজ্যত্যাগের জন্য যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করিতেন, তখন কি অচল, অটল যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতীত হইত না? যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও স্থিরতা ছিল বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। সর্ব্বাবস্থায় আপনার নির্ম্মল বুদ্ধি ও জ্ঞানে সকল সময়ের ঠিক কর্ত্তব্য যুধিষ্ঠির অবিচলিত চিত্তে অবধারণ করিতে পারিতেন। জ্ঞানের এই রূপ নির্ম্মলতা ও স্থৈর্য্যকে মুকুরবৎ প্রতীয়মান করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের কল্পনা। এই রূপ কল্পনায় ব্যাস অতুলনীয়। ব্যাসের এই জ্ঞানবীর সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে প্রভাসিত। এই চিত্র সকল যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি বরাবর সঙ্গত বর্ণে উদ্ভাসিত। এই জ্ঞানবীরগণ ব্যাসের অতুলনীয় সৃষ্টি। বাল্মীকির ভক্তবীরগণ যেমন তাঁহার অতুলনীয় সৃষ্টি, ব্যাসের জ্ঞানবীরগণ তদ্রূপ সৃষ্টি। বাল্মীকি দেখাইয়াছেন, অটল ভক্তি যেরূপ মোক্ষের সোপান, ব্যাস দেখাইয়াছেন, অটল ধর্ম্মজ্ঞান তদ্রূপ মোক্ষের কারণ। যে জীব এই জ্ঞানবলে বলীয়ান্, মুমুক্ষু হইয়া তিনি সকল সংসারকেও একদা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এই মোক্ষ যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার নিকট আত্মকুলের মমতা অকিঞ্চিৎকর। গীতার এই মহাসত্য ও জ্ঞান-উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মোক্ষার্থী করিয়াছিলেন। এই অর্থেই গীতার বাক্য সকল অখণ্ডনীয়। আত্মকুলের মমতা কখন লোকের অকিঞ্চিৎকর, যখন তাঁহার স্থির লক্ষ্য মোক্ষের প্রতি। অর্জ্জুনের লক্ষ্য সেই মোক্ষের প্রতি স্থির করাইবার জন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মকুল ও গুরুজনের মমতা বিনষ্ট করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই জ্ঞানের রাজ্য মহাভারতে। ভক্তির রাজ্য যেমন রামায়ণে, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের রাজ্য তেমনি মহাভারতে। কিন্তু ঐ উভয় কাব্যেই কর্ত্তব্যজ্ঞান বরাবর দেদীপ্যমান। বাল্মীকি কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ভক্তির অনুসারী করিয়া দেখাইয়াছেন, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাপালনকে প্রগাঢ় পিতৃভক্তির অনুসারী করিয়াছেন, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভক্তি, চারিভ্রাতার ভ্রাতৃভক্তি এবং দ্রৌপদীর পতিভক্তিকে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন। পঞ্চভ্রাতার মাতৃভক্তি দ্রৌপদীর বিবাহান্তর একদা মাতৃ-আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। জ্ঞানদ্বারা হৃদয়ের এইরূপ শাসন মোক্ষপ্রদ। হৃদয়ের শাসন জগতে বড় বিরল। ধন্য সেই জীব যিনি হৃদয়কে যুধিষ্ঠির ও ভীমের ন্যায় শাসন করিতে পারিয়াছেন। তিনি যথার্থ মোক্ষধামের অধিকারী হইবার যোগ্য পাত্র।

ব্যাস ও বাল্মীকির এইরূপ প্রভেদ বুঝিতে পারিলে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতে কল্পনার প্রভেদ বুঝিতে পারিব। কাব্যাংশে বাল্মীকির প্রতিভা করুণাদি কোমল রসে বিশেষ রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি সেই রসে আমাদের হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দেন, ব্যাসের প্রতিভা বীরাদি উগ্ররসে বিশেষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাল্মীকি যেমন এক এক বিষয়ে বিজয়ী, ব্যাসও তেমনি অপরাপর বিষয়ে বিজয়ী। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে ব্যাস একেবারে অতুলনীয় ও বিশ্ববিজয়ী। রামায়ণে বাল্মীকির পাণ্ডিত্যের কিছু অভাব নাই বটে, রামায়ণের সর্ব্বত্রই বাল্মীকির পাণ্ডিত্য সমভাবে বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেই কাব্যের রসপ্রাচুর্য্য এত অধিক যে সেই রসের খেলায় মন আর্দ্র হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের তত অনুভব করিতে পারে না। কব্যেরসের মোহ কথঞ্চিৎ অপনীত না হইলে আমরা রামায়ণের জ্ঞানদেশে প্রবেশ করিতে পারি না। ব্যাস রসাভাসের মহাবেগের মধ্যে আনিয়া ও আমাদিগকে জ্ঞানদেশ দেখাইয়াছেন। চারিদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সভাপর্ব্বে রাজসভামাঝে দ্রৌপদী নিগ্রহকালে রসাভাসের সমুদ্রপ্রমাণ মহা তরঙ্গ উঠিতেছে, তন্মধ্যে দ্রৌপদীর বাক্যের মহা সমস্যা উত্থাপিত এবং ভীমার্জ্জুনাদির মহাকর্ত্তব্য জ্ঞানের শিক্ষা। বাল্মীকির উপদেশ রসতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া যায়, মন না ভাবিয়া ও ধর্ম্মার্থ লাভ করে, ব্যাসের উপদেশ রসের প্রতীপগামী, জ্ঞান আসিয়া ব্যাসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রশমিত করে। রসের সহিত জ্ঞানের অভিঘাতে ব্যাস শিক্ষা দেন। রামায়ণে তুমি রসের অনুগামী হইয়া বরাবর জ্ঞানসাগরে আসিয়া পড়িবে, ব্যাস তোমাকে রসস্রোতে লইয়াগিয়া এক একবার বলিবেন এইখানে স্থির হও, দেখ তরঙ্গের দুইপার্শ্বে, এবং বক্রগতি তটিনীর সম্মুখদেশে, যথায় তাহার তরঙ্গোচ্ছ্বাস লাঞ্ছিত হইয়া বিভিন্নদিকে তর তরবেগে যাইতেছে, একবার আসিয়া এই সকল জ্ঞানদেশের শোভা দেখ, মোহিতচিত্তে একবার জ্ঞানরাজ্যে ভ্রমণ কর, এইরূপ জ্ঞানরাজ্যের দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, তবে স্বর্গদেশে উত্থিত হও। রামায়ণে আমাদের বোধ হয়, আমরা তরঙ্গিণীর সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া গিয়া মহা সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছি, মহাভারত মধ্যে বোধ হয়, আমরা গঙ্গাপ্রবাহের বিপরীতে উত্থিত হইয়া গোমুখীতীরে যাইয়া বুঝি মোক্ষধাম লাভ করিব। ভাগীরথীপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতনমুখে যাও, সেখানে মহাসমুদ্রের গ্রাসে তোমার লয়সাধন হইবে, আবার তাহার উৎপত্তিমুখে আইস, সেখানে ও হিমাচলের হিমসাগরে তোমাকে বিলীন হইতে হইবে। রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান সরযূতীরে, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান হিমাচলের হিমসাগরে। উভয়েই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

রামায়ণের করুণরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস একটানা স্রোতে মহাকাব্যকে প্লাবিত করিয়া যাইতেছে। বাল্মীকি এই রসে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি হৃদয় ব্যথায় পৃথি-

বীকে বিগলিত করিবার জন্য করুণ রসের প্রস্রবণকে একেবারে শতধারায় বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সে রসের মহা তরঙ্গোচ্ছাসে অন্যরস তত মিশিতে যায় না। রামবনবাস-কালে কৈকেয়ীর ব্যাভারে যে কথঞ্চিৎ হৃদয়াঙ্গ ও একদা একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই করুণরসের মহা প্রবাহ আসিয়া সেই হৃদয়কে একেবারে আর্দ্র করিয়া ফেলে। তুমি রামের জন্য, সীতার জন্য, লক্ষ্মণের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়া শেষ করিতে পার না। বনে যাও, সেখানে সীতাহরণে রামচন্দ্রের ক্রন্দনে বনবাসী পশু পক্ষী ও তরুলতার সঙ্গে তোমাকে চক্ষুজলে বনদেশ ভাসাইতে হইবে। বাল্মীকি কাব্যের সর্ব্বস্থলেই করুণ রসের উপকরণ যোজনা করিয়াছেন। কত বার কত স্থলে লোককে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদাইতেছেন। সীতাহরণের পর রাম যেমন রোদন ধ্বনিতে পশু পক্ষী ও বৃক্ষগণকে ও কাঁদাইয়াছিলেন, বন গমনোদ্যোগী রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তদ্রূপ সমস্ত লোকমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। সেই করুণ রসের স্রোত আবার অশোক কাননে। সীতার দুঃখে তথায় কে না কাঁদিতেছে! দুরন্ত যুদ্ধোদ্যোগ ভুলিয়া পাঠক বুঝি সীতার দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেন। হনুমানের সঙ্গে সীতার বিলাপবাক্যে শোকাবেগে ব্যথিত হন। যুদ্ধ মাঝে ও লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের সঙ্গে এবং রামের মায়ামুণ্ডদর্শনে সীতার সঙ্গে পাঠক কাঁদিতে থাকেন। তৎপরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাসে কে না নয়ননীরে পৃথিবী আর্দ্র করিয়াছে! রামায়ণে এই রসস্রোত সমভাবে প্রবল প্রবাহে বহিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মহাভারত কিরূপ রসের আধার? বাল্মীকি যেমন অবিমিশ্র করুণরসে অতুলনীয়, রামায়ণ যেমন করুণ রসে উছলিয়া পড়িতেছে, মহাভারত তেমনি একদা বীররসে গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে, একদা করুণে বিগলিত হইতেছে। মহাভারতে রসের অভিঘাতে হৃদয় স্তম্ভিত হইতে থাকে। ব্যাসের রমণস্থল কুরুক্ষেত্রের সাংগ্রামিক ব্যাপার। সেই ব্যাপারের মধ্যে আমরা ব্যাসের রসে একেবারে বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। একদা বীরে উৎসাহিত এবং করুণে বিগলিত হইতে থাকি। লোমাঞ্চের সহিত অশ্রুবর্ষণ করি। সপ্তরথীর মাঝে অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া শরীর লোমাঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু তাহার দশা ভাবিয়া আবার তখনই কাঁদিতে থাকি। দিবাযোগে যুদ্ধব্যাপারে প্রমত্ত হই, রাত্রিযোগে পঞ্চশিশু হত্যায় কাঁদিয়া উঠি। ব্যাসের হৃদয় করুণ, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর রসে পরিপূর্ণ। বাল্মীকির হৃদয় ও মুখমণ্ডল সকলই করুণরসে কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। রামের বনবাসে একবার রামায়ণ দেখ, তখন রাজসভায় যাও, পথে ঘাটে যাও, গ্রামে গ্রামে বেড়াও, যেখানে যাও, সেই খানেই দেখিতে পাইবে সমস্ত লোক রোরুদ্যমান হইয়া এক মহা শোকাবেগে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাল্মীকি তথায় কত উপকরণ দিয়া নিজ কাব্যকে করুণরসে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন দেখ, তাহা কি নির্ব্বাসন বলিয়া প্রতীতি হইবে? সেস্থলে দেখিতে পাইবে বীরগণ বীরের ন্যায় নির্ব্বা-

সনে উদ্যোগী হইয়াছেন। পঞ্চপাণ্ডবগণ সহসা একদিন আস্তে আস্তে বনবাসে গমন করিলেন। সঙ্গে কেবল হাজার হাজার অনুযাত্রী যাইতেছে—যেন রাজসভা উঠিয়া বনে যাইতেছে। ব্যাস কি বাল্মীকির মত করুণ রসের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন? রাম ও লক্ষ্মণও বীরের ন্যায় বনে যাইতেছেন বটে, কিন্তু পাঠকের মন তখন কি রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি চাহিয়া থাকে? রাম ও লক্ষ্মণের পরিপার্শ্বে তখন এত ক্রন্দন রোল, যে সে রোলে হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। লক্ষ্মণের বনগমনের সঙ্গে ভীমার্জ্জুনের বনগমন তুলনা হয় না। লক্ষ্মণের বনগমন কেবল হৃদয়ের ব্যাপার। প্রত্যুতঃ রামের বনগমন কালে পাঠকের হৃদয় যে মহা মনোবেদনায় উদ্বোধিত হয়, তাহা পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন কালে অনুভূত হয় না। ব্যাস এই নির্ব্বাসনস্থলে নিজ কাব্যকে তত করুণরসের উপকরণে সজ্জিত করিতে পারেন নাই।

ব্যাস অন্য সময়ে অন্য রূপ মনোবেদনার উৎপাদন করিয়াছেন। যে সময়ে দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির ও ক্রমে অপর পাণ্ডবগণ সমস্ত ঐশ্বর্য্যহীন হইতেছেন, এবং এই ঐশ্বর্য্যহীনতার ফল যে সময় ফলিয়া আসিতেছে, সেই সময়ে ব্যাস যে মনোবেদনার উৎপাদন করিয়াছেন, সেই মনোবেদনা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। তখন মন পঞ্চপাণ্ডবগণের সহানুভূতিতে একেবারে গলিয়া যায়। কিন্তু সে মনোবেদনার সঙ্গে অনেক অপর ভাব আসিয়া সঞ্চারিত হয়। মন একদা রাগে ও দুঃখে পরিপূর্ণ হয়। সেই দারুণ উৎপীড়ন কালে যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও স্থিরতা, এবং ভীমের আক্রোশে মন একদা দোদুল্যমান হইতে থাকে। মনে মহা গভীর রসের সঞ্চার হয়। ব্যাস এই প্রকার রসের উৎপাদনে বড়ই নিপুণ ছিলেন, এবং সেইরূপ রসের উপযোগী করিয়া আপন কাব্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। বাল্মীকি যে রসে একেবারে অতুলনীয়, বাল্মীকিও সেই রসের উপযোগী করিয়া আপন কার্য্যোপকরণের সংস্থান করিয়াছেন। এই কারণে মহাভারতের কল্পনা ও ঘটনাপুঞ্জ, রামায়ণের কল্পনা ও ঘটনাপুঞ্জের সহিত বিভিন্নাকারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে, বাল্মীকি ও ব্যাসের বিভিন্নতা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

চাঁদের হাট।

চাঁদ বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। প্রাচীন ঋষি হইতে আজিকার বালক পর্য্যন্ত চাঁদের মাধুরীতে সকলেই মুগ্ধ। যে যেভাবেই দেখুন, চাঁদ দেখিলে ভুলিতেই হইবে। চাঁদের অমৃতময় সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া, তাহার অপরিসীম মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া, সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক, তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সকলেই চাঁদের সুধাধারত্বের পরিচয় পাইয়াছেন। সকলেই চাঁদের মাহাত্ম্যে ভুলিয়াছেন। তাই আমি একটী চাঁদ চাই। কিন্তু আকাশের চাঁদে আমার আশা মিটিবে না। আকাশের চাঁদের মন ভুলান শক্তি আছে। উহা দেখিয়াও আমরা ভুলি। যখন চাঁদের দিকে তাকাই, তখন কত কথা মনে হয়; চাঁদকে কত মধুরভাবে দেখিতেপাই। দেখিতে পাই বালক কালের মধুর লীলা খেলাগুলি যেন এই চাঁদটীর গায়ে লুকাইয়া আছে,—মন চাঁদের ভিতর হইতে সেইগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, আবার তাহা ধরিতে চায়, আবার তাহা অধিকার করিতে চায়,—তাই সেই লীলাখেলার অস্ফুটছায়ার অনুসরণ করিতে থাকে,—আর আমি,—আমি শূন্যমন হইয়া, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকি,—জগৎ ভুলিয়া থাকি। মন ভুলান আকাশের চাঁদের এতই মন ভুলান ক্ষমতা! এতই গুণ! গুণ এত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু দোষ ও ত কম নহে। এই চাঁদ অত্যাচারী, প্রাণহারী, নৃশংস, ক্রুর। চাঁদের দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই; পরের দুঃখে তাহার হৃদয় গলে না, পরের কান্নায় তাহার প্রাণ কাঁদে না। বিরহীর উপর চাঁদের কত অত্যাচার, কত নৃশংসতা! চাঁদ বিরহীর প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। পুণ্ডরীক চাঁদের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়া ছিলেন। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের কাছে বিরহী কত কান্না কাঁদে,—চাঁদ আকাশে বসিয়া হাসিতে থাকে। তাই বলি—চাঁদ বড়ই নির্দ্দয়। সে কাহারও পক্ষে অমৃতময়, কাহারও পক্ষে বিষময়। আমি এই চাঁদ চাই না,—আমি চাই একটী দয়ালু, সরলহৃদয়, অপক্ষপাতী, পরদুঃখকাতর চাঁদ।

চাঁদকে লোকে অমৃত-ভাণ্ডার বলে। এই কথাটায় আমার আপত্তি আছে। কোকিল-কূজনে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, গীতের ললিত তানে, নিশীথের বাঁশরী-গানে যে অমৃত আছে সে অমৃত এই চাঁদে কই? কুসুম-পরিমলহারী মন্দ-মন্দ-সঞ্চারী তরঙ্গ-সংস্পর্শশীতল, কোমল মলয়ানিলে যে অমৃত আছে সে অমৃত এই চাঁদে কই? সংসারের কলুষকলাপে অকলঙ্কিত, সরলতা সহৃদয়তা-মধুরভাষিতাদিসদ্গুণবিভূষিত, সাধুহৃদয়ে

যে অমৃত আছে সে অমৃত চাঁদে কই? শরতের বিকশিত পঙ্কজের নিষ্কলঙ্ক শোভায়, বসন্তের প্রস্ফুটিতগোলাপের, নির্ম্মল প্রভায় বর্ষার ইন্দীবরের কলঙ্কহীন সৌন্দর্য্যে যে অমৃত আছে সে অমৃত এই কলঙ্কী চাঁদে কই? আমার প্রার্থিত অমৃত দানে আকাশের চাঁদ আমার আশা পুরাইতে পারিবে না, আমার আশার পিপাসা মিটাইতে পারিবে না। তোমার আকাশের চাঁদ আকাশে থা'ক্,—উহাতে আমার চলিবে না, আমি যাহার জন্য লালায়িত এই চাঁদের তাহা নাই।

কিন্তু আমার একটী চাঁদ চাই। আমার চাঁদ আমার মনের মত হইবে। উহাতে কলঙ্ক থাকিবে না, পাপ থাকিবে না, নির্দ্দয়তা থাকিবে না, পক্ষপাত থাকিবে না। কোন্ সমুদ্র মন্থন করিলে আমার মনের মত চাঁদটী পাইব কেহ কি আমায় বলিয়া দিবে?

পাতালে চাঁদ নাই,—আকাশের চাঁদে আমার মন উঠে না, অথচ আমার চাঁদ চাই ই! এখন পাই কোথা? পৃথিবীতে একটী চাঁদ মিলিবে না কি? আকাশের চাঁদে সাধ পূরিল না, পৃথিবীর চাঁদে পূরিবে কি? পূরুক, আর নাই পূরুক একটী চাঁদ খুজিতে ক্ষতিই বা কি?

* * * *

—মনোহর উদ্যান। মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে। নবকিশলয়ে চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ রবে, ফুলের মধুর সৌরভে, মন প্রাণ আকুল করিতেছে। উদ্যানে অতি মধুর শব্দে গাইতেছে;—

"স্ফুরদধরসীধবে, তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্।"

শুনিলাম। শুনিয়া হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম বুঝি চন্দ্রমা এই উদ্যানেই বিরাজ করিতেছেন। ভাবিলাম, মৃদুল সমীরণ, ললিত কিসলয়, ভ্রমরের গুণ, গুণ, ফুলের সৌরভ, সকলে আমারই চাঁদের অমৃত ছড়াইতেছে। আবার শুনিলাম;—

"মৃদু মৃদু হাসি, প্রেয়সি! প্রকাশ মুখ-
শশী রে—
কাতর, অন্তর, নিবার দুখতিমিররাশি
নাশি রে"—

শশী এই খানে কাহার "দুখতিমির রাশি" নাশ করিতেছে, কাহার কাতর অন্তর সুস্থ করিতেছে, কাহার মুখের পানে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে; আমি সেখানে গেলে, শশী দেখিতে পাইব না কি? চল যাই—কই, শশী কই? কই, মৃদু মৃদুহাসিমুখ চাঁদটী কই?—গায়ক গাইল—"প্রেয়সি; প্রকাশ মুখশশী রে" গায়ক, তোমার চাঁদ লইয়া তুমি বসিয়া থাক, এ চাঁদ তোমার, তোমার প্রেয়সীর মুখ তোমার চাঁদ হউক আমার আপত্তি নাই, কিন্তু এ চাঁদে আমার আশা মিটিবে না। লেডি ম্যাকবেথের মুখচন্দ্রের অমৃতপানে ম্যাকবেথের চিত্ত-চকোর আনন্দিত হইতে পারে, কৈকেয়ীর মুখচন্দ্রের সুধামাধুরীতে দশরথ মুগ্ধ হইতে পারে,—কিন্তু সকলে ত তাতে অমৃত দেখিতে পায় না, সুতরাং সকলের আশা মিটে না। তোমার চাঁদের সুধাসাগরে তুমি ডুবিয়া থাক আমি উহা চাই না।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যাহ্নতপনতাপে ক্লান্ত হইয়া গ্রামমধ্যস্থ এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শিশুগণ আসিয়া আমার চারি পাশে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। আমি একতানমনে তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, আমার চক্ষু নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির হইল। ভাবিলাম, চাঁদ ত এই খানে। আমি জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি কেন?—এই ত বাল-বদনে চাঁদের নির্ম্মল মাধুরী ফুটিয়া রহিয়াছে,—এই চাঁদ নিশীথের নির্ম্মল গগনে যেমন তেজোময় মধ্যাহ্নের তপনোদ্ভাসিত উজ্জ্বল আলোকে ও তেমনি উজ্জ্বল,—এইটীই অকৃত্রিম চাঁদ,—বালকের বদনেই অমৃতাধার চাঁদের পূর্ণ বিকাশ,—এই চাঁদের মাধুরীতে সকলেই মুগ্ধ।

চাঁদ পাইলাম। আমি একটী চাঁদের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি। আকাশে পাতালে, চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও একটী চাঁদ পাই নাই,—আজ আমার কি শুভ দিন! ঘরে বসিয়া অনন্ত অমৃতের আধার, অনন্ত মাধুর্য্যের পারাবার অনেক গুলি চাঁদ দেখিতে পাই-লাম। আমার এই চাঁদ অতুল, অনুপম; ইহার সহিত তোমরা অন্য চাঁদের তুলনা করিও না; করিলে, আমার চাঁদের অবমা-ননা হইবে। আমার চাঁদ হাসিতে পারে, নাচিতে পারে, খেলিতে পারে, কথা কহিতে পারে। পারে বলিয়া পরের সুখে হাসে, পরের দুঃখে কাঁদে, পরকে খুশী করিবে বলিয়া নাচে খেলে, কথা কয়। আমার চাঁদের সরল মুখে সরলতা সর্ব্বদাই বিরাজমান; কুটিলতা আমার চাঁদে নাই।

এই চাঁদটী অমৃতের আধার; জগতের সকল অমৃত আমার চাঁদে দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত মধুর গীতের অমৃত, সুধা-মধুর বংশীধ্বনির অমৃত, আমার চাঁদের অস্ফুট কাকলীর কাছে পরাজিত। কুসুম-পরিমলবাহী মলয় সমীরণের মধুর সংস্পর্শে যে অমৃত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা আমার চাঁদের ধূলি ধূসরিত অঙ্গ স্পর্শামৃত অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। উহাতে মাধুরী আছে, চাতুরী নাই; চঞ্চলতা, আছে, কৃত্রিমতা নাই; সাধুতা আছে, বঞ্চকতা নাই; উজ্জ্বলতা আছে, মলিনতা নাই। আমার চাঁদের মুখে শরতের নির্ম্মল গগনের পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিতে পাই, বিকশিত সরোজের মনোহর প্রভা দেখিতে পাই, বর্ষার ইন্দীবরের লাবণ্য দেখিতে পাই, নন্দনের পারিজাতের মাধুর্য্য দেখিতে পাই। কোকিলকূজনে ভ্রমরগুঞ্জনে যে মধুরতা আছে আমার চাঁদে ত তাই আছে। আকাশে পাতালে যে চাঁদ একটি ও পাই নাই, দেখিলাম তাহার কোটি কোটি এই পৃথিবীতে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা যেখানে খুশী খুঁজিয়া বেড়াও,—আমার চাঁদ, সরল, নিষ্কলঙ্ক, পাপস্পর্শশূন্য বালবদন,—আকাশে এই চাঁদ মিলিবে না, স্বর্গে এই চাঁদ মিলিবে না, নক্ষত্রমণ্ডলে এ চাঁদ মিলিবে না,—এ চাঁদ পৃথিবীর জিনীস,—পৃথিবীই আমার এই "চাঁদের হাট"।

শ্রীচন্দ্রোদয় শর্ম্মা।

রূপক।

বৃক্ষ যত বৃদ্ধ হয় ততই উহার সরসতার অন্তর্ধান হয়, মানুষ যত বৃদ্ধহয় ততই তাহার প্রাণ নীরস হইতে থাকে, আর জগৎ যত কালমার্গে অগ্রসর হয়, ততই উহা কঠিন কর্কশ হইতে থাকে। আদি-মাত্রেই সুকুমার, আদিমাত্রেই কবিত্বময়। বিজ্ঞান বাহ্যাড়ম্বর করুণ না কেন, উহার গৌরবের ভিতর, উহার মহত্ত্বের ভিতর কবিত্ব নাই। আর বিজ্ঞানগর্ব্ববিরহিত সৃষ্টির শৈশবই প্রকৃত সুখভূমি, প্রকৃত সরসতাময়। লোকের নিকট আজকাল রূপকের আদর নাই। বিজ্ঞান উহাকে হেয়জ্ঞান করেন। শুষ্ক, কঠিন তত্ত্বই ইদানীন্তন জগতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা। যে ভাবটীর একটু কোমলতা আছে, একটু চাক্‌চিক্য আছে, অঙ্গারময় বিজ্ঞান উহাকে পরিহাস করেন ও বিগতবয়াঃ বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু স্থিরবুদ্ধিতে বিবে-চনা করিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবহারের অসমীচীনত্ব স্বতই প্রকাশ হইয়া পড়ে। রূপক কাহাকে বলে? রূপক মাত্রেই যে মণিময় গিরির ন্যায় অসম্ভব কল্পনা তাহা নহে। ধরিতেগেলে রূপক মানুষের জীবন। মানুষের কেন, এক প্রকার সৃষ্টির জীবন। আমাদের কথা রূপকময়, আমাদের জ্ঞান রূপকময়, আমাদের ব্যব-হার রূপকময়। একের উপর অন্যের অধ্যাস বা আরোপকে রূপক বলে। একটী ভাব একটী বস্তু যদি স্বকীয় নির্দ্দিষ্টরেখা অতিক্রম করিয়া অপর একটী ভাবের অথবা অপর একটী বস্তুর রাজ্যে পদার্পণ করে তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে উহা রূপকদোষদূষিত হইবে। মানবমনের বৃদ্ধি বনের বৃদ্ধির মত। কান্তারে অক্ষুণ্ণপ্রসরে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি হয়। লতায় লতায় শাখায় শাখায় গুল্মে গুল্মে জড়াইয়া যায়। বিভিন্নজাতীয় লতা সোদরভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। অবশেষে যদি মানুষের হাত উহাতে না পড়ে তাহাহইলে একটী বিপুল হরিজ্জাল রচনা করে। মানুষের মনেরও বৃদ্ধি এই-রূপে হইয়া থাকে। কতিপয় স্বল্পসংখ্যক অন্যান্য বিবিক্ত বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া, বিবৃদ্ধায়তন অন্যান্যপ্রশ্লিষ্ট বহু উদ্ভিদের ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। আর এই প্রক্রিয়াটী একটী রূপক। আমরা যেরূপ এক বিপুল শাখাপ্রশাখাসমন্বিত ন্যায়শাস্ত্র ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিক্ষাপ্রণালীর অধীন তাহাতে এই প্রক্রিয়ার অনেক ব্যাঘাত হয় সত্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ হইতে পারে না। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে এই প্রক্রিয়া নিরতিশয় বলবতী। কারণ ধরিতে গেলে তাহাদের হৃদয়ে অদ্যাপি প্রকৃতির রাজ্য অব্যাহতভাবে বিরাজমান। প্রাচীন বট-বৃক্ষে যেরূপ বহুগ্রন্থি দেখিতে পাওয়া

যায়, মানুষের মনেও ঠিক্‌ সেইরূপ বহুগ্রন্থি আছে। একভাব অপর একভাবকে অচ্ছেদ্যভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছে। হয় ত, যে একটী বিশেষভাবকে সান্ধ্যতারার ন্যায় একাকী পৃথক্‌ দেখিতেছি, উহা একান্ত জটিল, বহুতর সরলভাবকে অবলম্বন করিয়া ঐরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ব্যক্তির ভান হইয়া থাকে। এই একটী বৃক্ষ, সেই একটী বৃক্ষ, এইরূপ বহু বৃক্ষ ব্যক্তির জ্ঞান হইল। কিন্তু বল দেখি, বৃক্ষজাতির জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? অতএব এই দেখ, ধরিতে গেলে সমূহালম্বনে জাতির জ্ঞান একটা রূপক। বৃক্ষজাতির জ্ঞান করিতে হইলে বহুবৃক্ষ সমন্বয় করিতে হয়, পশ্চাৎ আমার একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাতপূর্ব্ব বৃক্ষজাতির ভান উপস্থিত হয়। এইরূপে দেখ বৃক্ষব্যক্তির জ্ঞান স্বীয় নির্দ্ধারিত রেখা পরিহার করিয়া বৃক্ষজাতির জ্ঞান উৎপত্তি করিল। আবার ঠিক এইরূপে যখন বৃক্ষজাতির জ্ঞানটি প্রৌঢ়তালাভ করিল, তখন যখনই উহার ব্যবহার হইবে উহা স্বীয় জনক বৃক্ষব্যক্তি লইয়া উপস্থিত হইবে। এই প্রক্রিয়াও দেখ একটি রূপক। প্রভেদ এইমাত্র যে এখানে ভাবগুলির বিপরীতভাবে সন্নিবেশ হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে যাহা উপমান প্রমাণ বা সাদৃশ্যপ্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে রূপক উহার জীবন। যে ব্যক্তি কখনও গবয় দেখে নাই সে গুরুমুখে অথবা আরণ্যকের মুখে শুনিল যে গলকম্বলবিরহিত গোসদৃশ জন্তুকে গবয় কহে তৎক্ষণাৎ, সে সাস্নাদিমান্‌ পরিচিত গোব্যক্তিতে সাস্না-ভাবের অধ্যাস করিয়াই বল বা আরোপ-করিয়াই বল, গবয়জ্ঞানলাভ করিল। সামান্যতঃ যখন একভাব অপর ভাবের ছায়া অবলম্বন না করিয়া বাড়িতে পারে না তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই বিচিত্র ভাবের ভূমি মানব মনঃ একটী বিস্তৃত রূপক-রঙ্গভূমি।

ব্যবহারেও এইরূপ রূপকের প্রসর দেখা যায়। শুক্লভাস্বর অগ্নি দেখিয়া শিশু সাগ্রহে করপ্রসারণ করিল। অনুভবে জানিল যে রূপটী যেরূপ কমনীয়, গুণ তত রমণীয় নহে। পশ্চাৎ আবার শুক্লভাস্বর বস্তু দেখিল। কিন্তু এবার আর সে আগ্রহ নাই; উহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই। কেবল স্মৃতি ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পূর্ব্বদৃষ্ট বহ্নিরই পুনরাভাস স্মৃতিসাধ্য। তদিতর তৎস্বজাতি বহ্নি সম্বন্ধে উহার কোন অধিকার নাই। এক্ষণে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখ। যেমন তীক্ষ্ণনেত্রে স্থিরভাবে দেখিলে প্রসন্নসলিলা তটিনীর অধোভাগে উপলখণ্ড দৃষ্ট হয় সেইরূপ একটু চিন্তাকরিলে এই জটিল প্রক্রিয়ার অধস্তন রূপক দেখিতে পাইবে। প্রথম বহ্নির সহিত দ্বিতীয় বহ্নির অভেদ প্রতিপত্তি রূপক ভিন্ন কিছুই নহে। ব্যক্তি বিশেষ, স্থানবিশেষ, কাল বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ অথবা মিত্রভাবের অনেক সময়ে এইরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বাক্‌ মানুষের বিকাশ। সুতরাং বাক্‌ মানুষের ভিতরের কথা অনেক বলিতে পারে। রূপক বাক্যের প্রিয়সখা। শব্দশাস্ত্র একটী রূপকের ক্ষেত্র। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে আজ

যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিতেছি, বেশী দিনের কথা নয় হয় ত দশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ শব্দের একটি অতি পৃথক্ অর্থ ছিল। যেখানে ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষ উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, যেখানে বিপুল সাহিত্য শুল্যাধিকারীর ন্যায় উন্মার্গগামী শব্দার্থের নিগ্রহ করে, সেখানে রূপক কিঞ্চিৎ বাধিতপ্রসর হয়। ভাষা, শিশু হউক, অথবা প্রাচীন হউক, উহাকে সর্ব্বদাই রূপককে আশ্রয় করিতে হইবে তবে অল্প বা অধিক মাত্রায়। গদ্য রসের ভাষা নহে, উহা কার্য্যের ভাষা; সুতরাং গদ্য অতিশয় অসামাজিক লোক ও আজ কালকার নীরস বিজ্ঞানকীটের ন্যায় রূপকের প্রতি তত শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু পদ্য অথবা ভাবুকের করগত গদ্য রূপকোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া স্বীয় অঙ্গপ্রসাধন করে। অসভ্যেরা রূপক ব্যবহারে অতি পটু। তাহাদিগের ভাষা বন দেবতার ন্যায় অকৃত্রিম প্রকৃতির উদ্যান হইতে আহৃত কুসুমমণ্ডিত হইয়া থাকে। কবি সংসারের কথা বড় একটা বলেন না; বলিলেও উহা নিজ ভাবনেত্রে অন্যবিধ দেখেন; সুতরাং নীরস সংসারের শুষ্ক কথায় তাঁহার কুলাইয়া উঠে না; কাজে কাজেই তাঁহাকে রূপক আশ্রয় করিতে হয়। অসভ্যের অধিকারে শব্দ অতি বিরল; সুতরাং তাহার উচ্ছলিত হৃদয় রূপকমার্গ আশ্রয় করিয়া প্রধাবিত হয়। আরও দেখ কোন নূতন জিনীস দেখিলে উহার নামকরণ সময়ে আমরা তৎসদৃশ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর নামে আভাস গ্রহণ করিয়া উহার আখ্যান নির্দ্দেশ করি। মানুষ যেমন আগে শিশু থাকে পশ্চাৎ বয়োবৃদ্ধির সহিত কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থাভেদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে কালের অঙ্কলীন হয়; শব্দও সেই-রূপ শিশু থাকিয়া যৌবনাদি বিধি পরিণাম ভোগ করিয়া সর্ব্বগ্রাসী কালের কবলে পতিত হয়। আজ যে শব্দ আমরা, অধীন দুর্ব্বল বাঙ্গালিরা ব্যবহার করিতেছি হইতে পারে যে কত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে উহা সবল, স্বাধীন, ধর্ম্মোত্তর আর্য্যদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। বাক্যের তুল্য পুরাণ জগতে সৃষ্টি হয় নাই; হইবে না। ভগবানের মুখে যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডসংবাদ আবির্ভূত হইয়াছিল, বাক্যও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডসংবাদ প্রকাশ করিতেছে। এক হিন্দু শব্দেই দেখ ভারতের পুরাতন ইতিহাসের উপর কি আলোক-সম্পাত। উহাতে কত জটিল বৃত্তান্ত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধর এই কুশল শব্দটী, প্রশ্নে পত্রে উহা অপেক্ষা ঘনিষ্টশব্দ আর কি আছে। কিন্তু উহাতে আর্য্যসমাজের ব্রাহ্মণ সমাজের কত কথা বলিতেছে। দুহিতৃ শব্দটী আমাদের কত আত্মীয়, কত পরিচিত। কিন্তু দেখ উহা আর্য্য সমাজের আদিম অবস্থার পরিচয় দিতেছে। বহ্নি এই শব্দটী দেখিতে যেন আমাদিগের সাময়িক জিনীস। কিন্তু উহা আর্য্যদিগের হোমক্রিয়া পান করি-তেছে। জায়াশব্দটি যেন আমাদের নিজস্ব, কিন্তু উহাতে প্রাচীন অর্য্যেরা পিতাও পুত্রকে যে এক বস্তু বলিতেন তাহা প্রকাশ হই-তেছে। উনাদি. প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত যাবৎ শব্দের এইরূপ ইতিহাস আছে। শব্দভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়া দেখুন উহার অতি অল্প অংশই আমাদের নিজস্ব। উত্তরাধিকারসূত্রে

আমরা ঐ সকল শব্দ পাইয়াছি; কোন কোন স্থলে গুণবান্ উত্তরাধিকারী যেরূপ পিতৃ বিভবের বৃদ্ধি করে সেইরূপ উহাদের অর্থ সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছি; আবার কোন কোন স্থলে ব্যসনী অজ্ঞ উত্তরাধিকারীর ন্যায় অর্থ সম্পত্তি ক্ষয় করিয়াছি। আর এই ক্ষতিবৃদ্ধির মূল সেই রূপক। যদি শব্দার্থ নিজের দেশ ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে পদার্পণ না করিত তাহা হইলে শব্দের অভিহিত অর্থের পরিবর্ত্ত হইত না। রূপক বাক্যের প্রাণ; বাক্য আর কিছুই নহে আত্মার বিকাশ মাত্র। সুতরাং বলিতে হইবে রূপক আত্মার আত্মা। আর শুনিতেছ উপনিষদের মধুর স্বর সর্ব্বাণি বিকারা নাম ধেয়ানি সদিত্যেব সত্যম্। সকলই নাম সকলই বিকার। স্থির সত্য এক। অধ্যাস না হইলে নাম হয় না। অতএব সকলই রূপক; এই রূপক কিরণের, ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে—এক অদ্বিতীয় তত্ত্বসূর্য্য।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতায় ইঙ্গরেজ আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে জব চার্ণক সাহেব সংবাদ পাইলেন যে নবাবের সেনাধক্ষ্য আবদুল সমদ খাঁ বহুসংখ্যক, বিশেষতঃ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হুগলী নগরে উপস্থিত হইলেন এবং সুতানুটী গ্রাম বেষ্টন করিয়া ব্রিটীশ দিগকে সমূলে ধ্বংশ করিবার জন্য উৎযোগ করিলেন। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্থানে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করা কোনমতে যুক্তিসঙ্গত নহে স্থির করিয়া ইঙ্গরেজ বণিক সমিতিসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যক্তিগণ ও দ্রব্যাদি লইয়া হিজলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সুতানুটীর কিছু দূর নিম্নে হুগলীনদীর তীরস্থিত 'টানা' দুর্গ তাঁহারা অধিকার করিলেন। এবং সুতানুটী ও হিজলী মধ্যস্থিত স্থানের মধ্যে যাহা কিছু পাইলেন তাহা লুণ্ঠন এবং বিধ্বংশ করিলেন। ঐ সকল বিনষ্ট ও বিধ্বংশ দ্রব্যাদির মধ্যে নবাবের অনেকগুলি শস্যের এবং লবণের গোলা ছিল। এবং যাইবার মুখে তাহারা নদীবক্ষে যে সকল মুসলমানদিগের নৌকা দেখিতে পাইলেন ঐ সকল হস্তগত করিলেন এবং তাহাদিগের নিজের জাহাজ দলের মধ্যে অনেক গুলি বালেশ্বরে প্রেরণ

করিলেন। এবং প্রায় চল্লিশ খানি দেশীয় বণিক দিগের তরণী বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়াছিলেন। (২৫)

হুগলীতে প্রথম ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফৌজদারের যুদ্ধের অবসানের পর যে সন্ধি স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতে ইঙ্গরেজ দিগের হিজলী আগমন পর্য্যন্ত ঘটনাবলির বিষয় অর্ম্মি সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"ক্ষণকালের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল এবং ঐ সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির যাবতীয় অস্থাবর দ্রব্যাদি জাহাজে চালান করা হয়। ইত্যবসরে হুগলীর ফৌজদার বহুসংখ্যক নুতন সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের অভিমত্যানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মুসলমানেরা পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া ও ইঙ্গরেজদিগের কুঠীর চতুর্দ্দিক অবরোধ করিতে চেষ্টা করিল। এই ব্যাপার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জব চার্ণক সাহেব ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, নদীর (ভাগীরথির) পশ্চিম তীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং হুগলী ও হিজলী দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের যে সকল লবণের এবং শস্যাদির গোলা দেখিতে পাইলেন গমনোন্মুখে ঐ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া ছার খার করিতে লাগিলেন। উক্ত দ্বীপে পৌছিয়া জব চার্ণক সাহেব শিবির সন্নিবেশিত করিলেন এবং জাহাজ সকল নদীবক্ষে নোঙ্গর করিতে আদেশ দিলেন"। (২৬)

ইঙ্গরেজ বণিকগণ সুতানুটী পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করিবার জন্য হিজলী দ্বীপ যে কেন নির্ব্বাচিত করিয়া ছিলেন তাহার কারণ যে কি তাহা কোন লেখক কিছু উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইঙ্গরেজগণ এই স্থানটী নবাবের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা পক্ষে বিশেষ উপযোগী ভাবিয়া থাকিবেন। কিন্তু বোধ হয় এই স্থান অপেক্ষা যে এ প্রদেশে আর অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল না তাহা সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদিত ছিলেন না। এখনও যে রূপ আছে ঐ সময়ে ও এই স্থান একটী সমতল নিম্ন দ্বীপ মাত্র ছিল। ঐ স্থানের ভূমির উপরিভাগ সিকতাময় অথবা দীর্ঘাকার তৃণাদিতে পরিবৃত; এবং কেবল মৃগ

(25) Vide Bruce's Annals of the East India Company vol: II, p. 608. and Stuart's India History of Bengal p. 317.

(২৬) এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, অর্ম্মি সাহেব হুগলী হইতে হিজলিতে ইঙ্গরেজ দিগের উপস্থিত হইবার মধ্যে সুতানুটীতে উহাদিগের অবস্থিতির বিষয় কিছু উল্লেখ করিতেছেন না। আবার ব্রুস, Bruce এবং এষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে ইঙ্গরেজগণ যখন হুগলী হইতে হিজ্‌লী অভিমুখে গমন করে তখন ভাগিরথীর পূর্ব্বতীর দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অর্ম্মি সাহেব বলেন যে উহারা পশ্চিমতীর দিয়া গিয়াছিল। ভারতেতিহাস লেখক অর্ম্মিসাহেব যদিও ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। আবার বাঙ্গালা ইতিহাস লেখক এষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস যদিও আমরা ভ্রম শূন্য বলিতে পারিনা, কিন্তু ব্রুস সাহেবের কথা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ নাই। যে হেতু তিনি পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির ইণ্ডিয়া আপিসস্থ দলিল পত্র (Records) দেখিয়া লিখিয়াছিলেন। ব্রুম (Broome) সাহেবের মতও ঐরূপ।

ও ব্যাঘ্রাদির আবাসভূমি। ঐ সমগ্র দ্বীপটীর মধ্যে উত্তম পানীয় জল একেবারে দুষ্প্রাপ্য। উক্ত দ্বীপ ভূমির সহিত একটী সামান্য খাড়ী দ্বারায় বিশ্লিষ্ট এবং ঐ খাড়ীর যে যে স্থান দিয়া ভূমি খণ্ড হইতে দ্বীপে বিনা আয়াসে আসিবার সুবিধা ছিল সেই সেই স্থানে কামানশ্রেণী রাখিবার জন্য স্থান সকল বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। অপরদিকে নদীতে জাহাজ সকল নোঙ্গর করাতে নদীর পথ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্তাধীন হইয়া ছিল। (২৭)

আবদুল সমদ খাঁ সমগ্র সংগ্রহিত সৈন্যের অধিকাংশ লইয়া ইঙ্গরেজদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া হিজলীতে উপস্থিত হইলেন, এবং উক্ত দ্বীপ অধিকার করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজ সৈনিকদিগের সাহসিকতায় প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিফলপ্রযত্ন হইলেন। যখন আবদুল্ দেখিলেন যে তাঁহার সৈন্যবল আর ফলপ্রদ হইতেছে না, তখন তিনি উক্ত স্থানের বিনাশপ্রদ জল বায়ু এবং লবণাক্ত পানীয় জলের উপর ইঙ্গরাজ নিধনের ভার বিন্যস্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং এরূপ করিয়া তিনি বিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এইকয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র ইঙ্গরেজ সৈন্যের অর্দ্ধাংশ জীবনলীলা সম্বরণ করিল। এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া রহিল। ইঙ্গরেজদিগের অবস্থার এই রূপ সন্ধিস্থলে সৌভাগ্যক্রমে নবাব জব চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; চার্ণক সাহেব এ প্রস্তাবে বাঁচিয়া যাইলেন। স্বল্পকালের জন্য শত্রুতাচরণ স্থগিদ হইল এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে একটি সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। উহা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, ইঙ্গরেজগণ বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের যে যে স্থানে কুঠী ছিল সেই সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তণ করিতে পারিবেন; এবং তাহাদিগের বাণিজ্যের উপর শতকরা যে সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল উহা স্থগিদ করা হইল এবং তাঁহারা হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে উলুবেড়িয়া গ্রামে এক খণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হইবেন, উক্ত ভূমির উপরে তাঁহারা গুদাম (magazine) এবং তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরী সমূহের জীর্ণসংস্কারণের জন্য 'ডক' প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ইহার বিনিময়ে ইঙ্গরেজগণ যে সকল মুসলমান দিগের তরী হস্তগত করিয়াছিলেন ঐ সকল তাঁহারা প্রত্যার্পণ করিবেন। (২৮)

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গরেজদিগের প্রতি সহসা এইরূপ অনুকূলতা প্রদর্শন করিবার বিশেষ কারণ ছিল। ইহা বোম্বাই উপকূলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি প্রতিকূলাচরণে কৃতকার্য্যতার ফল স্বরূপ মাত্র। ইঙ্গরেজদিগের একদল জাহাজ মোগলদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবার জন্য সুরাতের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতেছিল। উক্ত জাহাজ-দল অন্যূন এক মিলিয়ান ষ্টার্লিং মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যাদি মোগল প্রজাদিগের

(27) Vide Broome's Histroy of the Rise and Progress of the Bangal Army vol 1. p. 18.

(28) Vide Stuart's History of Bengal p. 317-18.

জাহাজ সকল হইতে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্থরাতস্থ ব্যবসায়ীগণ ভবিষ্যতে বাণিজ্যোদ্দেশে জল যাত্রা হইতে এক কালিন বিরত হইল। কারিকর এবং শিল্পব্যবসায়ীগণ কার্য্যকর্ম্ম না থাকা প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এবং প্রতি বৎসর যে বহুসংখ্যক মুসলমান যাত্রী হজ্ করিবার জন্য মক্কায় গমন করিত ইঙ্গরেজদিগের দৌরাত্মে উহা সম্পূর্ণরূপে স্থগিদ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমোক্ত কারণ সমূহের জন্য বোধ হয় ঔরঙ্গজেব বিশেষ ব্যস্ত হইতেন না, কিন্তু তিনি নিজে যেরূপ ভয়ানক গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, মক্কায় যাত্রিগণে যাইবার ব্যাঘাত দেখিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া দিল্লী হইতে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী ইঙ্গরেজদিগের অভিযোগের বিষয় তদন্ত করিয়া তাঁহারা মোগল কর্ত্তৃক যে সকল ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলেন উহার প্রতিকার করিবার জন্য, প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনার পরেই তাৎকালিক বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা সারজন চাইল্ডের (Sir John-Child) সহিত সম্রাট সন্ধি স্থাপিত করিলেন এবং ঐ মর্ম্মে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। যে সময়ে দশসহস্র পদাতিক এবং তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক কেবল মাত্র একশত ইঙ্গরেজ সৈন্য হিজলীতে আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে ঐ পত্র নবাবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ জাতির সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে যদ্যপি ঐরূপ ঘটনা না ঘটিত তাহা হইলে বোধ হয় হিজলীস্থিত ইঙ্গরেজ দুঃখ কাহিনী ব্রিটীশজাতির নিকট বিবৃত করিবার জন্য একটি মাত্র ও ইঙ্গরেজ সৈনিক উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারিত না। যেরূপ সন্ধি হইল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (২৯)

যে অল্প সংখ্যক ইঙ্গরেজ হিজলীতে অবশিষ্ট ছিল ঐ সকলকে লইয়া জব চার্ণক সাহেব উলুবেড়িয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ডক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু দিবস জীর্ণ সংস্কার না হওয়াতে জাহাজ সকলের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। কিন্তু তিন চারি মাস এই স্থানে অবস্থিতির পর তিনি পূর্ব্বে এই স্থানকে যে প্রকার সুবিধাজনক ভাবিয়াছিলেন, সেইরূপ না হওয়াতে তিনি সুতানটীতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ও তাহা গ্রাহ্য হইল। (৩০)

উহারা সুতানটীতে আগমন করিয়া উপযুক্ত বাস গৃহাদি নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত কুঠিয়াল ও সৈন্যগণ পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে মালবর উপকূলাভিমুখে পুনর্ব্বার যুদ্ধ বাঁধিয়াছে শুনিয়া বাঙ্গালার নবাব হিজলীর সন্ধি রক্ষা করিলেন না। তাঁহার অনুমত্যানুসারে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ ইঙ্গরেজ বণিক দিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল

(29) Vide Orme's Military Transactions in Industan and Broom's Rise and Progress of the Bengal Army vol. I. p. 19.

(30) Vide Stuart's History of Bengal p. 319.

এবং স্বয়ং পূর্ব্ব সময়ের যুদ্ধে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিবার জন্য অনেক মুদ্রা চাহিলেন। অর্ম্মি সাহেব বলেন যে, চার্ণক যুদ্ধ করিতে অথবা উক্ত মুদ্রা দিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হওয়াতে, ইঙ্গরেজগণ নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, এই বিষয় অবগত করিয়া তাঁহার ক্রোধের শান্তি করিবার জন্য ইঙ্গরেজ বণিক প্রতিনিধির সভার দুই জন সভ্যকে ঢাকায় নবাব দরবারে প্রেরণ করিলেন। (৩১) কিন্তু এষ্টুয়র্ট সাহেব বলেন যে, ইঙ্গরেজ বণিক প্রতিনিধি জব চার্ণক সাহেব অস্ত্র শস্ত্রের বলে অথবা প্রার্থিত ক্ষতি পূরণের মুদ্রাপ্রদানেও মুসলমান দিগের শত্রুতাচরণে বাধা প্রদানে অসমর্থ হইয়া নবাবকে বৈরিতাচরণ হইতে বিরত করিবার জন্য ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির সভার দুই জন সভাসদকে প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকা নগরে নবাবের দরবারে প্রেরণ করেন। হুগলীস্থ নবাব কর্ম্মচারীদিগের সহিত কোন রূপ সংঘর্ষণ হইতে দূরে থাকিবার জন্য এবং ভাগিরথীগর্ভ ক্রমশঃ মৃত্তিকায় পূর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বৃহৎ তরণী সকল উক্ত নগরে (হুগলী) আসিবার পক্ষে দৈনন্দিন অসুবিধা বৃদ্ধি হওয়া বশতঃ সুতানুটীতে অবস্থিতি করিবার ইঙ্গরাজদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই সকল বিষয় নবাবের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রতিনিধিদ্বয় আদিষ্ট হইয়াছিলেন। (৩২)

যে সময়ে প্রতিনিধিদ্বয় ঢাকাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী ঘটনার অসমবায়ী কারণে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য প্রণালীর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যখন কোর্ট অব ডিরেকটস, আডমিরাল নিকলসনের যুদ্ধের অকৃতকার্য্যতা এবং জব চার্ণক সাহেবের ও তাঁহার সভার কার্য্যের দৃঢ়তার অভাব ও অস্থিরতার বিষয় অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা কাপ্তেন হিদের অনুমত্যাধীনে "ডিফেন্স" নামক ৬৪ কামান যুক্ত বৃহৎ এবং ১৬০ জন সৈনিক সম্বলিত এক খানি ক্ষুদ্র রণতরী প্রেরণ করিলেন। এবং তিনি এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন যে, যদ্যপি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে কোর্টের পূর্ব্বাজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিবেন; নচেৎ তাঁহাদিগের যাবতীয় কর্ম্মচারী ও দ্রব্যাদি লইয়া মান্দ্রাজে আগমন করিবেন। (৩৩)

অত্যন্ত সাহসিক পুরুষ হইলে ও হিদ সাহেব অত্যন্ত অস্থিরপ্রকৃতির লোক ছিলেন কেহ কেহ বলেন তাঁহার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তিনি ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুতানুটীতে পৌছিয়াছিলেন। (৩৪) তথায় উপস্থিত হইয়া নবাবের চাতুরীর বিষয় অবগত হইয়া চার্ণক এবং তাঁহার সভাসদগণের পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া নবাবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এইরূপ

(31) Vide Orme's Military Transactions in Industan.

(32) Vide Stuart's History of Bengal p. 320.

(33) Vide Bruce's Annals of the East India Company vol. II. p. 595 and Stuart's History of Bengal p. 319.

(34) Vide Orme's Military Transaction in Industan vol. 2. p. 14.

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি তত্রস্থ বণিক সমিতির যাবতীয় কর্ম্মচারী এবং ধন ও দ্রব্যাদি সহ জাহাজে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং ৮ই নবেম্বর বালেশ্বরের পথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (৩৫) উক্তস্থানের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নবাবের হইয়া হিদ সাহেবের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না দেখিয়া যাহাতে ইঙ্গরেজগণ কোনরূপ বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত না হইতে পারে, সেই হেতু তিনি বালেশ্বরস্থ ইঙ্গরেজ কুঠীর দুই জন অধ্যক্ষকে জামিন স্বরূপ বন্দী করিয়া রাখিলেন। বালেশ্বরের ত এইরূপ অবস্থা। অন্যত্র দুইজন ইঙ্গরেজ ঢাকা নগরে প্রেরিত হইয়াছিল এবং অন্য দুইজন কুঠীয়াল বাঙ্গালার অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এই সমস্ত বিষয় বিদিত হইয়াও হিদ সাহেব কতকগুলি নৌসেনা সমভিব্যাহারে বালেশ্বরে নামিয়া উক্ত অরক্ষিত নগর আক্রমণ করিলেন। যে দিবস এইরূপ গর্হিত কার্য্য সংসাধিত হয় সেই দিবসেই ঢাকা নগরে প্রেরিত ইঙ্গরেজ প্রতিনিধিদ্বয়ের সহিত নবাবের যে সন্ধি পত্র লিপিবদ্ধ হয়, তাহার এক খানি প্রতিলিপি বালেশ্বরের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে নবাব পরিচালিত সৈন্য সহ ইঙ্গরেজ রণ-তরি আরাকানের রাজাকে আক্রমণ করিবে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। হিদ সাহেব এই ছলে চট্টগ্রাম আক্রমণে সমর্থ হইবেন ভাবিয়া উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। (৩৬)

ইঙ্গরেজ সৈন্য ও নাবিকগণ প্রচুর রূপে বালেশ্বর নগর লুণ্ঠন করিয়া, কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের মৌলিক উদ্দেশ্যানুসারে চট্টগ্রাম অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর বালেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া ১৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে উপস্থিত হইল। (৩৭) ঐ নগর বিলক্ষণ সুরক্ষিত অবস্থার দেখিয়া কাপ্তেন হিদ সাহেব আক্রমণ করিতে বিশেষ মনযোগ প্রদান করিলেন না; অথচ যেন নবাবের পক্ষে আরাকান রাজের বিরুদ্ধে আসিয়াছেন এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি আরাকানরাজের নিকট এইরূপ সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার (আরাকান রাজের) পক্ষ হইয়া নবাবের বিরূদ্ধে অস্ত্র গ্রহণে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু তাঁহাকে চট্টগ্রাম আক্রমণে সম্মতি প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু প্রাচ্য রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় চিরপ্রসিদ্ধ কালবিলম্বতা সন্দর্শনে, বিশেষতঃ তাহার স্বভাবের চাঞ্চল্য বশতঃ কিঞ্চিৎমাত্র ধৈর্য্যবলম্বন করিতে অপারগ হইয়া আরাকানাধিপতির উপর বিরক্ত হইয়া ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিবস যাবতীয় জাহাজ দল, বণিক সমিতির দ্রব্যাদি এবং কর্ম্মচারীকে

(35) Broom's History of the Rise and Progress of the Bengal Army. vol. I. p. 20.

(36) Vide Bruce's Military Transactions in Industan vol. 2. p. 14 and 15.

(37) Bruc's Annnals of the East India Company. vol. II. p. 648 and Stuart's History of Bengal. p. 321.

লইয়া মান্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেবল মাত্র ঢাকা নগরে প্রেরিত দুইজন প্রতিনিধি, এবং বালেশ্বরস্থ দুইজন ও বাঙ্গালার অপর স্থানীয় কুঠির দুইজন কারারুদ্ধ কুঠীয়ালদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণের জন্য ফোর্টসেন্ট জর্জের প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার নিকট নিজের দোষ কাটাইবার জন্য এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, চতুর্দ্দিকে কেবল মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত হইয়া তিনি এই রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। (৩৮)

উপরোক্ত ঘটনাতে সম্রাট ঔরাঙ্গজেব ইঙ্গরেজদিগের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে এক কালিন দূরীভূত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়া ছিলেন। বঙ্গদেশে তাহাদিগের যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহা সমস্ত ক্রোক করা হইয়াছিল; এবং যে সকল ইঙ্গরেজ বণিক প্রতিনিধি বঙ্গদেশ হইতে পলাইতে সক্ষম হয় নাই তাহাদিগকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। মস্থুলিপত্তন ও ভিজিগাপত্তন প্রভৃতি স্থানে যে সকল কুঠী ছিল ঐ সকল মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বংশ হইয়াছিল। এবং ঐ স্থানদ্বয় যে সকল ইঙ্গরেজ অবস্থিতি করিতেছিল তাঁহাদিগের জীবন বিনষ্ট করা হইয়াছিল। (৩৯)

এই সময়ে বঙ্গের নবাব বার্দ্ধক্য বশতঃ বাঙ্গালার সুবাদারী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আগরা নগরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ঐ স্থানে অল্প দিবস মধ্যে জীবন লীলা সম্বরণ করিলেন, সুবিখ্যাত আলিমরদান খাঁর পুত্র এব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি দয়ালু এবং নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি কার্য্যে তেজস্বী ও উৎসাহযুক্ত ছিলেন না। যে সকল ইঙ্গরেজ কুঠীয়াল কারারুদ্ধ ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করা তাঁহার রাজকার্য্যের একটী প্রথম কার্য্য। অল্প দিন পরেই সম্রাটের আজ্ঞানুসারে নবাব ইঙ্গরেজ বণিকদিগকে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পুনর্সংস্থাপিত হইবার জন্য জব চার্ণককে পত্র লিখিলেন। যদিও ঔরঙ্গজেব রাগান্ধ হইয়া ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির বিস্তৃত বাণিজ্য বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের রাজস্বের অনেকাংশ হ্রাস হইয়া ছিল। ইহা ব্যতীত ইঙ্গরেজ জল দস্যুগণের অত্যাচার ভারতীয় মুসলমান প্রজাদিগের সঙ্গে এবং আরব দেশের ধর্ম্ম এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্বন্ধ একরূপ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্ম ভাবে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল। এবং তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে সর্ব্বদা তাঁহার রিপু সকলকে তাঁহার লাভালাভ ও রাজনীতির অনুবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইবেন, সেই কারণ বশতঃই তিনি তাঁহার ক্রোধকে শীঘ্র সম্বরণে সমর্থ হইয়া

(38) Vide Orme's Military Transactions in Industan vol. II. p. 15 and Broome's History of the Rise and progress of the Bengal Army vol. I. p. 22.

(39) Vide Stuarts History of Bengal p. 322.

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের ইঙ্গরেজ প্রতি নিধি শাসনকর্তা সার জন চাইল্ডের Sir Johnchild প্রেরিত ওয়েলডন এবং নোভেরো Messrs Weldon | Novarro নামক দুইজন ইঙ্গরেজের সহিত সন্ধি করিবার জন্য তাঁহার সচিবকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। (৪০) এইসন্ধির ফল সন্তোষজনক হইয়াছিল। বিদ্রোহী প্রজাদিগকে ক্ষমা করিবার সময় রাজা প্রজাদিগের প্রতি যে রূপ ভৎর্সনা করেন, সম্রাট যদিও ইঙ্গরেজ দিগের প্রতি সেইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধি দ্বারায় ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে যাবতীয় বিষয় সুবিধাজনক হইয়াছিল, এমন কি, তাঁহাদিগের পূর্ব্বের সমস্ত বিশেষ অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগল গবর্ণমেন্ট যে প্রণালীতে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার আদর্শ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রেলের ফারমন্দ সহ নবাব এব্রাহিম খাঁকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠকদিগের গোচরার্থ নিম্ন উহার অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল ;—

"তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, ইঙ্গরেজরা তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ও অনিয়মিত কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিয়াছে, ইহা তাহাদিগের সৌভাগ্য ; এবং তাহাদিগের পূর্ব্ব উন্নত অবস্থা হইতে পতিত হওয়াতে তাহারা এক্ষণে তাহাদিগের উকীল দ্বারায় তাহাদিগের জীবন রক্ষার জন্য আবেদন এবং তাহাদিগের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাতে আমার উহাদিগের প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ থাকা প্রযুক্ত উহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। সুতরাং আমার এই ফারমান্দ প্রাপ্ত হইতে উহাদিগকে আর কোন প্রকার কষ্ট প্রদান করিবে না ; এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে দিবে। এবং আমি ইচ্ছাকরি যে, আমার এই আজ্ঞা তোমার দ্বারায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইবে"। (৪১)

ইঙ্গরেজগণ বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের অপেক্ষা অধিকতর বিশেষাধিকার সহ বাণিজ্য করিবার জন্য নবাব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং এই আমন্ত্রণ নবাব অকপট অন্তঃকরণে করিয়াছেন বলিয়া ইঙ্গরাজদিগের বিশ্বাস হইলেও পূর্ব্বে তাঁহারা যেরূপ প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা এ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা যে পর্য্যন্ত না স্বয়ং সম্রাটের

(40) Vide Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army vol. I. pp. 22. and 23.

(41) "You must understand that it has been the good fortune of the English to repent them of their irregular past proceedings; and they not being in their former greatness, have by their Vakeels petitioned for their lives and a pardon for their faults, which out of my extraordinary favor towards them, I have accordingly granted: therefore upon receipt hereof, my Phirmaund, you must not create them any further trouble, but let them trade freely in your government as formerly: and this order I expect you see strictly observed."—*Stuart's History of Bengal Appendix No. 6.*—

নিকট হইতে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকারের জন্য একটী বিশেষ ফারমান্দ প্রাপ্ত না হয়েন তাবৎ তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইতে প্রস্তুত হয়েন নাই। ইহা ব্যতীত কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না সম্রাট ফারমান্দ প্রেরণ করেন এবং স্থতাম্বটীগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন ও উক্ত স্থানকে দুর্গদ্বারায় বেষ্টন করিবার অধিকার প্রাপ্ত না হয়েন সে পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা বঙ্গদেশে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন না করেন। (৪২)

ইঙ্গরেজ-বণিকদিগের পত্র প্রাপ্ত হইয়া নবাব পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে আসিতে অনুরোধ করিলেন এবং উপরোক্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে এইরূপ লিখিলেন যে তাঁহারা (English) যে সম্রাটের ফারমন্দ চাহেন তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু উহা আসিয়া উপস্থিত হইতে অবশ্যই কিছু বিলম্ব হইবে ইত্যবসরে তাঁহারা আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতে পারেন; যেহেতু নবাব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি তাঁহাদিগকে বন্ধুভাবে রক্ষা করিবেন। নবাবের এই লিপি প্রাপ্ত হইয়া ঐ লিপি লিখিত ভাষার নম্রতা প্রদর্শনে তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়ের সারল্য বিষয়ে ইঙ্গরেজদিগের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ফলে জব চার্ণকসাহেব তাঁহার যাবতীয় সভার সভ্য ও বণিক সমিতির কর্ম্মচারী এবং ত্রিংশতটী সৈনিক সহকারে মান্দ্রাজনগর পরিত্যাগ করিয়া ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে আগষ্ট তারিখে স্থতাম্বটীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে নবাবের আজ্ঞানুযায়ী হুগলীর প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা বা ফৌজদার তাঁহাদিগকে বিশেষ ভদ্রতার সহিত অভ্যার্থনা করিলেন। (৪৩)

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

(42) Vide Broome's History of the Rise and Progress of the English Army in Bengal. vol. I. pp. 23 and 24.

(43) Vide Stuart's History of Bengal p. 326 and Orme's in his History of the Military Transactions in Industan says they arrived at Sutanuty in the end of July 1690.

হিতাহিত জ্ঞানের মূল কি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে কর্ম্মে হিত হয়, সেই কর্ম্মই বৈধ ও ধর্ম্মমূলক, এবং যাহাতে অহিত হয় তাহাই অবৈধ ও অধর্ম্মমূলক। দ্বিতীয় মতের আর একটী সাধারণ লক্ষণ এই যে এই মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতে কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করা ঈশ্বর বিশ্বাস সাপেক্ষ নহে। এতদ্ভিন্ন অন্যআর একটি মত আছে ইহা এই প্রকার—মানবগণের কর্ত্তব্যা-

কর্ত্তব্যবতা নিরূপণের ক্ষমতা তাহাদের আদিম পাপ জনিত স্বর্গচ্যুতি হওয়াতে তিরোহিত হইয়াছে তাহাদের পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ক যে স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তি ছিল তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ঈশ্বরোক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন মানব মণ্ডলীর এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণের উপায়ান্তর নাই। যে সকল মতের এখানে উল্লেখ মাত্র করা গেল সে গুলি এত বিস্তৃত ও এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের পরস্পরের যোগে ও সাহায্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে যে সে গুলির সম্যক পর্য্যালোচনা করা একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ মতজালের ভিতর পড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা এবং নানা তর্কের কথা তুলিলে মূল প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা করা আরও জটিল ও কূট হইয়া পড়িবে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমরা এখানে মৌলিক বা প্রধান মত গুলি লইয়া যথাসাধ্য আলোচনা করিব। এখানে কর্ম্মের বৈধাবৈধতা প্রতিপাদক যে তিনটি প্রধান মতের বিষয় বলা হইল তাহা ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসার মত দেখা যাইবে। উদাহারণ স্থলে, আমরা টমাস্ হবস্ (Thomas Hobbes) কর্ম্মের বৈধাবৈধতা জানিবার যে প্রণালী ধার্য্য করিয়াছেন তাহার বিষয় বলিতে পারি। তিনি বলেন রাজা কেবল পরমেশ্বরের (তাঁহার এই জঘন্য মতের ভিতর একটা কেবল এই ভাল কথা আছে—যে তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী) নিকট দায়ী; কোন মানবের নিকট তিনি কোন প্রকারে দায়ী নহেন। এই প্রকার রাজা যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাই বৈধ ও ন্যায়, ও তৎবিরুদ্ধ কর্ম্ম মাত্রই অবৈধ। (Hobbes)হবসের মতে রাজশক্তি ব্যক্তি সমূহে না থাকিয়া এক ব্যক্তিতে থাকাই ভাল। তিনি যে মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিশেষ রূপে বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তিনি ন্যায়ান্যায়ের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে এ কথাটি বড় মানিতেন না। মতটি নূতন নহে। প্লেটো প্রসিদ্ধ সিমেকাশের Thrasymachus মুখদিয়া নীতি সম্বন্ধে যেরূপ মত ব্যক্ত করাইয়াছেন তাহার সহিত এই মতের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যাইবে। তিনি (Hobbes) যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে কারণে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Leviathan রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার মতের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। ক্রম্ওয়েল্ Cromwell যখন প্রজাতন্ত্র শাসনের কথায় ইংলণ্ড মাতাইয়া তুলেন Hobbes সেই মতের প্রতিবাদ করিতে ও প্রজাতন্ত্র শাসনের গতি ফিরাইতে নিজগ্রন্থ রচনা করেন। যে সকল ইউরোপীয়েরা প্রাচ্য দেশীয় নৃপতিদিগের স্বেচ্ছাচারিতা লইয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া থাকেন আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দেশীয় এক জন দার্শনিকের এইরূপ প্রলাপ বাক্য গুলিকে বিশেষ করিয়া দেখিয়া তাহার পর উপহাস করিতে অনুরোধ করি। Au-

stin হবসের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, নীতি বিষয়ে এইরূপ অসার মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে জগতের লোকের কিছু হিত নাই, বরং অহিতের সম্ভাবনাই অধিক সুতরাং এই অসার মতটি যতই লোকে বিস্মৃত হয় বা অগ্রাহ্য করে ততই মঙ্গল। আমাদের আরও বিশ্বাস যে এই মত এত সামান্য ভ্রমে পরিপূর্ণ যে ইহার প্রতিবাদ করিতে কাহারও মস্তিষ্ক পরিচালনা করার প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার নীতি বিষয়ক মতামত ইউরোপীয় দার্শনিকগণ প্রচার করিয়াছেন প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এখনে তাহার বিষয় কিছুই বলিব না।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে নীতি সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় মতটির সহিত বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোন বিরোধ নাই; আমাদের দ্বিতীয় মত লইয়াই যাবতীয় বিরোধ। আমরা প্রথম মতটি বিশ্বাস করি, তাহাই স্থাপন করিতে এখানে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। প্রথমটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে দ্বিতীয়টি অবশ্যই ভ্রম-সঙ্কুল। দ্বিতীয় মতটির স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি খণ্ডন পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়া প্রথম মতটি বিশুদ্ধ করিয়া স্থাপনের চেষ্টাকরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় মতটি কি? তাহা দেখাইতে আমরা শ্রীমান্ জনষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ ইউটিলিটেরিয়ানিজম্ Utilitarianism নামক পুস্তকই অবলম্বন করিব। এইরূপ করিবার পক্ষে আমাদের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ। যে সকল যুক্তি দ্বিতীয় মতের অনুকূলে দেখান যাইতে পারে তাহা শ্রীমান্ জনষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয় প্রস্তাবিত পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ। শ্রীমান্ জনষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয়ের লিখিত সকল পুস্তকেরই সাধারণ লক্ষণ এই যে তিনি যে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাঁহার মতাবলম্বীদিগের পক্ষে সেই সেই পুস্তকগুলি সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। উদাহরণ স্থলে তাঁহার প্রণীত System of Logic, Political Economy এবং Liberty প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যে মতের নেতা বা উপদেষ্টা বা ব্যাখ্যাতা শ্রীমান জনষ্টুয়ার্ট মিল সেই মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে উক্ত অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়ের সেই মতের স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে; আবার পক্ষান্তরে সেই মতটি দূষিত করিতে হইলে শ্রীমান্ জন ষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয় সেই মত স্থাপনোদ্দেশ্যে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন সেই যুক্তিগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন ভ্রমপ্রবাদ থাকিলে তাহা দেখান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আমরা এই সকল কারণেই Utilitarianism ইউটিলিটেরিয়ানিজম্ গ্রন্থকে এখানে দ্বিতীয় মতস্থাপনের পক্ষে আদর্শ পুস্তক মনে করিয়া ঐ পুস্তক লিখিত যুক্তিগুলির একে একে দূষণীয়তা প্রদর্শন করিয়া প্রথম মতটির অনুকূলে যে সকল

যুক্তি আছে তাহা দেখাইব। ইংলণ্ডের সেই অসাধারণ দার্শনিক, সমগ্র ইউরোপীয় দর্শনাকাশের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজন অতি সর্ব্ব প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি, শ্রীমান্ জনষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণে সাহসী হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার লেখা বিশেষ মতে আলোচনা করিয়া যাহা কিছু আমরা নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়াছি তাহা ভালকরিয়া বুঝিতে চেষ্টাকরা, কিংবা তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া তাহার মধ্যে আমাদের যদি কোন ভ্রম প্রমাদাদি দোষ ঘটিয়া থাকে তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমান্ জনষ্টুয়ার্ট মিল মহাশয়ের স্থাপিত মত সমূহের মধ্যে অনেকগুলিরই প্রতি অনাস্থাবান্ কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মাননা করিতে আমরা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহি। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কথা কহিতে আমরা নিজেকে যোগ্য বলিয়া কিছুতেই বিবেচনা করি না। সেই মহাত্মার প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আমরা আমাদের এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। আমরা অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বুঝিয়াছি এবং যাহা কিছু মনে স্থির করিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতেও আমরা কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত নহি। কারণ আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমাদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা নহে।

এতদূরে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বাস্তবিক উপনীত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বিতীয় মতটি কি তাহা আমরা জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রণীত Utilitarianism নামক পুস্তক হইতে দেখাইব। মিল এই মতটিকে নিম্ন লিখিত ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ—

"The creed which accepts as the foundation of morals, utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that the actions are right in proportion, as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness-By hapiness is intended pleasure and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure

Utilitarianism—9—10 pages.

তবেই দেখা গেল যে নীতি সম্বন্ধে মিল বলিয়াছেন—যে কর্ম্মের দ্বারা সুখ বৃদ্ধি হয় তাহাই ন্যায় কর্ম্ম এবং যে কর্ম্মের দ্বারা তদ্বিপরীত দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাই অন্যায় কর্ম্ম। এখানে আমরা promote অর্থাৎ বৃদ্ধিকরা এই শব্দটি লইয়া, ইচ্ছাকরিলে, একটু তর্ক করিতে পারি। তর্কটী অতি সামান্য, ও মিলের পুস্তকের অন্যান্য ভাগে তাঁহার অর্থ পরিস্ফুট আছে জানিয়া এই সামান্য কথাটা লইয়া বিশেষ তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিনা। এখন প্রশ্ন হইতেছে

যে এই সুখ ও এই দুঃখ কি? মিল নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন যে—এই সুখ বলিলে দুইটি বুঝায়—একটি কর্ম্ম সমাধানান্তে আনন্দানুভব এবং হিত সাধন অন্যটি দুঃখের অভাব। আবার এই প্রকার দুঃখও দ্বিবিধ—এক, কর্ম্মের সমাধানান্তে কষ্টানুভূতি ও তৎকর্ম্ম কর্ত্তৃক অহিত সাধন, অন্য সুখের অভাব। মিলের কথাটা এখনও ভাল করিয়া বোঝা গেল না। এই যে সুখ ও দুঃখ, এবং হিত ও অহিতের দ্বারা কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে মিল উপদেশ দিতেছেন—এই সকল সুখ ও দুঃখ, এবং হিত ও অহিত কাহার? অনেকেই অনুমান করিবেন যে, কর্ত্তার হিতাহিত ও সুখদুঃখ বিবেচনা করিয়াই অবশ্য কর্ত্তা নিজ কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিবেন কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। মিল তদীয় Utilitarianism নামক পুস্তকের ১৭পৃষ্ঠায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, কেবল কর্ত্তার নিজের হিতাহিত বা সুখদুঃখ নহে সমস্ত মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ বিবেচনা করিয়া কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে হইবে। তাঁহার Utilitarianism নামক পুস্তকের ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় যাহা লেখা আছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"** * for that standard is not the agent's own greatest happiness, but the greatest amount of happiness altogether."

Utilitarianism. page 16.

"* * * which may accordingly be defined, the rules and precepts for human conduct, by the observance of which an existance, such as has been described, might be to the greatest extent possible, secured to all mankind."

Utilitarianism page 17.

এখন মিল যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝা গেল। তাঁহার মতে যে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের নিজের ও সমস্ত মানব জাতির হিত হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ও তাহারই পারিভাষিক নাম ধর্ম্ম; এবং যাহা দ্বারা আমাদের ও সমস্ত মানব জাতির অহিত হইয়া থাকে তাহাই আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, ও তাহারই নামান্তর অধর্ম্ম। এই মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে অনেক গুলি অপ্রমাণিক কথা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এমন কি ঐ সমুদায় অপ্রামাণিক কথার উপরই মিলের আলোচ্য নীতি বিষয়ক বিখ্যাত মতটি নির্ভর করিতেছে। আমরা এই সকল অপ্রামাণিক কথা গুলি মিলের মতের অযৌক্তিকতা দেখাইবার সময় বিস্তার করিয়া দেখাইব। মিলের এই মতটি বিস্তার পূর্ব্বক খণ্ডন করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে। মিল বলেন, যে কর্ম্মের ফল হিতকর ও শুভ জনক তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও যাহার ফল অহিতকর ও অশুভ জনক তাহাই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম—তদ্বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিক গণ, যাঁহাদিগকে আমাদের এই প্রবন্ধের প্রথম মতটির প্রবর্ত্তক বা ব্যাখ্যাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহারা বলেন কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা

সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের স্বাভাবিক ঐ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে কোন প্রকার বহু দর্শিতার (experience) প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে আসল বিবাদের কথা এই দাঁড়াইতেছে যে এক দল বলিতেছেন যে মনের স্বাভাবিক ক্ষমতা নাই অন্যদল বলিতেছেন যে আমাদের মনের এমন স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে যাহাতে আমরা বহুদর্শিতার পূর্ব্বে কর্ম্মের বৈধাবৈধতা জানিতে পারি এবং বহু দর্শনে অর্থাৎ কর্ম্মের ফল দর্শনে ও ভোগে সেই জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়। প্রমাণীকৃত হয় বলিয়া এমত অর্থ বুঝান আমাদিগের অভিপ্রেত নহে যে কর্ম্মের ফল ভোগ ও দর্শনাদি রূপ বহু দর্শনের (experience) পূর্ব্বে আমাদের কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপ্রামাণিক অমূলক ছিল। আমাদের বক্তব্য এই যে আমরা এখানে যাহাকে বহু দর্শন (অর্থাৎ কর্ম্ম সমূহের ফলভোগ ও দর্শন) বলিতেছি তাহার দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান লব্ধ নীতি সম্বন্ধীয় মত নির্ণীত কর্ম্ম ফল সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষার সত্যতা কার্য্যতঃ প্রমাণীকৃত হয়। আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানে বুঝি যে এইকর্ম্মটি অন্যায়—সুতরাং তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত মনে করি; যদি ইহাতে ক্ষমাবান্ হইয়া উঠি তাহা হইলে সেই কর্ম্মের ফলে আমরা নিজে দেখিব যে উহার দ্বারা আমাদের হিত সাধিত কিম্বা অমঙ্গল দূরীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মের এইরূপ ফল সম্বন্ধে আমাদের যে আশা হইয়া থাকে তাহাকে আমি এখানে "কর্ম্মের ফল সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা" বলিলাম। এই দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক যে অংশ লইয়া প্রকৃত বিরোধ তাহা বুঝিতে মিলের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকের ভ্রম হওয়া সম্ভব নহে। তিনি যথার্থই লিখিয়াছেন ;—

"The intention no less than what may be termed the inductive, school of ethics, insists on the necessity of general laws. They both agree that the morality of an individual action is not a question of direct preception, but of the application of a law to an individual case. They recognise also to a great extent, the same moral laws; but differ as to their evidence and the source from which they derive their authority. According to the one opinion, the principles of morals are evident a pardon, requiring nothing to command assent, except the meanings of the terms be understood. According to the other doctrine, right and wrong, as well as truth and and Falsehood are questions of observation and experience." Utilitarianism pages 3-4.

মিলের পুস্তক হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইল, তাহার অনুবাদ করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই; ইহার স্থূল মর্ম্ম ইঙ্গিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি;. যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহাদের বুঝিতে বেশ সুবিধা হইবে

ভাবিয়া এই অংশ টুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এখন যদি এমত প্রতিপন্ন হয় যে, বহুদর্শন ব্যতীত মনে কোন স্বাভাবিক বৃত্তি বা ক্ষমতা থাকিতে পারে না যাহার সাহায্যে আমরা কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে পারি; আর ঐরূপ কোন স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তি থাকার আভাস পাইয়াও যদি সেই অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া তদনুরূপ কর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার ফল কি হইবে ইহার যখন নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ বহু দর্শন ব্যতীত পাওয়া যাইতে পারে না; এই দুই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অবশ্য মিলেরই জয়—নচেৎ তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বীদেরই জয় নিশ্চয়। এই সকল কথা মীমাংসার জন্য আমরা এখানে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে মনের এইরূপ স্বাভাবিক ক্ষমতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; উহা অস্বীকার করিলে, একটি তত্ব স্বতঃ প্রামাণ্য বলিয়া অন্য প্রমাণাভাবে উহাকে মানিয়া লইতে হইবে এই ভয়ে যদি তাহাকে বর্জ্জন করা যায় তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অনেক গুলি অপ্রাপ্রাণিক কথা মানিয়া না লইলে কোন প্রশ্নের বিশেষতঃ নীতিবিষয়ক বর্ত্তমান গুরুতর প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হয় না। আরও আমরা দেখাইব যে মনের স্বাভাবিক বৃত্তি বিশেষ—যাহা দ্বারা আমরা তর্ক শাস্ত্রের মূল কথা গুলি জানিতে পারি, যাহার দ্বারা স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান এইজ্ঞান হইয়া থাকে এবং যাহা দ্বারা নীতি সম্বন্ধীয় মূল কথা গুলি আমাদের মনে স্বতঃই প্রকাশ হয়—অস্বীকার করিলে দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, তর্ক শাস্ত্রবল সমুদায়ের সত্যতা সম্বন্ধে কি এক ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইবে!

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

কবিতা।

স্রোতে ফুল।

১

বিশাল বারিধি বক্ষে যাও ফুল ভেসে,
তুমি যাও ফুল ভেসে,
অমনি আনন্দ-রঙ্গে, অমনি ক্রীড়ার সঙ্গে,
জীবাত্মা প্রয়াণ করে, পরমাত্মা আশে,
বিশাল বারিধি বক্ষে যাও ফুল ভেসে!

২

সুষমায় কেহ নহে তোমা সমতুল,
পুষ্প তোমা সমতুল,
কাননের শোভাকর, ফুল তুমি মনোহর,
দেখি তোমা জ্ঞান-চক্ষে, আনন্দ বিপুল,
নেচে নেচে রঙ্গে ভঙ্গে যাও কোথা ফুল!

৩

শিশু-চিত্তে পাই শুধু তোমার তুলনা,
ফুল, তোমার তুলনা,
পবিত্রতা-মাখা-কায়, স্বর্গ-দীপ্তি-স্ফূর্ত্তিপায়,
বিভু-প্রেমে আছ বদ্ধ, প্রেমিক দুজনা,
শিশু চিত্তে পাই শুধু, তোমার তুলনা!

৪

নির্ম্মল, পবিত্র দোঁহে একই কারণে,
পুষ্প একই কারণে
কিনিয়মে আছ বাঁধা, বুঝিতে লাগয়ে ধাঁধা,
কারসাধ্য তুটে সেই কৌশল-গ্রন্থনে,
নর-বুদ্ধি হীনপ্রভ, তাহা উদ্‌ঘাটনে !

৫

ভেসে যাও ফুল তুমি অনন্ত সাগরে,
ফুল, অনন্ত সাগরে,
ভাসাও আমার হিয়া, তত্ত্বজ্ঞান পয়ঃ দিয়া,
অজ্ঞান-তিমির যাক্, সুদূর অন্তরে,
ভেসে যাও ফুল তুমি অনন্ত সাগরে !

৬

একটি সন্ধান কিন্তু জিজ্ঞাস সাগরে,
ফুল, জিজ্ঞাস সাগরে,
মদ-স্ফীত নর-চিত, মান-গর্ব্বে বিস্ফারিত,
ক্ষুদ্রতম ঠ্যাকে কেন, সৃষ্টির মাঝারে,
সাগর, বিপুল-বক্ষ, জিজ্ঞাস তাহারে !

শ্রীবামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

পরিবর্ত্তন *

ফুলবালা হাসে ওই আজ—
কাল কোথা যায় !
যারে চাই রাখি ধ'রে
সেই ত ভুলায়ে মোরে
কোথায় লুকায় !
ইহাই কি জগতের সুখ ?
যেন আমানিশা'পরে
চপলা ক্ষণের তরে
দেখায় স্বণার হাসি মুখ !
ক'দিন মানব হৃদে ধরমের ভয় ?
ক'দিন জগত মাঝে প্রণয়ের জয় ?
রমনীর ভালবাসা, হায় !
লভিতে দারুণ নিরাশায়
জীবনের বিরামে বিকায় ।
উজল য'দিন সুনীল গগণ,
হাসিছে হরসে কুসুম রতন,
নিশিতে যে জন ফিরাবে নয়ন
স্নেহ বরগিছে এখন (ও) যখন,
চারিপাশে যতদিন বিরাজে তোমায়
শান্তির সুন্দর নিকেতন,—
নিদ্রায় স্বপন-রথে
আকাশ-কুসুম-পথে
মনসাধে কর বিচরণ।
তারপর আঁখিমেলি
করিও রোদন ।

শ্রীরাজচন্দ্র গোস্বামী।

* শেলির অনুকরণ

বালিকা শ্মশানে ।

(গভীর নিশীথে ।)

গভীর নিস্তব্ধ নিশি, আঁধারে ভ'রেছে দিশি,
সাড়া শব্দ হীন,
অনন্ত আঁধার কোলে অনন্ত আঁধার দোলে,
মহা শূন্য মহা শূন্যে লীন !
মহান্ সমাধি পরে ধরা যেন ধ্যান করে
স্পন্দন রহিত !
বিশ্ব-পারাবারে বিন্দু, নদ, নদী, শৈল, সিন্ধু,
মন্ত্র বলে করিয়া মোহিত
বিস্তারি বিরাট কায়া, কি এক মহান্ ছায়া
ঘুরিছে চৌদিক !

আকাশে অগণ্য তারা ভীত চমকিত পারা
চাহিয়া র'য়েছে অনিমিখ !
নীরবে দেখেনা কেউ, ভেদিয়া অগণ্য ঢেউ,
কাল সিন্ধু জলে,—
অনন্তের সীমা ছাড়ি, ধরিয়া অনন্ত পাড়ি
দণ্ড, পল ভেসে ভেসে চলে !
এ হেন ভীষণ রাত্রি, একাকী বালিকা যাত্রী
আঁধার সাগরে,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া কাননের পথ দিয়া
উতরিলা শ্মশান প্রান্তরে !
চারিদিকে বিভীষিকা, জ্বলিছে আলেয়া শিখা
ক্ষণ ক্ষণ কাল !
করি ঘোর কলরব ধরিয়া গলিত শব
টানাটানি করে ফেরুপাল !
ভেদিয়া বায়ুরস্তর, সে মহাভীষণ স্বর
ছুঁইছে আকাশ,
মৃত শব গন্ধ লয়ে, ভ্রমিতেছে মত্ত হ'য়ে
শ্মশান বাতাস !

বালিকা যোগিনী বেশে, এলো থেলো মুক্ত কেশে,
ঘুরিয়া চৌদিক।
একটি কঙ্কাল ধরি, তুলি নিয়া বক্ষ পরি
চাহিয়া রহিল অনিমিখ !
প্রতি দেহ রন্ধ্র গত বিজাতীয় মক্ষী যত
বাহিরিল ছুটে ;
বালিকার চারি ধার করি ঘোর মহামার
আক্রমিল জুটে !
তীব্র পূতি গন্ধ রাশি ঝলকে ঝলকে পশি,
নাশিকা বিবরে,
নাসারন্ধ্র পূর্ণ করি প্রতি স্নায়ু-সূত্র ধরি
কিলি বিলি করে !
গায়ে উড়ে পড়ে ছাই, কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নাই ;
দগ্ধ শব মুখে—
একটী চুম্বন করি হৃদি মাঝে চেপে ধরি
ঘুমায়ে পড়িল বালা সুখে !

শ্রীযদুনাথ ঘটক।

মৃচ্ছকটিক।

(কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা।)

নাটক এবং প্রকরণে যে কি ভেদ তাহা যথাশাস্ত্র বলা হইল, পাঠকগণ বোধ হয় সেই রূপই বুঝিলেন। যথাশাস্ত্র ভিন্ন অন্য উপায়ে ইহাদের পরস্পরের ভেদ বুঝাইতে আমরা অক্ষম, কেন না কার্য্যতঃ উভয়ই একরূপ, দুইটিই অভিনেয়, পটক্ষেপ, পটোত্তোলন দুইএতেই আছে, নান্দী প্রস্তাবনা দুইএতেই আছে, নট নটী দুইএতেই আছে, পাত্রের প্রবেশ, নিষ্ক্রমণ উভয়েই আছে ; ফল অভিনয় অংশ দুয়েরই একরূপ, ভেদের মধ্যে সেই শাস্ত্রের গুটিকতক কথা। তবে নাটক এবং প্রকরণ এই দুইটি কথার উপর দৃষ্টি করিলে আর একটু সূক্ষ্ম ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক ভাবাভিনয়প্রধান, প্রকরণ ক্রিয়াভিনয়প্রকরণপ্রধান। নাটকে অভিনয় দ্বারা প্রধানতঃ ব্যক্তি বিশে-

যের অবস্থা বিশেষে মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখান হয়, প্রকরণে অভিনয় দ্বারা প্রধানতঃ সামাজিক চরিত্রের সাময়িক অবস্থা প্রদর্শিত হয়। নাটক গভীর, গাঢ় এবং মিতভাষী আর প্রকরণ ভাসা ভাসা, পাতলা এবং বাচাল। নাটকের প্রসর অল্প হইলেও ভার অধিক, প্রকরণের প্রসর অধিক হইলেও ভার অতি অল্প। নাটকের স্বর গুরুগম্ভীর, বাক্যগুলি বিজ্ঞতা-পূর্ণ, প্রকরণের স্বর কাকু, কথাগুলি উপহাস-বহুল। নাটকের আলম্বন কেবল নায়ক নায়িকা, প্রকরণের আলম্বন কেবল নায়ক নায়িকা নয়, তাহাদের সমসাময়িক সমাজও। নাটকে নায়ক নায়িকার চরিত্রের সম্পূর্ণ চিত্র দেখাইবার জন্যই অন্য চরিত্রের কল্পনা হয়, প্রকরণে সামাজিক চরিত্রের সম্পূর্ণ চিত্র দেখাইবার জন্যই নায়ক নায়কার কল্পনা হয়। এই জন্যই বোধ হয় নাটকের নায়ক একজন বিশেষ সুসংযুক্ত প্রধান পুরুষ এবং গল্প ইতিহাসমূলক এবং প্রকরণের নায়ক একজন যে কোন ভদ্র-বংশীয় এবং গল্প কল্পনাময় করিবার নিয়ম হইয়া থাকিবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল বা উত্তরচরিতের সহিত মৃচ্ছকটিককে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের এই কথা গুলির সারবত্তা বুঝিতে পারিবে। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত আর একখানি প্রকরণ আছে, আমরা যথা স্থানে তাহার ও উল্লেখ করিব।

নাটক ও প্রকরণে যতটুকু ভিন্নতা তাহা বলা হইল এক্ষণে এই উভয়ের যে যে অংশে ঐক্য আছে সেইগুলির বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

নাটক এবং প্রকরণ এই দুইই পঞ্চসন্ধি যুক্ত হওয়া চাই। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং উপসংহার এই পাঁচটি সন্ধি। সন্ধিতে বলিতে সন্ধান স্থল, যেখানে মূল গল্পের সহিত বিশেষ শাখা প্রশাখাদির সংযোগ হয়।

নাটকের যে অংশে বীজ অর্থাৎ গল্পের মূল উৎপন্ন হয় তাহার নাম মুখ। সকল নাটকের প্রথমেই প্রায় মুখ সন্ধির সন্নিবেশ থাকে।

মুখ সন্ধিতে আরোপিত বীজের যেখানে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য এবং কিঞ্চিৎ অলক্ষ্যভাবে অঙ্কুরোদ্ভেদ হয়, অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়াছে কিনা এইরূপ সন্দেহ হয় তাহার নাম প্রতিমুখ।

পূর্ব্বে উদ্ভিন্ন অঙ্কুরের যেখানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উদ্ভেদ হয় অথচ সেই সঙ্গে ঐ অঙ্কুরোদ্গম কখন হ্রাস প্রাপ্ত হয় কখন বা অন্বেষণের বিষয় হয় তাহার নাম গর্ভ।

মুখ হইতেও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন অঙ্কুর যেখানে কোন প্রকার শাপাদি দ্বারা অন্তর্হিত হয় তাহার নাম বিমর্ষ।

যেখানে গল্পের শেষ আসিয়া মেলে তাহার নাম উপসংহৃতি বা উপসংহার।

এরূপ কোন নিয়ম নাই যে এক একটী সন্ধি যথাক্রমে এক একটী অঙ্কে সন্নিবেশিত হইবে, তবে প্রথমে মুখসন্ধি এবং শেষে উপসংহৃতি স্বভাবতই অবস্থান করে। এবং ইহাও কোন রূপ নিয়মের মধ্যে নাই যে সমুদায় নাট্যকাব্যে সকল গুলি সন্ধিই

বিদ্যমান থাকিবে, তবে সকল নাট্যকাব্যেই মুখ এবং উপসংহার থাকা আবশ্যক বটে নতুবা গল্প হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের আলোচ্য মৃচ্ছকটিকে কয়টি সন্ধি কোন স্থানে কিরূপে অবস্থান করিতেছে।

গল্প চ্ছলে সমাজের সাময়িক অবস্থা বর্ণন করাই মৃচ্ছকটিককারের অভিপ্রায়। কাজেই গল্পের মূলকেই এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাটকের বীজ বলিয়া ধরিতে হইবে। গল্পটি দুইটি সমান ধারায় প্রবাহিত। তাহার প্রথম ধারা চারুদত্তের দারিদ্র্যাবস্থায় পতন জন্য দুঃখ বর্ণন। দ্বিতীয় ধারা বসন্ত সেনা নাম্নী বেশ্যার সহিত তাহার প্রণয় ও উভয়ের মিলন বর্ণন! এই দুইটী ধারার বীজই প্রথম অঙ্কে আরোপিত হইয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিবে যে প্রথম ধারার বীজ যে কেবল রোপিত হইয়াছে তাহা নয় উহাকে অঙ্কুরিত পল্লবিতও করা হইয়াছে অর্থাৎ উহার অবস্থা মুখ সন্ধি ছাড়িয়া উঠিয়া প্রতিমুখে পৌছিয়াছে। প্রথমেই সূত্রধার বলিতেছে—

অবন্তি পূর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহো যুবাদরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ গুণানুরক্তা গণিকাচ তস্য বসন্ত সেনেব বসন্তসেনা। তয়োরিদং সৎসুরতোৎবাশ্রয়ম ইত্যাদি"।

এই মৃচ্ছকটিক গ্রন্থখানি অবন্তিপুর নিবাসী বণিকবৃত্তি ব্রাহ্মণ বংশীয় দরিদ্র যুবা চারুদত্ত এবং তাহার গুণে অনুরক্ত গণিকা বসন্তসেনা এই উভয়ের নির্দ্দোষ বিলাস আশ্রয় করিয়া রচিত। সূত্রধারের কথায় বুঝা যাইতেছে যে চারুদত্তের দারিদ্র্য এবং বসন্তসেনার সহিত তাহার অনুরাগ জন্য সম্মিলন এই দুইটি কথাই গ্রন্থকারের বক্তব্য।

তার পর চারুদত্ত প্রবেশ করিয়াই বলিতেছে—

"পূর্ব্বে যে সকল গৃহদেহলীতে দেবতার উদ্দেশে অর্পিত দ্রব্য সকল হংস এবং সারসপক্ষীরা আসিয়া খুঁটে খুঁটে খাইত এখন সেই সকল দেহলীতে নানা প্রকার তৃণগুচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে এবং কীট সকল তাহাতে আশ্রয় লইয়া বিচরণ করিতেছে"। এই কয়টির দ্বারা চারুদত্ত পূর্ব্বে একজন ধনশালী ছিলেন এবং আজকালের ধনীদিগের ন্যায় তাঁহার বাড়ীতে ও হাঁসের পাল পোষ হইত। কিন্তু এক্ষণে সে ধন নাই সে হাঁসের পাল ও নাই। ইহা অতি বিশদরূপে সূচিত হইতেছে। সুতরাং প্রথম ধারার এইখানেই বীজারোপ বলিতে হইবে। কিন্তু যুবাপুরুষের অসীম সম্পদের যথেচ্ছ উপভোগের 'পর উৎকট দারিদ্র্য যন্ত্রনা একেবারে অসহ্য বোধ হওয়ায় বীজারোপের সহিতই অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে।

চারুদত্ত পরক্ষণেই বলিতেছে—

"পূর্ব্বে দুঃখ ভোগের পর যে সুখ হয় সেই সুখই সৌভাগ্যের সূচক আর যে ব্যক্তি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়া পরে দুঃখ ভোগ করে সে মৃত হইয়া বেঁচে থাকে, তাহার কেবল দেহই বর্ত্তমান থাকে, আত্মা থাকে না। দারিদ্র্য এবং মৃত্যু এই উভয়ের তুলনায় দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয় কারণ মরণ যন্ত্রণা অতি

অল্প ক্ষণ স্থায়ী, দরিদ্রের দুঃখ অনন্ত। পরে চাকরকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিলে সে যখন আস্তে আস্তে বলিল ঘরে তেল আছে কি যে প্রদীপ জ্বালিব? এই কথাতেই গল্পের প্রথম ধারা প্রথমাঙ্কে যে মুখ প্রতি-মুখ অবস্থা ছাড়িয়া উঠিয়াছে ইহাই জানা যাইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক দ্বিতীয় ধারাটি প্রথমাঙ্কে কিরূপ অবস্থায় আছে।

রাজশ্যালক শকার তাহার সহচর বিট এবং তাহার ভৃত্য শকার এই তিন জন অন্ধকারে বসন্ত সেনার পশ্চাৎ দৌড়িতে দৌড়িতে যখন চারু দত্তের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন শকার বলিয়া উঠিল—

"এই বেশ্যাবেটী কামদেবায়তন নামক মেলা স্থান হইতেই সেই দরিদ্র চারুদত্ত বেটার উপর আসক্ত হইয়াছে বোধ হয়। রাস্তার বাঁধারে সেই বেটার বাড়ী অতএব এই সময় তোমরা খুব সাবধান হও যেন ও বেটী আমাদের হাত ছাড়া না হয়।

এই কথা শুনিয়া বিট মনে মনে ভাবিল বেটা কি মূর্খ! যে কথা গোপন করিবার তাহাই প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বসন্তসেনাকে পালাইবার সন্ধান আপনিই বলিয়া দিল। যাক্ বসন্তসেনাকি তবে আর্য্য চারুদত্তের উপর অনুরক্ত? হৌক হৌক কাঞ্চনের সহিতই রত্নের যোগ হইয়া থাকে তবে আর কেন, এক্ষণে বসন্তসেনা যাহাতে চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লইতে পারে সেই কৌশল করা উচিত!

বসন্তসেনা পূর্ব্বে চারুদত্তে অনুরক্ত ছিল না। সেই দিবসই কামদেবায়তন নামক স্থানে মেলা দেখিতে গিয়া চারুদত্তের রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ঐ অনুরাগই গল্পের বীজ তাহা কবি এস্থলে শকারের মুখ দিয়া আরোপিত করিলেন। প্রথমাঙ্কে বীজের আরোপ-মাত্রই হইয়া আর কোন রূপ উদ্ভেদ হয় নাই।

দ্বিতীয়াঙ্কে চারুদত্তের চেটী বসন্ত সেনা এবং মদনিকার কথা বার্ত্তায় সেই বীজের উদ্ভেদ হইতে ছিল এমন সময় দ্যূত কর দিগের গোলমালে আবার অলক্ষিত হইল। এই বীজের অলক্ষিত ভাবেই প্রায় দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ হইয়াছে কেবল নিজের হস্তিপালকের অঙ্গে চারুদত্ত প্রদত্ত জাতি কুসুম বাসিত প্রাবরীয় বস্ত্রে চারুদত্তের নাম পাঠ করিয়া বসন্তসেনা নিজের আভরণ দিয়া ঐ গাত্রীয় বস্ত্র গ্রহণ করাতে আবার ঐ বীজোদ্গম আবার অল্প পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ দান শীলতায় চারুদত্তের দারিদ্র্য রূপ বীজাঙ্কুরের কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়ায় এবং পরে তৃতীয়াঙ্কে সঙ্গীত শ্রবণাশক্তি সেই দারিদ্র্যের আরও হ্রাস হইয়াছে পরে চোরের দ্বারা উহা অন্বেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াঙ্কে উহার গর্ভ সন্ধি বলা যাইতে পারে।

এবং ঐ তৃতীয় অঙ্কেই চোর কর্ত্তৃক বসন্ত সেনার সহিত অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে চারুদত্তের আক্ষেপে ঐ দারিদ্র্য বীজাঙ্কুরের সম্পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে তাহার পর বধূ কর্ত্তৃক চতুঃসাগরের সারী ভূতরত্নমালা প্রদানে এবং পরে বসন্তসেনার আগমন এবং উদ্যান বিহারাদিতে ঐ বীজের অঙ্কুরায় হওয়ায়

পঞ্চমাঙ্ক অবধি বিমর্ষ সন্ধি, তাহার পর উপসংহার।

চারু দত্তের প্রণয় বীজ প্রথম অঙ্কে আরোপিত হইয়া দ্বিতীয় অঙ্কে দ্যূতকার দিগের বৃত্তান্তে অলক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার কর্ণপুরের নিকট হইতে চারুদত্ত প্রদত্ত জাতি কুসুম বাসিত গাত্রীয় বস্ত্র মহামূল্য আভরণের সহিত বিনিময় করায় কিঞ্চিত লক্ষিত হইয়াছে অতএব ঐস্থানেই প্রতিমুখ সন্ধি বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় অঙ্কে প্রথমে চারুদত্তের সঙ্গীতা নুরক্তি প্রদর্শন করায় চৌরের ব্যাপার বর্ণন করায় এবং চারুদত্তের উদাসীনের মত অপহৃত বস্তুর পরিবর্ত্তে রত্নমালা প্রেরণ করায় সেই বীজের হ্রাসাবস্থা ও অন্বেষণাবস্থা বর্ণিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পরে চতুর্থাঙ্কে বসন্তসেনা এবং মদনিকার কথোপকথনে সেই বীজের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ পাইয়াছে; কেননা যখন বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতিকৃতি সর্ব্বদা আপনার নিকটে রাখিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসে কেবল তাহাই দেখে এবং চারুদত্ত ও অবকাশ পাইলে বসন্ত সেনার দৃষ্টিপথে আসিয়া হাজির হয়। এই রূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়া সুতরাং তৃতীয় এবং চতুর্থ এই উভয়ে মিলিয়া গর্ভসন্ধি। তাহার পর পঞ্চম অঙ্কে বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে অভিসার করিল। বীজের চূড়ান্ত বিকাশ হইল। সেই বিকাশ সপ্তমাঙ্ক অবধি চলিল। তাহার পর প্রবহণের বিপর্য্যয় হইতে সেই সম্পূর্ণ ভাবে বিকসিত প্রণয় বীজের অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তিত হইল, শকার যখন বসন্তসেনাকে হত্যা করিসা অলঙ্কারের লোভে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিল এবং রাজদ্বারে সকল লোকের সম্মুখে মৈত্রেয়ের কক্ষ হইতে অলঙ্কারের পুটুসি পতিত হইয়া সেই কথারই সমর্থন করিল তখন প্রণয় বীজ একেবারে অন্তরিত হইল। নাটকের ঐ অংশেই উহার বিমর্ষাবস্থা। তাহার পর উপসংহার, উহার স্থান শেষ অঙ্কে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে নাটকে যে পাঁচটি সন্ধি থাকার আবশ্যক মৃচ্ছকটিকে সে গুলি সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

বায়ু।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহাএকটী বহু বিস্তৃত বায়ু সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। গ্রহ উপগ্রহ স্থিতির সাধারণ নিয়মানুসারে পৃথিবী শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু ইহা বায়ু সমুদ্রে পরিবেষ্টিত আছে বলিয়া সমস্ত শূন্য প্রদেশ বায়ু পূর্ণ নহে। পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে উর্দ্ধে ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু সমুদ্রের বিস্তৃতি; তদূর্দ্ধে বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। পৃথিবী হইতে যত

ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায়, ততই বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস হইয়া তরলতা, ক্রমে অতি তরলতা আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহার কারণ এই যে উর্দ্ধতন বায়ুস্তর সমূহের নিয়ত চাপনে নিম্নস্থিত বায়ুস্তরের অনুসমষ্টি (molecules) পরস্পর অধিকতর সান্নিধ্য লাভ করে, সুতরাং বায়ু ঘনীভূত হয়। বায়ুর যে অবস্থায় আমরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি বায়ু যদি সর্ব্বত্র এইরূপ ঘন অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে বায়ু সমুদ্র পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে ৫ মাইলের অধিকদূর বিস্তৃত হইত না।

বায়ুমান ও তাপমান যন্ত্রের (Barometer and thermameter) সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই যে এক ঘন ফুট (cubit-foot) পরিমান নির্জ্জল বায়ুকে ওজন করিলে ৫৩৯ গ্রেণ হইয়া থাকে। সামুদ্রিক সমতল হইতে বায়ু যতদূর উর্দ্ধে বিস্তৃত আছে তত দূর উচ্চ বায়ু স্তম্ভের ভার প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চে (square-foot) ১৫ পাউণ্ড(সাড়ে সাত সের)নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যখন এই অকিঞ্চিৎকর স্থান ব্যাপী বায়ু অংশের ভার এত অধিক হয়, এবং যখন আমাদের শরীরের পরিসরের মধ্যে কত শত বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থান রহিয়াছে, তখন আমাদের শরীরের উপর সর্ব্বদা কি বিষম গুরুভার অবস্থিতি করিতেছে এবং কি প্রকারেই বা আমরা নিয়ত এত গুরু ভার বহন করিয়াও উহার উপলব্ধি করিতে পারি না? ইহার কারণ, এই যে আমাদের শরীরের উপর বায়ুর ভার সর্ব্বত্র সমভাবে নিপতিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা এত গুরুভারের অস্তিত্বের বিষয় পর্য্যন্ত অবগত নহি।

বায়ু কোন রাসায়নিক সংযোগৎপন্ন দ্রব্য নহে। ইহা কতকগুলি বাষ্পের মিশ্রণ মাত্র, রাসায়নিক সংযোগ নহে; নিম্নলিখিত তিনটী প্রমাণে উহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

১। যখন দুইটী বাষ্পের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হয়, তখন সেই উৎপন্ন পদার্থের তাপাংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং পরিমাণের (bulk) ও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, যেমন দুই ভাগ উদ্জান (Hydrogen) এবং এক ভাগ অম্লজান (oxygen) উভয়ের রাসায়নিক সংযোগ উপস্থিত হইয়া জল উৎপন্ন হয় কিন্তু তিন ভাগ জল উৎপন্ন না হইয়া দুই ভাগ জল হয়; রাসায়নিক সংযোগ না হইয়া যদি উভয় বাষ্পের শুদ্ধ মিশ্রণ হইত তাহা হইলে মিশ্রিত পদার্থ ১ভাগ কমিয়া না যাইয়া যত পরিমাণ বাষ্প লওয়া হইয়াছিল ততই থাকিত অর্থাৎ তিন ভাগই থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন বাষ্প মিলিত হইয়া যখন বায়ু উৎপন্ন হয়, তখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই কারণেই বায়ুকে একটী মিশ্র পদার্থ বলা যায়, রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন নহে (It is a mixture and not a chemical cobination of different gases.)

২। জলের সহিত বায়ু মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে সেই বায়ু বহির্গত হইয়া যায়; এক্ষণে আমরা যদি এই নির্গত বায়ুকে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে বাষ্প দ্বারা বায়ু নির্ম্মিত,

তাহারা জলে মিশ্রিত হইবার সময় বায়ুতে যে পরিমাণে অবস্থিতি করিতে ছিল, এক্ষণে উত্তাপ সংযোগে জল হইতে বহিষ্কৃত বায়ুর মধ্যে তাহাদিগের পরিমাণের পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছে। ইহাতেই স্থিরীকৃত হইতেছে যে বায়ু একটী রাসায়ণিক সংযোগোৎপন্ন দ্রব্য নহে, কেননা এরূপ সামান্য কারণে কোন রাসায়নিক সংযোগোৎপন্ন পদার্থের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটেনা।

৩। রাসায়নিক সংযোগ হইতে হইলে অম্লজান ও যবক্ষারজানের যে পরিমানে সংযোগ হওয়া আবশ্যক, বায়ুতে ইহারা সে পরিমানে অবস্থিতি করে না। এই জন্যই বায়ুকে রাসায়নিক সংযোগোৎপন্ন পদার্থ বলা যায় না।

যে যে বাষ্পের মিশ্রণে বায়ু উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে অম্লজান (oxygen) এবং যবক্ষারজান (nitrogen) সর্ব্ব প্রধান। ১র সহিত ৪রের যে সম্বন্ধ, বায়ুর মধ্যস্থিত অম্লজানের পরিমাণের সহিত যবক্ষার জানের পরিমাণের সেই সম্বন্ধ। ১০০ ভাগ বায়ুতে ৭৯· ১৯ ভাগ যবক্ষারজান এবং ২৩· ৮১ ভাগ অম্লজান আছে। ওজনে ১০০ গ্রেণ পরিমাণ বায়ুতে ৭৬· ৯ গ্রেণ ও যবক্ষার জান ২৩· ১ গ্রেণ অম্লজান আছে। যে খানেই বায়ু পরীক্ষা করা গিয়াছে সেই স্থানেই বায়ু মধ্যস্থিত অম্লজান ও যবক্ষারজানের এই মিশ্রণ পরিমাণ অক্ষুন্ন রহিয়াছে দেখা-গিয়াছে। মার্টিনস্ পারিস্ নগরীর বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং ফ্রান্সে সামুদ্রিক সমতল হইতে ৮২২৬ ফিট উচ্চে ফলহরণ নামক স্থানের বায়ু পরীক্ষা করিয়া এতদুভয়ের মধ্যে অম্লজানের ভাগের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উচ্চস্তরের বায়ুতে অম্লজানের অংশ নিম্ন প্রদেশের অপেক্ষা কম ; ইহার কারণ এই যে, উদ্ভিদ্জগৎ জীবনধারণ ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বায়ু হইতে অঙ্গার বাষ্প (carbonic acid gas) গ্রহণ করে এবং এই বাষ্পকে বিযুক্ত (decompose) করিয়া অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করে এবং অম্লজান ভাগ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ; এই কারণেই নিম্ন প্রদেশের বায়ুতে অম্লজানের পরিমান কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া থাকে। তাই বলিয়া বায়ুতে যে পরিমাণে অম্লজান থাকা উচিত, উচ্চ প্রদেশের বায়ুতে তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র কম নাই।

অম্লজান ও যবক্ষারজান ব্যতীত বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাতে অন্যান্য কয়েকটী বাষ্প অল্প পরিমাণে মিশ্রিত রহিয়াছে ; ইহাদিগের পরিমাণ বেশী হইলে ইহাদিগকে বায়ুর দূষ্য পদার্থ বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে অঙ্গারক বাষ্প, জলীয় বাষ্প, আমোনিয়া (ammonia) যবক্ষার দ্রাবক (nitric acid), গন্ধ কোদ্জান (sulphuretted Hydrogen) এবং উদ্ভিদ ও জীব জগতের সূক্ষ্মাংশ পুঞ্জ (organic matter)

অম্লজান। ইহার আর একটী নাম জীবন ধারক বায়ু। সমগ্র বায়ু রাশির পাঁচ অংশের একাংশ অম্লজান বাষ্প। নাগরিক বায়ু অপেক্ষা পল্লীগ্রামস্থ ও পার্ব্বতীয় বায়ুতে অম্লজানের অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ফ্লোরিন ব্যতীত অপর সমস্ত

ভৌতিক পদার্থের (element) সহিত অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ হয়। এই যোগকে অম্লজানিক দাহন ক্রিয়া (process of oxidation) বলা যায় এবং এই ক্রিয়া উপস্থিত হইলে সকল সময়েই উত্তাপ সম্ভূত হয় এবং অনেক সময়েই আলোক নির্গত হয়। যে সকল পদার্থ বায়ু সংস্পর্শে দগ্ধ হইয়া থাকে (বায়ুর সংযোগ ভিন্ন প্রায় কোন পদার্থই দগ্ধ হয় না) অম্লজান সহযোগে সেই সকল পদার্থের দাহন ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল আলোক নিস্তৃত হইয়া থাকে। বায়ু সংযোগে যে দাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, অম্লজান বাষ্পই তাহার মূলীভূত কারণ, তবে বায়ুতে অম্লজানের ভাগ অল্প থাকাতে দাহন ক্রিয়া তত তেজস্বিনী হয় না, শুদ্ধ অম্লজান বাষ্পসংস্পর্শে যে দাহন ক্রিয়া উপস্থিত হয় তাহা অতীব উগ্র। বিশুদ্ধ লৌহচূর্ণ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আছে যাহারা সহজে বায়ু সংস্পর্শে দগ্ধ হয় না, এরূপ দ্রব্য শুদ্ধ অম্লজান সহযোগে দগ্ধ হইয়া যায়। একটী বড়মুখ বিশিষ্ট কাঁচের বোতলে অম্লজান বাষ্প পুরিয়া তাহার মধ্যে, একটা বাতি জ্বালাইয়া ও পুন নির্ব্বান করিয়াই, প্রবেশ করাইয়া দিলে বাতিটী পুনরায় জ্বলিয়া উঠে; একটি দেশালাইয়ের কাটি এইরূপে প্রবেশ করাইয়া দিলে এইরূপ ক্রিয়া উপস্থিত হয়। একখণ্ড কয়লা তারে জড়াইয়া অগ্নির উত্তাপে ঈষৎ লাল করিয়া অম্লজানের বোতলে প্রবেশ করাইয়া দিলে অতি উজ্জ্বল আভা বিস্তার করে এবং সুন্দর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে নিস্তৃত হয়। ফস্ফরস অম্লজান সংস্পর্শে দগ্ধ হইবার সময় এরূপ উজ্জ্বল আলোক নিস্তৃত হয়—যে সেদিকে একেবারে তাকাইতে পারা যায় না। আমরা যখন শ্বাস গ্রহন করিয়া থাকি; বায়ু সহযোগে অম্লজান আমাদের ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রক্তের কনিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র চালিত হয়; বাহিরে যেমন অম্লজানিক দাহন ক্রিয়া উপস্থিত হয়, শরীরের অভ্যন্তরে নিয়ত সেই কার্য্য চলিতেছে—আমাদের শারিরীক উত্তাপ আভ্যন্তরিক অম্লজানিক দাহনক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়। বাহিরের অম্লজানিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলে যেমন অনেক দূষ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় যেমন অঙ্গারক বাষ্প (carbonie acid gas) ইত্যাদি, সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তরেও অনেক দূষ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গারক বাষ্প তাহার মধ্যে একটী—এই দূষ্য বাষ্পগুলি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনরায় ফুসফুসে আগমন করে, এবং আমাদিগের প্রশ্বাসের (expiration) সহিত বিনির্গত হইয়া যায়। যখন এই অম্লজানিক দাহন ক্রিয়া শরীরের অভ্যন্তরে কোন কারণে বন্ধ হইয়া যায়, তখনই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অম্লজানিক দাহন প্রক্রিয়া দ্বারা যে সকল নূতন বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাদিগের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Reaction) অম্ল, এইজন্য রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত লাভয়সিয়ার এই বাষ্পের নাম oxygen অম্লজান দিয়াছেন। এই বাষ্প বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ

বিহীন। এই বাষ্পের আনবিক ভার(Atomic weight) ১৬ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ১·১০৫৬৩। অম্লজান বাষ্প তীব্র উগ্রতা সাধক; শুদ্ধ এই বাষ্পকে নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে শ্বাস পথাবরক ঝিল্লির উগ্রতা সাধন করে; তজ্জন্য বায়ুর মধ্যে এই বাষ্প যথা প্রয়োজনীয় রূপে যবক্ষারজানের সহিত মিশ্রিত থাকাতে আমাদিগের শ্বাসোপযোগী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে উদ্ভিদ-জগৎ কিরূপে বায়ুস্থ অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া নিম্ন প্রদেশস্থ বায়ুরাশিতে অম্লজানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে; খনির মধ্যে নানা কারণে দূষিত বায়ু অবস্থান করে এবং সেই বায়ুতে অম্লজানের পরিমাণ অল্প থাকে; যখন খনির মধ্যে বায়ুতে অম্লজান বাষ্প শতকরা ১৮ ভাগ থাকে তখন আলো লইয়া গেলে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; এবং শতকরা ১৭ভাগ থাকিলে শ্বাসগ্রহণের অনুপযোগী হইয়া থাকে। একস্থানে দুর্গন্ধময় আবর্জনা অধিক পরিমাণে একত্রিত থাকিলে সন্নিকটস্থ বায়ুতে অম্লজানের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়।

ক্রমশঃ।

কবিতা।

আহ্বান গীতী।

এস গো প্রকৃতি আজি
দোঁহে মিলে একত্তরে।
যা কিছু বিভব সব
দিয়ে পূজি প্রাণেশ্বরে।
আয় গো কুসুমবধূ,
লইয়া হৃদয় মধু,
আজিকে পূজিব বঁধু,
মিলে সব চরাচরে।
ভূধর হৃদয় হ'তে,
নির্ঝর ছুটেছে স্রোতে,
নাচে লতা কাননেতে,
মৃদুল সমীর ভরে।
চাল, শশী সুধারাশি,
আয় রে শারদ নিশি
শুভ্র আস্তরণ তোর
বিছায়ে দে ধরাপরে।
নদী বহে কুল কুল,
গাহিতেছে বুল বুল,
যামিনী কনক ফুল,
তুলেছে আঁচল ভোরে!
তবে গাও, গাওরে হৃদয় মোর
পুলকে হইয়া ভোর
আজি, ডাক বিশ্বে প্রাণে তোর
খুলে দিয়া রুদ্ধ দ্বারে।

শরতে।

বিপুল গগন হৃদি ঢেকে ফেলে নীলিমায়!
তর তর নব ঘন কোন দেশে চলে যায়?
ফোঁটা ফোঁটা আঁখি জল, বুঝি পড়ে নিরাশায়।
কেন অত,গতি দ্রুত? কাহারে পাইতে চায়?

যা'রে,যা'রে প্রাণ মোর দেখা কেন পড়ে আর।
মিশে যা, চলে যা সাথে, যদি দেখা পাস্ তার।
যেতে যেতে পথে যেতে যদি সে দেখিয়া কা'র,
বিষাদ-মলিন মুখ, নিরাশার অশ্রুধার।
ভুলে গিয়ে তোর ব্যাথা,
দাঁড়াস্ দাঁড়াস্ সেথা।
সে ছবি আঁকিয়া প্রাণে, দিয়ে অশ্রু উপহার।

ভবিষ্য, ত, আছে জানা
ধূলি পরে ধূলি হ'বি।
কেন মিছি হেম প্রাণ
যদি একা পড়ে রবি?
যেতে যেতে চলে যেতে মেঘের আড়ালে থেকে
যে ভাল বাসে না, তারে চেয়ে থাস্ প্রেম চোখে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

দুইটী চিত্র।*

রূপগরিমায় বিভোরা যৌবন-সুলভ চপলা কে ওই রমণী আসিতেছে? সঙ্গে এক মাত্র সহচরী, সেও রূপবতী, সেও যুবতী,--তেমতি চপলা, তেমতি সুরসিকা, উভয়েরি রমণী বেশ,—উভয়েই উদ্যান আলো করিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে। দুই জনেরই বেশ-ভুষা একরূপ; কিন্তু বেশ ভুষা একরূপ হইলে কি, হইবে, দুই জনের কথা বিভিন্ন; প্রশ্নোত্তর শুনিলেই যেন বোধ হইবে, এক জন অপরের সহচরী মাত্র। একজন আর একজনকে সম্মানসূচক কথা কহিতেছে, রাণী বলিয়াও সম্বোধন করিতেছে কিন্তু রমণী তাহাকে নিষেধ করিতেছে; যুবতী সুচতুরা—সহচরী চতুরা। সহচরী আপন বেশ লুকাইতে পারিতেছে না যুবতী-বেশ পরিতেছে ও সহচরী তাহা পরিতেছে না দেখিয়া তাহাকে তাহার জন্য বকিতেছে।

দুই জনে পরস্পর কি কথা কহিতেছে আর উভয়েই হাসিতেছে। ক্রমে সুচতুরা রমণী আপনিই আপন জালে পতিত হইল। আর সে বেশ রাখিতে পারিল না, সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মন্ত্রী আমায় দেশে যেতে পত্র লিখেছে—আমার বাপের বন্ধু—সেহাত কথাটা ঠেল্‌তে ও পারিনে।"

সহ। "কেন, চলনা? তুমি এমন ছদ্মবেশে কতদিন বেড়াবে?

রম। "আমার যত দিন ইচ্ছা—দেশে গিয়া কি কর্ব্বো?"

সহ। "দেখ সখি,তোমারমনের বিকার আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার যৌবন কাল, আর কুমারী থেক না।"

রম। 'সারি! তুই আমায় আজ নূতন উপদেশ দিতে এলি; আমি আমার, শস্য-শালিনী রাজ্য, পূর্ণধনাগার, নত-শির-শত্রু,—তবে কেন আমি দেশে দেশে সামান্যের ন্যায় ভ্রমণ কচ্চি? * * * * আমার সকল আমোদ প্রমোদই তিক্ত বোধ হয়।

* শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত পূর্ণচন্দ্রের দুইটী চরিত্র।

আমার অদৃষ্টে বিধাতা বর লেখেন নাই—আমি চিরকুমারী থাকিব।”

সারি। বর নাই কেন বল ভাই? তোমার মন নাই তাই বল। কত রাজা, রাজকুমার তোমার জন্যে এল; কারুর গোঁপ মুড়িয়ে দিলে, কারুর মাথা মুড়িয়ে দিলে; ও মা! সন্ন্যাসী গুণোরও জটা কেটে নিলে!—তুমি তাই রূপের গরবেই গেলে।

গরবিনী সগরবে উত্তর করিল “তুই বলিস্ কি? যে সে কি পতির যোগ্য? আমি যার দাসী হব, সে কি স্ত্রীলোকদের কথায় গোঁপ মুড়িয়ে যায়? আমার যিনি পতি, তিনি বীর, ধীর, প্রশান্তস্বভাব

*   *   *   *

দেখ্‌লেম পৃথিবীতে পুরুষ নাই; যে বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের ন্যায় নির্ব্বাক হল; যে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার ধনাগার দৃষ্টে, চমকিত হল, রূপ-গর্ব্বিত আমার রূপ দর্শনে দাস হয়েছে; পুরুষের প্রধান গর্ব্ব তরবারি,—রণস্থলে বিপক্ষরাজ আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে! তবে তুমি আমায় কারে বরমাল্য দিতে বল, কার দাসী হতে বল?” গরবিনী নিস্তব্ধ হইল। যাহার একাধারে এত রূপ, এত গুণ, এত ঐশ্বর্য্য, সে কাহার দাসী হইবে? জগতে পুরুষ নাই, তবে তুমি কাহার জন্য রাজকন্যা হইয়া, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য বেশে একমাত্র সহচরী সহ রমণী বেশে কাননে কান্তারে বিচরণ করিতেছ!—আবার দাসী হইবার ও ইচ্ছা দেখিতেছি হৃদয়ে বিরাজিত। যে ধরিতে পারিবে তাহাকে ধরা দিবে। যিনি সুতোর সোহাগের হারে বাঁধা থাকিবে। জোর করিয়া যে মন কাড়িয়া লইতে পারিবে তাহাকেই মন প্রাণ দিবে। আপন বশে থাকিতে যাচিয়া কে কাহার বশবর্ত্তিনী হইতে চায়? সখি সারি! তোমার সহচরির সেই মনোহারিণী একবার সেই গীতটী গাও;

যে ধর্ত্তে পারে ধরা দিই তারে।
বাঁধা থাকি মিনি সুতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজতে পারে, সাধ করে সই,
মন কি সরে?
থাক্‌তে বশে পড়ব ফাঁসে যেচে কার তরে,
জোরে মন কেড়ে নিতে যে পারে সই, সেই
পারে।

দামোদর একি! তোমার এ মতিচ্ছন্ন হইল কেন? ষোল বৎসর গুরুদেব গোরক্ষ-নাথের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও হৃদয়ে অবিশ্বাস! গুরুর নিকট সমস্ত যোগ শিক্ষা হইয়াছে, এ অহঙ্কার কেন? যোগিবর মহাদেব যে যোগ আজিও শিক্ষা করিতে-ছেন, তাহা তুমি শেষ করিয়াছ! শেষ করিয়াছ ভালই হইয়াছে কিন্তু যে রমণী সাহঙ্কারে গাহিতেছে “যে ধর্ত্তে পারে ধরা দিই তারে। বাঁধা থাকি মিনি সুতার সোহাগের হারে” তাহাকে পাইবার জন্য এত আয়াস কেন? তোমার ন্যায় কত যোগী পরাস্ত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিয়াছে,—তুমি আবার কেন ‘লাল রূপী’ হইতে যাইতেছ? একি! যাহা বলিয়াছি তাহাই। সারী যাহা বলিতেছে তাহাই শুনিতেছ। সারী তরুণ-অরুণের মত রঙ হইবে বলিয়া সিন্দুর মাথাইতেছে, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিতেছ। জটা

কাটিলে চোলা ঢোলা মুখ খানা ছোট দেখাইবে বলিয়া বাঁদরের মাথার টুপি মাথায় দিলে। সারী তার সহচরী স্থন্দরার পছন্দ বেশ জানে; হনু-মানের গায়ের মত একটা জামা পরাইয়া এব্ড়ো খেব্ড়ো গা ঢাকিল! এসব করি-য়াও সারি সন্তুষ্টা নহে। দামোদরকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিল "স্থন্দরা যদি এসে তোমায় জামা খুল্‌তে বলে, বা মুখ ধুতে বলে, প্রাণান্তেও করোনা" এ কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি তাহাই করিলে শেষ বানর নাচিলে? এত করিয়া কি তোমার 'স্থন্দরা' লাভ হইল—তুমি অতি নির্ব্বোধ, স্থন্দরা ওই কি বলিতেছে শুন-;—

স্থন্দরা। "দেখ, তুমি কেমন সন্ন্যাসী? সিন্দুর মেখে বল্‌ছ 'ঐরকম রঙ'; তুমি ত বড় মিথ্যাবাদী।"

দামোদর। 'না, না, দোহাই স্থন্দরা আমার মিথ্যা কথা নয়, আমি—সন্যাসী কি মিথ্যা কথা কয়?'

স্থ। 'মিথ্যা কথা কওনা? তোমার বয়স কত?'

দা। 'দোহাই, তোমার মাথা খাই ষোল বছর; এ সেই যে দুহাজার বছর বলেছিলেম, ব্যঙ্গ করেছিলাম।"

স্থ। 'তোমার বয়স ষোল বছর, তবে তোমার নাম গোরখ'নাথ বল্‌লে যে?'

দা। 'আমি কি সেই গোরখ'নাথ? আমি অমনি একটা গোরখ'নাথ।'

স্থ। 'বাবা, এস; প্রণাম।

দা। 'বলি, ও সারি! আবাগীর বেটী যে বাবা বলে ফেল্‌লে!

স্থ। 'কি! তুমি সন্যাসী, তোমায় বাবা বল্‌ব না। এখন যাও; সন্যাসী-ঠাকুর আস্তানায় যাও; এই নাও ভিক্ষা নাও।

দা। 'বলি যোগ শিখিবে না?'

স্থ। 'তুমি ছেলে মানুষ, যোগের কি জান?'

শেষে সারি বলিল—"পঞ্চাশ বছরের মদ্দ, একটু আক্কেল নাই, আপনার মুখখানা আয়নায় না দেখে থাক, জলে দেখনি? ঐ পোড়ার মুখ চাঁদপানা তোমার বিশ্বাস হইল?"

দামোদর! এখন কি স্থন্দরাকে চিনেলে? চাঁদপানা মুখখানি বলিয়াছিল বলিয়া একেবারে গলিয়া পড়িয়াছিলে। এখন শুনিলে ত, কি বলিয়া তোমাকে বিদায় দিল। একূল ওকূল দুকূল হারাইলে! সন্যাসী হইতে নাম খারিজ করিতে হইল। গোরখ'নাথের নিকট আর তুমি মুখ দেখা-ইতে পারিবে না। ইহা অপেক্ষা আর তোমার ন্যায় ভণ্ডযোগীর আর কি সাজা হইতে পারে?

আর স্থন্দরা! এই অস্ত্রে বলিয়ান হইয়াই কি তুমি দিখিজয় করিতে বাহির হইয়াছ? তাই তোমার রমণী বেশ দেখি-তেছি। এই বেশে একদিন 'ক্লিওপেট্রা' বাহির হইয়াছিল। সেও তোমার মত রূপগরবনী—তোমার মত তেজস্বিনী—তোমারি মত বাক্‌চতুরা—তোমারি মত সমস্ত তাহাতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার জীবন উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। যাহাকে বাহুবলে, পরাস্ত করিতে না পারিত তাহাকে

তাহার রূপসাগরে ডুবাইত, পরিশেষে প্রেম হলাহলে তাহার দেহ জর্জ্জরিত করিত। সে হতভাগিনী স্বদেশ রক্ষার জন্য, আপন মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সকলই করিত। তাহার ইচ্ছা বীরপুরুষদিগকে পদানত করিয়া রাখা, তোমার ইচ্ছা ফলত বীর-পুরুষের দাসী হওয়া; কিন্তু কই? তাহাত কার্য্যে দেখিতেছি না, তুমি কি তবে জগতে পুরুষ খুঁজিয়া পাইতেছ না?

এ গীতি আবার কোথায় শিখিলে;

'ধরাত দেয়না হাওয়া ফুলে ফুলে চলে যায়।
একলা খেলে, একলা চলে, মন যেথা তারধায়।
হাওয়া কারুর কথা রাখেনা, মন ছুটেত
একটু থাকে না,
উষার বরণ চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না;
এই ধীর জলে, কমলে দোলে, এই নাচে
লহর মালায়॥"

তুমিও কি পবনের ন্যায় বনে বনে, গ্রহ নক্ষত্রে, ফুলে ফলে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া বেড়াইবে?—কখন কমলকে দোলাইবে, কখন লহর মালাকে দোলাইবে বা কখন বিজলিতে খেলিবে। ইহা কি তোমার যথার্থ পুরুষের দাসী হওয়া? এলিজেবেথ ত এ সকলই বলিয়াছিল। এত স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ব্বলক্ষণ।

জানিলাম পবনেরও গতি রোধ হয়। রাজদুহিতা হইয়ামহাপ্রভু গোরখ'নাথের নিকট কি ভিক্ষা চাহিতেছ? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যিনি চতুর্ব্বর্গ ফল দানেসক্ষম, তাঁহার নিকট তুমি আজি কি ভিক্ষা চাহিতেছ? সুন্দরা। "ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,' মন মত ভিক্ষা দেহ দাসীরে গোঁসাই।
অবলায় রাখ পায় ঘুচাও বিষাদ
দেহ হৃদয়ের চাঁদ—পূর্ণ কর সাধ;
অভিলাষী দাসী—তব নবীন সন্ন্যাসী—
মম প্রাণেশ্বর আমি পদে চির দাসী।

শেষে তুমি এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে? যে এক দিন সদর্পে বলিয়াছিল,— 'দেখলেম পৃথিবীতে পুরুষ নাই' আজি সে মহাপ্রভুরনিকট চতুর্ব্বর্গ ফল না লইয়াসামান্ত একজন সন্ন্যাসী গ্রহণে উৎসুক। যে এক দিন সাহঙ্কারে প্রিয় সহচরী সারীকে বলিয়াছিল, "প্রাণত আমার না কার!" সে আজি একজন সন্ন্যাসীর দাসী। এ সন্ন্যাসী কে? —'পূর্ণচন্দ্র'।

সুন্দরার চিত্র এখন ও সম্পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণচন্দ্র ভিন্ন সুন্দরার চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আবার পূর্ণচন্দ্রের চিত্র সুন্দরা ব্যতিত সম্পূর্ণ চিত্র হয় কই? দুইটী চিত্র পাশাপাশি আঁকিলে তবে এক খানি সম্পূর্ণ চিত্র হইবে। একের বিহনে অন্যের অঙ্গ-হীন হয়। মহাপ্রভু গোরক্ষনাথের ও অভিলাষ অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

সুন্দরা ভিক্ষা চাহিল 'নবীন সন্ন্যাসী,'— আর পূর্ণচন্দ্র ভিক্ষা চাহিল—

'বিদ্যা বুদ্ধি, মান, ধন রাজ্যের শাসন,
নাহি আকিঞ্চন; নাহি, নাহি দারা পুত্রে
সাধ।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, বিধাতা আমার।
তব সেবা ভিন্ন অন্য নাহিক কামনা,
জীবন সর্ব্বস্ব তব শ্রীপদ-অম্বুজ।'

পূর্ণচন্দ্রের কিছুতেই সাধ নাই। শিশুকাল হইতেই মাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিত। শিশুকাল হইতেই অকূল পাথার সম ভীষণ

সংসার আনিয়াছে। ক্ষুদ্র তরি-নর আবাহমান কাল তাহাতে ভাসিতেছে। সংসারের ভীষণ তরঙ্গে তাহা এই ডুবিতেছে এই ভাসিতেছে, সংসারের একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর প্রত্যয়; জগতের অমূল্য রত্ন 'বিশ্বাস।' বাল্যকালে জননীর নিকট পূর্ণচন্দ্র এই সকলই শিক্ষা লাভ করিত; কিন্তু সংসার কি এখন সে জানে না। তার পিতৃচরণ দর্শন যেমন দর্শন অমনি তাহার সংসার পরিচয়। চামার কন্যা বিমাতা লুনা পূর্ণচন্দ্রের প্রেমে পড়িল। লুনা সে অভিলাষ পূরণের জন্য অনুনয় করিল। পূর্ণচন্দ্র তখন

'এই ত সে দুরন্ত সংসার,
নহে এত কুসুম আগার—
ভীষণ কণ্টকময়!'

জানিল। অসদভিলাষ মিটিল না দেখিয়া আবার লুনা পূর্ণচন্দ্রের সতীত্ব নাশের অভিলাষ এই অভিযোগ যখন পূর্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজার নিকট করিল ও রাজা যখন

'স্পর্শে তোর পাপ বৃদ্ধি পায়,
নিজ করে সেই হেতু না বধি তোমারে;
ঘাতক ছেদিবে তোর শির
পাপ তনু দিব তোর শৃগাল কুক্কুরে।'

বলিলেন তখন পূর্ণ আর কিছুই বলিলেন না। কেবল এই মাত্র বলিলেন

'নরনাথ!
মৃত্যু—বন্ধু, মৃত্যু কেবা ডরে?
মৃত্যু বন্ধু—
'মুক্তি দেয় দারুণ সংসার কারাগারে।'

আবার শোকাকুলা জননীকে যখন বুঝাইতেছেন;—

'কেন মাতা, অধর্ম্ম শিখাও অনুচরে?
বলেছো ত এ সংসার পরীক্ষার স্থল,' তখন সংসার কি তাহা বুঝিয়াছে। প্রথমে শুদ্ধ মার নিকট শুনিয়া শিখিয়াছিল এখন ভুগিয়া শিখিল সংসার পরীক্ষার স্থল!

পূর্ণ কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। যাহার ধর্ম্মে এতাদৃশমতি তাহার আর জীবনের ভয় কি? গোরখ'নাথের অন্যতম শিষ্য কর্ত্তৃক শীঘ্রই কূপ হইতে উত্তোলিত হইল। গোরখ'নাথ পূর্ণচন্দ্রকে সংসারী করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন কিন্তু কিছুতেই সে ভুলিল না। পরিশেষে সুন্দরার সহিত মিলন। এ মিলন নহে, এ পরীক্ষা,—এ সাধারণ লোকের পরীক্ষা নহে,—এ যোগীর পরিক্ষা। সেবাদাস যখন গোরখ'নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"প্রভু একি লীলা তব?
পাপ-ইচ্ছা পুরাইতে চাহিল পাপিনী,
অর্পিলেন নবীন যোগীরে তার করে?

গোরখ'নাথ তাহাতে উত্তর করিলেন;—

পরীক্ষায় হয় পার সেই শ্রেষ্ঠ যোগী,
যার অঙ্গে নাহি বিন্ধে অঙ্গনা নয়ন,
কাঞ্চনে না টলে যার মন;
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে
সেই নরোত্তম;
* * * * * *
পরীক্ষা করিয়া লব ভক্তেরে আমার।"

ইহাতে গোরখ'নাথ শুদ্ধ পূর্ণচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া লইতেছেন না, পূর্ণচন্দ্রকে দিয়া সেবাদাসকেও পরীক্ষা করিয়া লইতেছেন।

পূর্ণচন্দ্র রাজপুত্র, সুন্দরা রাজকন্যা। এ মিলন দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু দুই-

জনের প্রকৃতি বিভিন্ন। পূর্ণচন্দ্র সংসার চাহে না। পূর্ণচন্দ্র কেবল তাহার সেই জীবন সর্ব্বস্ব 'শ্রীপদ-অম্বুজ' চায়। সুন্দরা তাহা চাহে না, সুন্দরা কেবল নবীন সন্ন্যাসীর চরণ সেবা করিতে চায়, সে এ তিনলোকের আর কিছুই চাহে না, ইহা পাইলেই সে সন্তুষ্ট।

সুন্দরা আর এখন সে সুন্দরা নাই। তাহার বিদ্যার গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, রূপের গরিমা সকলি চূর্ণীকৃত হইয়াছে। এখন সে রাজকন্যা বা রাণী নহে, এখন সে যোগিনী। মন্দির মার্জ্জন, কুসুম চয়ন, স্বামীর পূজার আয়োজন ও আসন প্রস্তুত প্রভৃতি তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য। এখন তাহার আর সে বাক্‌চাতুরী নাই, সে 'হাওয়ার মত' গান নাই। সকলি ফুরাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল এখন অতিশয় হেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে ও তাহার জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। কেবল সারী তাহার সহচরীর জন্য দুঃখিতা। সারী যে সারী সেই সারীই আছে। তাহার প্রকৃতির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সারী ভাবিয়াছে সুন্দরা উন্মাদিনী হইয়াছে। এ উন্মাদের কারণ কে?—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রকে মানুষ করিতে পারিলেই সুন্দরার রোগ সারিয়া যায়। সারী, সুন্দরার জীবনের একমাত্র সহচরী হইয়া এখন কি তাহার হতাশ হইয়া বসিয়া থাকা ভাল দেখায়? সে সেবাদাসের নিকট স্বামি-বশীকরণের ঔষধ লইয়া আসিল। সেবাদাস গোরখ'নাথের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। অবিশ্বাস অল্প পরিমাণে এখন তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এ অবিশ্বাসের কারণ—পূর্ণচন্দ্রসুন্দরা সম্মিলন। সেই অবিশ্বাসে বলিয়ান হইয়াই আজি বিরলে স্বামী বশিকরণের ঔষধ সেই পাপ সহচরী উন্মাদকারিণী ধর্ম্মবিনাশিনী সর্ব্বকর্ম্ম সংহারিণী মনোমুগ্ধকারিণী সুরা যে সুরার প্রভাবে ধাতা দুহিতায় প্রেমআলিঙ্গন দান করেন, যে সুরার মহিমায় পুরন্দর ও শশধর গুরুপত্নি হরণ করেন, যে সুরার উত্তেজনায় একদিন শঙ্কর কোঁচের নারীতে রত হয়েন, সেই সুরা আজি গোরখ'নাথ-শিষ্য সেবাদাস সারীকে প্রদান করিল। সারীর অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। কিন্তু সারী! এ ঔষধ লইয়া তোমার কি হইবে? সুন্দরার প্রকৃতি কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? ঐ শুন সুন্দরা কি বলিতেছে।

সু। দূরে করহ নিক্ষেপ;
ভেবেছ কি মনে
পশু সনে করিয়াছি প্রণয় বাসনা!
চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়!
নহে পশু ক্রিয়া;
ভাব কি, সজনী, মেষসম পতি করি সাধ?
ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ মুখপানে চাবে?
থাকিলে সে সাধ, পূর্ণ হত এতদিনে।
আসি কত জন পরিত বন্ধন;
নহে পত্নী, হতেম ঈশ্বরী।
আমি স্বামী, তারা হত নারী!
ছি! ছি! নারী হয়ে জান না নারীর প্রাণ!
রমণীর সাধ—
মনে মনে হৃদয় আসনে
সযতনে রাখিতে পতিরে,

হৃদয় ঈশ্বর—
নিরন্তর তাঁর পদসেবা।
উচ্চ-আশ নারীরাখে কিবা?
বারনারী যত্নকরি চাহে প্রেম দান।'

সারি! তুমি যাহার উপকারের জন্য ছুটিলে, তাহার নিকটেই' অবমানিত—লাঞ্ছিত হইলে। সেবাদাস! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল না।

পূর্ণচন্দ্র দেবালয়ে শিব পূজায় মগ্ন। শিব বল, শম্ভু বল, হরি বল, আর ঈশ্বর বল পূর্ণচন্দ্রের গোরখ'নাথ সমস্তই। সুন্দরা সেই বেশে মন্দিরে পূর্ণচন্দ্রের জন্য বিল্বদল ও গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত। অনেক দিন পর আবার সুন্দরা ও পূর্ণচন্দ্রকে একত্রে দেখিলাম। পূর্ণচন্দ্রের মন দেব পূজায়, সুন্দরার মন স্বামী পূজায়। সুন্দরা অতি যত্নে এক ছড়া কুসুমহার গাঁথিয়া আনিয়া স্বামীর নিকট দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ণচন্দ্র তাহা দেখিয়া হরষে বলিয়া উঠিল,—

আহা, অতিব সুন্দর মালা!
কেন রাখ? দেহ মোরে পূজা করি হরে।'

সুন্দরা বলিল। 'এক ভিক্ষা রাখ যোগীবর।
যতনে কুসুম তুলি গেঁথেছি এ হার
ধর উপহার পর গলে,
তৃপ্ত করি তৃষিত নয়ন।'

পূর্ণ। 'জান না, জান না
কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে।
মাংস পিণ্ডোপরে
ফুল হারে কি শোভা হেরিবে?
শবোপরে ফুলের কি শোভা?
করে যারে পবন ব্যজন,
যাঁর ডরে ভাঙ্গিছে তপন,
বন রাজি ধরে ফুল যাঁর পূজা হেতু,
যাঁর নাম ভবার্ণব সেতু,
সেই অস্থি মালা গলে দেহ ফুল মালা;
না রহিবে বাসনা জঞ্জাল,
নির্ম্মল অন্তরে
ফুলহারে হের দিগম্বরে।'

এইবলিয়া পূর্ণচন্দ্র সেই ফুলহার শিবগলে দিলেন। তখন সুন্দরা আর অধিক কিছু না বলিয়া কেবল এই মাত্র বলিল;

দেব, তুমি মম স্বামী,
দিগম্বরে নাহি জানি আমি,
তুমি পতি প্রাণেশ্বর মম,
ঠেল পায়' ক্ষতি নাহি তায়,
তব পদে রহিব কিঙ্করী।
মরিব তোমার নাম স্মরি,
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ, জীবনে জীবন
একমাত্র তুমি প্রভু! দাসীর ঈশ্বর।'

পূর্ণচন্দ্র সুন্দরার পতি ভক্তি দেখিয়া অবাক্ হইল। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বে যেরূপ এখন ও ঠিক সেইরূপ, ঠিক সেইরূপ অচল সেই রূপ অটল। সুন্দরাকে বলিলেন,

'সত্য যদি মনে মনে কিঙ্করী আমার,
ভিখারীর সনে যদি না কর কপট,
কেন তবে মজাইতে করেছ বাসনা?
বড় সাধে গুরুপদে সঁপেছি জীবন,
এ জীবনে গুরুদেব সর্ব্বস্ব আমার।
সেবায় তাঁহার কেন করেছ বঞ্চিত?
শুন সতি! সহধর্ম্মিণীর এই রীতি—
প্রাণপণে বাঞ্ছা করে পতির উন্নতি—
যোগ ভ্রষ্ট কেন মোরে করিবারে চাও?
বিদায় মাগিছে ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।'

সুন্দরা পূর্ণচন্দ্রের নিকট আর কিছুরই এখন প্রত্যাশী নহে। কেবল অভাগিনীর একটী ভিক্ষা, পূর্ণচন্দ্র একবার কেবল তাহাকে পত্নী বলিয়া সম্বোধন করে। জগতের কি বিচিত্র লীলা। একদিন যে জগতে কাহাকে ও ভ্রূক্ষেপ করিত না, কাহাকে ও পতি হইবার উপযুক্ত পাত্র বোধ করিত না, সেই আজি একজন সামান্য ভিখারী সন্ন্যাসীর মুখ হইতে "পত্নী" সম্বোধন শুনিলেই ধন্যা হইবে।

অভাগীর অদৃষ্টে আহা! তাহা ও হইল না। একজন সামান্য সন্ন্যাসী জগতেরঅসমান্য রূপবতী সর্ব্বগুণসমন্বিতা রাজদুহিতাকে পত্নী বলিতে ও কুণ্ঠিত। যাহার জন্য একদিন জগত লালায়িত হইয়াছিল, জগ তকে এক দিন যে তুচ্ছ করিয়াছিল, উপযাচিকা হইয়াও পূর্ণচন্দ্রের নিকট সফল-মনোরথ হইল না। পূর্ণচন্দ্র তাহাকে "আমি যোগী সংসারে বিরাগী, ত্যজিয়াছি কামিনী কাঞ্চন' বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। অভাগিনী সুন্দরা তখন করযোড়েএই ভিক্ষা চাহিল ;—

যেন অনন্ত অনন্ত কালে
রহি তব পদতলে,
পতিভাবে চিরদিন করি তব পূজা ;
*　*　*　*
পতি পদ করিয়াছি সার
ইহা হতে উচ্চ আশা নাহি কিছু আর,
জন্মে জন্মে হই যেন কিঙ্করী তোমার।
*　*　*　*
যথা থাক সুখে থাক নাহি করি মানা।
কিঙ্করীরে যদি কভু পড়ে তব মনে,
যেনো সে তোমার দাসী জীবনে মরণে।

তখন পূর্ণচন্দ্র বলিলেন,—

ধর ধর সুলোচনে শিবের প্রসাদ,
হউক ঈশ্বরে মতি করি আশীর্ব্বাদ।"

সুন্দরা গুরুগম্ভীরস্বরে সদর্পে বলিলেন—

ঈশ্বর না চাই, তোমা বিনা নাহি সাধ,
নমস্কার যোগী ক্ষমা কর অপরাধ।

হিন্দু ললনার স্বামী ভিন্ন আর জগতে কি আছে? স্বামী পূজায় যদি মোক্ষলাভ হয়, শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ণচন্দ্র যোগ তপ করিয়া যাহা পাইবেন, সুন্দরা শুদ্ধ পতিভক্তিপরায়ণা হইয়া ত তাহাই লাভ করিবেন। পূর্ণচন্দ্রের অন্তে মোক্ষ লাভ, সুন্দরার পরিণাম মোক্ষ লাভ।

পূর্ণচন্দ্রের চিত্র এই খানে সম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু সুন্দরার চিত্র এখন ও সম্পূর্ণ হয় নাই। পতিপরায়ণা রমণীর স্বামী ভিন্ন আরো পূজার অনেক আছে। সুন্দরা, স্বামীর চরণপূজা যখন তাহার ভাগ্যে জুটিয়া উঠিল না দেখিল, তখন সে প্রিয়সহচরী সারীর নিকট বিদায় লইতে যাইল। সারী বলিল 'কোথা যাবে?' সুন্দরা উত্তর দিল—

'যাব মম পতির আলয়ে ;
এ জীবনে পতি সেবা ভাগ্যে মম নাই,
তাই চাই শাশুড়ীর চরণ সেবিতে।
*　*　*　*
পুত্র বধূ আমি তাঁর, নন্দিনী সমান,
দুঃখিনীর করিব শুশ্রূষা,
দুইজনে রোদনে করিব দিনপাত—
দুঃখিনী, থাকিব সদা দুঃখিনীর সাথে।'

সারী জেষ্ঠা রাণীর দেখা পাওয়া অতি

সুকঠিন বলিল কিন্তু সুন্দরা সে কথা শুনিল না। সুন্দরা শাশুড়ীর সেবা অভিলাষী। ইহাতে যে বাধা দিবে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ও সে প্রস্তুত। রাজা চামার নন্দিনীর বশবর্ত্তী। তিনি তাহার কথায় উঠেন বসেন, একথা সুন্দরা বেশ জানে। স্বামী পায় নাই, শাশুড়ী পাইতে যদি রাজার সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সুন্দরা তাহাতে ও প্রস্তুত। কিন্তু ততদূর সুন্দরাকে কষ্ট পাইতে হইল না। অনায়াসেই শাশুড়ীর চরণ সেবা করিতে পাইল। সুন্দরা ধন্য! ধন্য তোমার পতিব্রতা ব্রত। রাজ্য ত্যাগ করিয়া সামান্যা বেশে শাশুড়ীর সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে চলিলে ও পরিশেষে তাহাতেই জীবন অতিবাহিত করিলে। তুমিই যথার্থ জগতের 'আদর্শ নারী'।

এখন কথা হইতেছে, কোন চিত্রটী সুন্দর—সুন্দরা সংসারী, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই স্বামী। স্বামিপূজা হইলেই সে সকলের পূজা হইল মনে করে। ইহার অধিক দূরে আর সে যাইতে চাহে না। রমণীর ইহাই যথেষ্ট। আর পূর্ণচন্দ্র সংসারনির্লিপ্ত; তাহার পিতা মাতা দারা সুত ভাই ভগিনী বন্ধু প্রভৃতি এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত সকলই সেই গুরু গোরখ'নাথ। গুরু ভিন্ন সে আর কিছুই জানে না। ভক্তিই তাহার মন্ত্রের মূল। পূর্ণচন্দ্রও আদর্শ পুরুষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুই জনই মোক্ষলাভ করিবে। ইহ জগতে ইহাদিগের সম্মিলন হইতে পারে না, কারণ উভয়েই ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাদিগের সম্মিলন পর জগতে। দুইটীই সম সুন্দর সমোজ্জ্বল চিত্র। দুইটীই সুনিপুণ চিত্রকরের সুন্দর চিত্র।

প্রকাশক।

হেমন্তে।

দুর্ব্বহ হৃদয় ল'য়ে নীরবে, গম্ভীরে,
পায় পায় চলেছি এ জীবনের পথে।
বাঁধিবারে চাহি হৃদি কত শত মতে,
কভু সংসারীর সুখে, কভু বা সমীরে!
কভু নিরাশার ছলে, কভু আশা সহ,
কভু ভবিষ্যৎ গর্ভে, কভু স্মৃতি-দূরে,
কভু রূপে, কভু গানে—মুহূর্ত্তেক ঘুরে
যে মন সে মন পুন বিকল দুর্ব্বহ!
কুসুমে জন্মে না ভ্রান্তি কেন এ যৌবনে,
বাঁশী-স্বরে কেন নাহি হাহা করে মন?
জ্যোৎস্নায় নদীতে কেন দ্যাখেনা স্বপন,
পায় না উৎসাহ কেন প্রভাত-পবনে?
হাহারে হেমন্ত-নিশি, কুহেলিকা ধূমে
কি ক'রে গেছিস এই হৃদয়-কুসুমে!

২

কি ক'রে গেছিস হায়, চঞ্চলা অতিথি!
রবি ত কুমেরু হ'তে, সুমেরুর পানে,
যেতে—যেতে তবু চায় সজল নয়ানে।
নাহি প্রেমিকের প্রাপ্য আমার সে স্মৃতি
কি ক'রে গেছিস হায়, অদৃষ্টের পাশা!

নিশি তো অমার মাঝে বেঁচে থাকে স'য়ে,
আসিবে তাহার শশী সুধারাশি ল'য়ে।
নাহি সে বিরহী-প্রাপ্য মোর সুখ আশা!

কি করে পড়িলি বুকে পাষাণের ভার!
স'য়ে আজ দুঃখ-জ্বালা, কাল,কবি হায়,
ধরা-মাঝে গায় ধীরে সে ব্যথা কথায়!
নাহি সে প্রকাশ-পথ এ দুঃখে আমার!
সুদীর্ঘ জীবন ল'য়ে, শুধু বেঁচে-মরে
পলে পলে খুঁজি—বুঝি, কি হ'লো কি করে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কাল স্রোত।

অনু অনু, পল পল, করিয়াই দণ্ড; দণ্ড হইতে দিন। দিনের প্রত্যেক অংশই অতীত লয় পায়। দিন ও অতীতে মিশাইয়া যায়। অতীত,কালের একটী অংশ মাত্র। ছোট ছোট স্রোতগুলি ইহার কোলে উহা মাথা রাখিয়া যেমন স্রোতেই লয় পায় ও সেই মহাস্রোত যেরূপ মহাসাগরে যাইয়া পরিশেষে আপন দেহ তাহাতে মিশাইয়া দেয়, সেইরূপ অনু, পল, দণ্ড, দিনও ইহার কোলে উহা মাথা রাখিয়া অতীতেই লয় পায় ও পরিশেষে কালের গাত্রে দেহ ঢালিয়া দেয়। কাল অনন্ত। ইহা এক ভাবে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। ইহার গতির পরিবর্ত্তন নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনশীল। মানব পরিবর্ত্তনশীল। সমাজ পরিবর্ত্তনশীল।

সুখ ও দুঃখ ব্যতীত মানুষের যেরূপ আর একটী অবস্থা আছে অর্থাৎ যে অবস্থায় মানব সুখেও নাই দুঃখেও নাই, মানবের পক্ষে যেমন উহা ক্ষণিক—সাধুর যেমন তাহা চিরন্তন—সেইরূপ ভবিষ্যত ও অতীতের মধ্যবর্ত্তী আর একটী সময় বর্ত্তমান। সাধারণের পক্ষে ইহা ক্ষণিক—নিমেষের মধ্যে ইহা অতীতের কোলে মাথা রাখিয়া থাকে কিন্তু বিজ্ঞের নিকট ইহা চিরন্তন-কাল-ব্যাপী সময়। যেরূপ ভাঁটার পূর্ব্বে জোয়ারের ঠিক পরই স্রোতের একটী অবস্থা আছে, সেইরূপ ভবিষ্যতের পূর্ব্বে অতীতের পর বর্ত্তমান।

বর্ত্তমানে যাহা ঘটিবে, তাহা অতীতের আলেখ্য, ভবিষ্যতের তাহা অলোচ্য। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা যখন যাহা করিয়াছেন, তাহার সমগ্র ইতিহাস অতীত, ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যতে সেইরূপ মানুষ গঠিত হইবে বলিয়া অতীতের এত যত্ন। ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষেরা ভবিষ্যতের জন্যই জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানের কার্য্য নাম মাত্র। মনু যাজ্ঞবাল্ক্য পার্শ্ব শাক্য শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের এই জন্যই যথা সময়ে আবির্ভাব।

এইরূপে এক জনের পর আর একজন ধরাধামে আসিতেছেন, আসিয়া এক যুগ সৃষ্টি করিতেছেন। যেন কি মহাদেশ পালনার্থে তাঁহারা সকলেই আসিতেছেন। বেলা ভূমিতে যেরূপ একটী ঢেউয়ের পর

আর একটী ঢেউ আসে—বলা বাহুল্য পরে যেই আগে সেই বড়—কিন্তু সকলই ফিরিয়া চলিয়া যায়, কেহই অধিগম্য স্থানে, যতদূর উঠা কর্ত্তব্য ততদূর, যাইতে পারে না। এইরূপ অনেক আনাগোনার পর দেখা যায় যে সে স্থান জলে জলময়, আবার একটু পরেই নামিয়া যায় সেইরূপ উক্ত মহাত্মারা একটীর পর আর একটী মাথা তুলিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যান ও অনেক আনা গোনার পর দেখা যায় সে কার্য্য সংসিদ্ধ হইয়াছে ও পরক্ষণেই আবার স্থান চ্যুত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতে হইলে আমরা উক্ত রূপ কথা বলিতে পারি না—আমরা আর দর্শক হইতে পাই না। আমরাই কার্য্যকরিজীব। আমরাই বর্ত্তমানের ছাত্র। কিন্তু অতীতের যাহা আলেখ্য ভবিষ্যতের তাহা আলোচ্য এই আলোচনার ফল আমরা ভবিষ্যতে মানুষের মত কার্য্য করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিতে পারিব। সৌর জগৎ যখন গগন মণ্ডল পরিভ্রমণ করে তখন যেরূপ আমরা কতকগুলি তারকা দেখিতে পাই ও কতকগুলিকে দেখিতে পাই না, মানব জীবন ঠিক সেইরূপ। ধ্রুব তারার মত গুটি-কতক তারা আকাশে সমান ভাবে জলিতে থাকে আর সমস্ত গুলিই নিভিয়া যায়।

শিল্পী চিত্রকর বিজ্ঞানবিৎ কবি প্রভৃতি অধিকাংশেরি নাম অন্যান্য তারকার ন্যায় নিভিয়া গিয়াছে, কেবল জন কয়েক অতি অল্প সংখ্যক ধ্রুব তারার মত ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া আছেন। বেকনের ন্যায় মহামতির দীপ্তি অগ্রে যেরূপ ছিল এখন আর সেরূপ নাই। পণ্ডিতা-গ্রগণ্য জনসনের নাম একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাস কাশীদাস অগ্রে কুল বধূরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন, এখন তাঁহাদিগের নিকট স্থান পাওয়া দূরের কথা, মুদী ব্যবসায়ীর নিকট স্থান পান কি না সন্দেহ। আধুনিক কবিগণের মধ্যে কেহ ধ্রুব তারা হইতে পারিবেন কি না জানি না তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস জ্ঞানদাস এমন কি জয়দেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জ্যোতি এখন হীনপ্রভ। ভারত চন্দ্রের নাম ডুবিয়া গিয়াছে। এইরূপ উত্থান পতন—এই উঠিতেছে এই ডুবিতেছে, এইরূপ আবহমান কাল হইয়া আসিবে। এইরূপে সাহিত্য ভাণ্ডার—জ্ঞান ভাণ্ডার ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। পরিশেষে যাহা থাকিবার তাহা থাকিয়া যাইবে, ইহা ব্যতীত পরিশিষ্ট লোপ পাইবে। তাহাদি-গের নাম ও আর কেহ করিবেনা।

প্রতি পল্ প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদিগের কাণে কাণে বলিতেছেন তোমরাই ধর্ম্মবল, তোমরাই মেধাবী। বাস্তবিক আমরা ভাবের আলোকে আশারপথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। শুদ্ধ আমরা নহি, আমাদিগের অপেক্ষা বয়ঃ কনিষ্ঠ ও তিমিরাচ্ছন্নেরা ও সে আশায় আশান্বিত—সে আলোকে আলোকিত। তাহার পর কি অবস্থা হইবে জানি না। আবার কি নব ভাবে বিভোর হইব—কোন নূতন গৃহে প্রবেশ করিব জানি না। কাহার দ্বারা কি হয় তাহা কে বলিতে পারে? কে জানিত একজন সামান্য দুশ্চরিত্র অভিনেতা ইঙ্গরাজি সাহিত্যের

রত্ন ও মহাকবি হইবেন? কে জানিত এক জন মূর্খ ব্রাহ্মণ আজি স্বরস্বতীর বর পুত্র হইবেন? পূর্ব্বে কে জানিত পরীক্ষাস্থল হইতে যিনি বিদূরিত হইয়াছিলেন তিনিই সমগ্র পৃথিবীর প্রধান বক্তাদিগের মধ্যে স্থান পাইবেন! কাল রহস্যে পরিপূর্ণ। প্রতি মুহূর্ত্তই ছদ্মবেশী রাজা। কাহার কাহার নিকট ইহা কিছুই নহে বোধ হইতে পারে কিন্তু বিজ্ঞের নিকট ইহা মহা আদরের সামগ্রী। দেখিও আমরা যেন ইহার নিকট হইতে বঞ্চিত না হই। এস আমরা ইহাঁকে কর-যোড়ে বলি আর কেন আমরা চিনিয়াছি, এরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে দিব না।

অতীত ও ভবিষ্যৎ অধুনাতন বর্ত্তমানকে হেয় করিয়াছে। এক সম্প্রদায় অতীতেরই পূজা করিয়া থাকেন। অতীতই তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। পুরাকালের ঋষীগণের কথা তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি, তাঁহাদিগের আদেশ সমাজ যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহাই পালনীয়। তাঁহাদিগের মত সেই সমস্তই এখন আবার প্রচলিত হউক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেদের অধিকারী,—শূদ্র, গাড়ু গামছা ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালনের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ জাতির পদ সেবায় তাহারা জীবন অতিবাহিত করুক। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে তপোবন হউক। ব্রাহ্মণেরা যোগ তপে রত হউন আর রাজার প্রধান কার্য্য সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তাঁহাদিগের যোগ তপের বিঘ্ন না হয় ইহাই করিতে থাকুন। এই সংখ্যার লোকই অধিক। তাহা বলিয়া আমরা ইঁহাদিগকে নিন্দা করিতেছি না। কোন সমৃদ্ধিশালীর উত্তরাধিকারীর পৈত্রিক বিষয় রাখিবার জন্য যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন করে বা যেরূপ বুদ্ধিমান বলা যায় উল্লিখিত অতীত উপাসক রক্ষণশীল মহাত্মাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি, তাহা অপেক্ষা অধিক বলা যাইতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধি বৃত্তিতেই তাঁহারা পরিচলিত। কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, কোম্পানীর চাকুরির নির্দ্ধারিত বেতনে সংসার ব্যয় সঙ্কুলান করা যতটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, উক্ত শ্রেণীর রক্ষণ শীল সম্প্রদায়ের বুদ্ধি- তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহাঁদিগের সংখ্যা অধিক ও প্রায়শঃই ধনী, তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে মেধাবী বলিতে পারি না। ইঁহারা বর্ত্তমানকে ঈর্ষান্বিত নেত্রে দেখিয়া থাকেন ও ভবিষ্যতকে চির-শত্রু মনে করেন।

আর এক শ্রেণী, তাঁহারা ভবিষ্যত উপাসক। ইঁহারা অতীত ও বর্ত্তমান উভয়েরই ঘৃণার্হ। ইঁহারা একেবারেই সমাজকে উন্নত দেখিতে চাহেন। ইউরোপীয় সমাজের সমকক্ষ হইতে তাঁহাদিগের অভিলাষ। পুরাতনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া আবার গড়া ইহাদিগের অভিপ্রায়। সাহেবি ধরণের অশন বসন, সাহেবি ধরণের চাল চলন ইঁহাদিগের উন্নতির প্রথম সোপান। বাহ্য দৃশ্যে ইহাঁরা বাস্তবিকই উন্নতশীল। অধুনাতন ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে যে সকল certificate, যে সকল অঙ্গাভরণ প্রয়োজন, সে সকল বেশভূষায় ইঁহারা বিভূষিত।

অর্থাৎ প্রকাশ্য সভায় দারা সুতা প্রভৃতি সপরিবারে উপস্থিত ও সাহেব দিগের সহিত তাঁহাদিগের পরিচিত করিয়া দেওয়া, বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা, বহু সন্ততিবিশিষ্ট দুঃখিনী বিধবার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ও এই রূপে তাহার দুঃখ মোচন করা ও স্বাধীন ভাবে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে দেওয়া প্রভৃতি যে সকল গুণের পরিচয়ে সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সে সমস্ত গুণই তাঁহাদিগের মধ্যে বিরাজমান। দূর হইতে এসকল দেখিতে অতি সুন্দর! মনে মনে এরূপ ও হইবে যে বাস্তবিকই বুঝি আবার এক যুগ সৃষ্টি হইতে চলিল। এরূপ উন্নতি কিন্তু আমরা ভালবাসিনা। এরূপ উন্নতির বাধা দিতেও প্রয়াসী নহি। কখন কখন শীর্ষস্থানীয় বলিয়া ও বোধ হয় কারণ উদ্দেশ্য মহৎ। অভিলাষ উচ্চ কিন্তু ইহার কার্য্যকারিতার ফল তাদৃশ সুন্দর নহে। উন্নতশীল মহাপুরুষ দিগের মনে সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নাই বলিয়া এরূপ বিশৃঙ্খল ঘটিতেছে। যিনি আপন পরিবারবর্গের উপর ও আপনার উপর আয়ত্ব করিতে অক্ষম, তিনি কিরূপ করিয়া একটী বৃহৎ সমাজের উপর আয়ত্ব করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহার হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই তিনি কিরূপ করিয়া সমাজের হিতকরী কার্য্য করিবেন? ভাঙ্গিয়া নূতন গড়া সহজ কথা নহে। ইহা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে। তাঁহাদিগের এ সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ও তন্নিমিত্ত প্রয়াসই শিব প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিগড়া হইয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক অদূরদর্শী মহাপুরুষ ও অপরিপুষ্ট যুবকবৃন্দ। ইহারাই হিন্দু সমাজকে একেবারে পর্য্যুদস্ত করিবার উপক্রম ও প্রতি মুহূর্ত্তেই সমাজকে তিতি বিরক্ত করিতেছে।

ন্যায়, ন্যায়-বিচার বলিয়া মহাচিৎকার, উন্নতিশীল মহাপুরুষদিগের 'ন্যায়'ই মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই তাঁহারা ছুটা ছুটি করিতেছেন। এই মন্ত্রে মন্ত্রীভূত হইয়াই একেবারে তাঁহারা বাতুল। সমাজকে উপর্য্যুপরি আক্রমণ ও দংশন করিতেছেন। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলেই বেশ প্রতীয়মান হইবে যে এই সকল মহাত্মাদিগের দ্বারা এক এক সমাজের এক এক দেশের কিনা মহা অনিষ্টপাত হইয়াছে। ক্রমওয়েলের উত্থানে একদিন ইংলণ্ড, শুদ্ধ ইংলণ্ড কেন, প্রায় সমগ্র ইউরোপ যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের নামে এখনও সমগ্র ইউরোপ শিহরিয়া উঠে। এতদ্ভয়েই একদিন ন্যায় ন্যায়-বিচার বলিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন; পরিশেসে ইঁহারই নেতা হইয়া ইহারই মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। কেশব যাহার জন্য আদি সমাজ পরিত্যাগ করিলেন আবার তাঁহাকেই সেই দোষে দোষী হইতে দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ,—সৎকার্য্যাভিলাষী। কিন্তু শুদ্ধ সৎকার্য্যাভিলাষী বা ভালকার্য্য হইলে কি হইবে? আমরা সৎকার্য্যাভিলাষ বা শুদ্ধ ভাল কার্য্য চাহিনা। মানুষ ও তাহার কার্য্য চাহি।

পৌষবারি চাহি না, বৃষ্টি চাহি, যাহার দ্বারা তুমি চির-কল্প-প্রসূ হইবে, যাহার কার্য্যের ইয়ত্তা থাকিবে না। আমরা এইরূপ মানুষ চাহি। এরূপ মানব যথার্থই উন্নতিশীলের নেতা হইতে পারেন। তিনি যথার্থই সমাজসংস্কারকের পাত্র। পুরাতন ভাঙ্গিয়া তিনি নূতন গড়িতে পারেন। কিন্তু এরূপ লোক জগতে অতিবিরল। স্বার্থপরতাই মানবকে হেয় করিয়া ফেলে। যিনি যতই দেশ হিতৈষী—যতই মানব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রায়শঃই তিনি ততই স্বার্থপর সমাজের ততই অনিষ্টকারী। যদি দেশ হিতৈষী হইতে চাও, যদি সমাজ সংস্কার করিতে চাও তবে স্বার্থশূন্য হও। আপন প্রাণে জগতের প্রাণ মিশাও, বৃষ্টির ন্যায় নির্ম্মল হও। তবে ত জগতে পূজ্য হইবে—জগতের কার্য্য করিতে পারিবে। বাস্তবিক নিঃস্বার্থ এ কথা উচ্চারণ করিতে ও আনন্দ বোধ হয়। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি দেবতা। গুরু বল, পুরোহিত বল, দারা বল, সুতা বল, পুত্র বল, প্রাণের বন্ধু বল, এমন কি পিতা মাতা বল, জগৎ বল এ সমস্তই স্বার্থপর হইলে উক্তদোষে দূষিত ব্যক্তিকে যেরূপ ভয়, যেরূপ সম্মান করিয়া থাকি, উঁহাদিগকে সেইরূপ সম্মান করিব।

সাধারণ মানব নূতন প্রিয়। নূতন পাইলে পুরাতন চায় না। তাহার দোষ গুণের দিকে দৃকপাত করে না। মদ্যপায়ীর ন্যায় তখন সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া থাকে। সুরাপায়ী যেরূপ নেসার ঝোঁকে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-রহিত হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আপন আমোদেই বিভোর থাকে, জন সাধারণ নূতনমোহে ঠিক সেইরূপ বিভোর, সেইরূপ চেতনারহিত থাকে। নেশা ছুটিয়া যাইলে মাতাল যেরূপ আপনার দোষ বুঝিতে পারে, জন সাধারণ ঠিক সেইরূপ মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে তাহার দোষাদোষ বুঝিতে পারে ও তাহার জন্য পরিশেষে অনুতাপ করে।

আর একটী কথা ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আজি কালি অধিক লোকেই উন্মত্ত দেখি। ভিখারী হইতে নাগাসন্ন্যাসী পর্য্যন্ত, কবি হইতে অকবি পর্য্যন্ত, লেখক হইতে অলেখক পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিঞ্চিৎ উপায় করিতেছে। 'জয় রাধে কৃষ্ণ' বলিয়া ভিখারী দাঁড়াইলে ভিক্ষা না দিয়া থাকা যায় না, বোম্ মহাদেব বলিয়া নাগা দাঁড়াইলে তাহাকে ফিরান যায় না। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্মের ঢেউ কোন দেশে কোন কালে এতদূর উত্থিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। জননী শিশুকে স্তন পান হইতে বঞ্চিত করিতেছে ও স্বামীর মনোহরণের জন্য বেশ ভূষায় সদাই ব্যস্ত। বিলাসিতার হেতু শিশুর দুগ্ধ হইতেছে না। ব্যবসায়ী ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত ক্রেতাকে ঠকাইতেছে। পূর্ব্বে যাহা শুদ্ধ কথায় হইত, এখন তাহা বাঁধা বাঁধির ভিতর ও অবশেষে বিচারালয়ে যাইয়া ও হইতেছে না। বিচারালয়ের বহুজনতা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পূজা বল, দেব দেবী অর্চ্চনা বল সকলই এখন লৌকিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূজা পুরোহিত তাঁহার শিষ্যের জন্য করিবেন। শিষ্য কেবল গুরুকে অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। পিতার উইলে নিত্য-

খেলার কথা উল্লেখ আছে, কাজেই করিতে হইবে। প্রতি বৎসর 'মা' আসেন, এ বৎসর না আসিলে লোকে কি বলিবে কাজেই 'মা' কে আনিতে হইবে। এখন পূজা অর্চ্চনা লৌকিক আচারে শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। হিন্দুর যদি কিছু সুখ্যাতির জিনিস থাকে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয়না, কিন্তু এখন তাহাও শিথিলিত দেখিতেছি। কিছু দিন পরে হিন্দুজাতি আর সে অহঙ্কারও করিতে পারিবে না। যে জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা পাপভয়ে সদাই সঙ্কুচিত থাকিতেন ও পরলোকে কি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিবেন বলিয়া সদাই ব্যাকুলিত হইতেন, এখন দেখিতেছি সেই জাতিই পাপের নামে পরিহাস ও পরলোকের নামে অট্টহাসি হাসিতেছে।

আমরা বর্ত্তমানের দাস। বর্ত্তমানই আমাদিগের ইষ্টদেবতা। ভবিষ্যতকে ভীতিচক্ষে লক্ষ রাখিয়া অতীতকে সহায় করিয়া এস বর্ত্তমানের পূজা করি, বর্ত্তমানকে নমস্কার করি।

প্রকাশক।

কার্য্যই জীবনের মূলমন্ত্র।

"O, gentlemen ! the time of life is short,
To spend that shortness basely, were too long,
If life did ride upon a dial's point,
Still ending at the arrival of an hour."

Shakespeare.

অনন্ত বিশ্বসংসার কার্য্যময়, মানব সেই বিশ্বসংসারের শ্রেষ্ঠ জীব, মানবচিত্ত সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মূলীভূত উপাদান। পঞ্চভূতাত্মক মানব-দেহ মনুষ্যের কার্য্যকরী শক্তির গৌণ কারণ, চতুর্ব্বর্গ-ফলাকাঙ্ক্ষী জীবাত্মা সেই কার্য্যকরী শক্তির মুখ্য আশ্রয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য তৎপরতা, ও জীবাত্মার ফলাকাঙ্ক্ষা মানব জীবনে জ্ঞানের সোপান স্বরূপ। কালে বুদ্ধিমান পুরুষ, অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় ও শেষে জ্ঞানময় পরব্রহ্মে তাঁহার জীবাত্মা লীন হইয়া থাকে।

জড় জগতে ও কার্য্যের বিরাম নাই। কাল-স্রোতে জড় জগৎ সুনিয়ন্ত্রিত রূপে আবহমান চলিয়াছে চলিতেছে ও চলিবে—নিরাময় নিয়ন্তার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? স্বকার্য্য-সাধন মানব প্রকৃতির নৈসর্গিক নিয়ম। ত্যাগ-শীলতা আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ। প্রকৃতিস্থ পুরুষ নৈসর্গিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতঃ কালে ত্যাগশীল হয় ও তখন তাহার জীবনে কার্য্য হইতে বিরতি পায়। কার্য্যের প্রারম্ভ ও কর্ম্ম ফল আপাততঃ দুঃখের কারণ হইলে

ও চরমে মানবকে অনন্ত সুখের ভাগী করিয়া থাকে, সেই জন্য কার্য্যই আমাদের ইহ জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

তৃপ্তি মানব-জীবনের অনুসরনীয় নহে, ভগ্নোদ্যম পুরুষের উ্যম-ভঙ্গই তাহার জীবনের গৌরবের বস্তু, হতাশের হাহা-ধ্বনি প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট দুঃখ-ব্যঞ্জক নহে। দুঃখ, ত্যাগ ও ধৈর্য্য অনন্ত সুখোদয়ের কারণ। যেমন অঙ্কুশ তাড়িত হস্তী অনিচ্ছা সত্ত্বে ও চালকের গম্য পথ অনুসরণ করিয়া থাকে, অতৃপ্ত জীবাত্মাও তদ্রূপ সর্ব্ব নিয়ন্তা বিশ্বপতির ক্ষুণ্ণ পথ অনুসরণ করে। এই অনুসৃত পথে কার্য্যই তাহার সহায়, কার্য্যই তাহার মূলমন্ত্র।

মানব নিজ কর্ম্ম গুণে অবিচ্ছিন্ন সুখ অবিচ্ছিন্ন দুঃখ অথবা সুখ দুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত পুণ্য ও পাপের বিনাশ নাই! কায়মনোবাক্যে যে সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংযমী পুরুষ সদা সুখী। কিন্তু তাঁহার সুখ ও কার্য্যসাপেক্ষ। মনুষ্য একদিনে সংযমী হইতে পারে না। কার্য্যের পর কার্য্য, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান অবিশ্রান্ত রূপে চলিলে তবে জীবাত্মার শ্রেয়ঃ লাভ হয়—নতুবা নহে।

একমাত্র কার্য্যই পরলোকে অনুগমন করিয়া থাকে, সেইজন্য পরলোক হিতকর ধর্ম্মানপেত কার্য্যই আমাদের অনুকরণীয়।

অবহিত-চিত্তে সৎকার্য্যে মনঃ সমাধান করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। সেই সিদ্ধি যে কেবল ইহজগতে স্পৃহনীয় এরূপ নহে, পরলোকেও তাহা পরম সুখের আকর।

গৃহস্থাশ্রমই কার্য্যের প্রশস্ত-ক্ষেত্র, আলস্য-শূন্যতাই কার্য্যসিদ্ধির একমাত্র সোপান। কার্য্যদ্বারাই উত্তরোত্তর ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন হইয়া থাকে; অতএব কার্য্যই আমাদের মানবজীবনের জীবন।

মোহই কার্য্য-হন্তা—মানব মোহপরবশ হইয়াই অকার্য্যকে কার্য্যজ্ঞান করে ও কার্য্যজ্ঞানে সেই অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বিষময় ফল প্রাপ্ত হয়।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলগ্রন্থি অনুষ্ঠান বা কার্য্য। ধর্ম্মের-দ্বার অসংখ্য। যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিস্ফল হয় না।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত-শুদ্ধি-লাভ করা যায় সেই চিত্ত-শুদ্ধিই অপার আনন্দের প্রস্রবণ।

আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। মনুষ্যের জীবিত কাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও, জীবিতকালের কার্য্যকলাপ অকিঞ্চিৎকর নহে, মানবের অভিলাষ সুসম্পন্ন হইতে না হইতেই, মানব কালগ্রাসে পতিত হয় বটে, তথাপি কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত থাকা মূঢ়ের কর্ম্ম। সত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণ মানব-দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে, জীবাত্মা ইহাদিগের ভোক্তা, কিন্তু পরমাত্মা এই তিন হইতেই পৃথক্। পরমাত্মা যুগপৎ ক্রিয়া-বিহীন ও ক্রিয়াবান জীবাত্মার আশ্রয়স্থান-ভাগী দেহ সতত ক্রিয়াশীল, এই খানেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-জ্ঞান উপলব্ধি হয়। জ্ঞানী ব্যক্তির সংসারে অনুরাগ থাকে না—তিনি

নির্লিপ্ত। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চারের উপায়ীভূত কারণ—কার্য্য ও অনুষ্ঠান। কার্য্য ব্যতীত জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? অজ্ঞানোপহতা বুদ্ধি মূঢ়ব্যক্তিতেই সম্ভবে। প্রকৃত জ্ঞানীতে তাহার সম্ভাবনা নাই। মোহ ও আলস্য মানবের প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনের অন্তরায় স্বরূপ, অনুষ্ঠান ও কার্য্য তদুপার্জ্জনের উন্মুক্তদ্বার।

আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ ও বাক্যের অনির্দ্দেশ্য হইলেও ইচ্ছাদি সম্পন্ন এই ইচ্ছাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অতএব কর্ম্মই আমাদের স্পৃহনীয়।

অর্থ যে জগতে কেবল অনর্থের মূল এমন নহে, কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য গৃহীর ইহা আবশ্যক, ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য নহে।

সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি, ধর্ম্মানুচরণে সেই বিমল সন্তোষলাভ করা যায়, তাহাই পুণ্য, পুণ্যের অপর বিধ অর্থ নাই।

কিন্তু কার্য্য কাল সাপেক্ষ, দুর্নিবার কালেরগতি অতিক্রম করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, মানবের স্বভাবতঃই জন্ম মৃত্যু নিরূপিত আছে। সময় উপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ হয়—এই জন্য ভবিষ্যগর্ভে মানবের আশা নিহিত, আশাহীন মানব মানব-পদ-বাচ্য নহে, এই আশাই তাহাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, এই আশাই তাহার জীবনের জীবন, এই কার্য্যই তাহার জীবনের মূল মন্ত্র।

শোক-সন্তাপ হইতে মানবকে রক্ষা করিবার একমাত্র প্রশস্ত উপায় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, বেদে ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম ত্যাগ উভয়েই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু গৃহীর পক্ষে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। কারণ এক গৃহস্থাশ্রমেই কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সকল আশ্রমের ফল ভোগ করা যায় ও সেই জন্য এই আশ্রম প্রশস্যতম বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া থাকে।

দৈবের অখণ্ডনীয়তা বিশ্বাস্য হইলেও ক্রিয়ানুশীলন আবশ্যক—দৈবের বলবত্প্রভাবে কখন কখন মানব স্বকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেনা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য ক্রিয়া বিরহিত হওয়া উচিত নহে। শোকাভিভূত হইয়া ও মানব কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না ইহাই শ্রেষ্ঠ নীতি। আচার নিষ্ঠ পুরুষ সাধুসম্মত ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বুদ্ধি বলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়া চরমে স্বকার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হন। উদ্যোগ বিহীন পুরুষ হীন ও ঘৃণার্হ, লোক সমাজে সে কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী পুরুষ আত্মীয় পরিজনের ও উপহাস্য। শাস্ত্রে মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত আছে, বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, আলস্যে কালক্ষয় করিলে বিধাতার নিয়মের বিপরীতাচরণ করা হয়, কার্য্যেই সুখ নিহিত আছে, আলস্যে নহে। পৃথিবী কর্ম্ম ভূমি, মানব সেই কর্ম্ম ভূমির

বুদ্ধিমান্ কৃষাণ, আত্মার শ্রেয়োলাভই তাহার কার্য্যানুষ্ঠানের উৎকৃষ্ট ফল। কর্ম্মহীন মানব পশু তুল্য। মানব দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মহীন হইয়া থাকা অপেক্ষা কুকর্ম্ম আর নাই।

কার্য্য মাত্রেই বুদ্ধির আয়ত্ত। লঘুচেতা নির্ব্বোধ পুরুষ কার্য্যের সদসৎ বিচারে অক্ষম, সে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হিতকর কার্য্যে অহিতের আরোপ করে ও তজ্জন্য দুঃখভাগী হইয়া বিধাতার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে দেখা যাউক এজগতে কৃতকার্য্য কে? কার্য্যের পর কার্য্য, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান, সংযমের পর সংযম ক্রমাগত এইরূপ চলিলে তবে মানরেব জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়—এই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইলে তখন মানব ভোগাভিলাষ শূন্য হইয়া থাকে তখন সে সহজেই নিশ্চেষ্ট ও মমতা শূন্য হইয়া পড়ে বিষয়াশক্তি স্বতঃই তাহাতে বিলীন হইয়া যায় তখন মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে তাহার সমান জ্ঞান তখন আর সে মনুষ্য নহে, পরম পিতার অংশ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহলোকে থাকিয়া কার্য্যনুষ্ঠান দ্বারা এবম্প্রকারে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়, সেই মহাজনই ইহ সংসারে কৃতার্থ কৃত কার্য্য।

সকল কার্য্যেই ইহলোকে আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ লক্ষিত হয়। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষ যুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণ সম্পন্ন হইতে পারে না কারণ মানব দোষ গুণ উভয়েরই আধার, উভয়েরই বীজ তাহাতে বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই মহামতি 'বেকন' বলিয়াছেন ;—

"Let us seasonably water the one and root out the other "কিন্তু ইহাও কার্য্যসাপেক্ষ। তাঁহার (utilitarian theory) র ও ভিত্তি কার্য্য (action) "Greatest good of the greatest number." কথায় হইতে পারে না, কার্য্যে করা চাই।

কিন্তু বিধাতার কৌশলের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা মানবের আয়ত্তাধীন নহে। যে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য আমরা এত কথা কহিলাম, দেখা গেল, যে, সেই কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত না হইলে আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় না, আমরা চরমেপরম পদ লাভে অধিকারী হইতে সমর্থ হই না।

শ্রীবামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

আমার বর্ম্মায় চাকরী।

১

বাঙ্গালীর বিদেশে চাকরী কিছু দিন পূর্ব্বে লোকে একটা দৈব বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করিত। দেশে বসিয়া যদি শাকান্ন জোটে তাহাও ভাল তবু বিদেশের ক্ষীর ননী ভাল নহে এটী আজিও অনেক বাঙ্গালীর বেদ বাক্য বলিয়া ধারণা আছে।

এই বিশ্বাসই বাঙ্গালীর অধঃপতনের মূল—ইহাই জাতীয় উন্নতির পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক। আজ কাল অবশ্য অনেকেই চাকরী ও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে অল্প বা অধিক দিনের জন্য প্রবাসী হইতেছেন এবং পূর্ব্বে বিদেশ নাম শুনিলে মনে যে একটা বিষম ভয় উপস্থিত হইত তাহা অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী আজিও ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায় প্রবাসকে স্বদেশ মনে করিতে শিখে নাই; এ শিক্ষা যতদিন না বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিবে তত দিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ রহিবে।

১৮—সাল, উত্তর ব্রহ্মদেশ সবে মাত্র ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। আমি কলিকাতায় সুখে চাকরী করিতেছিলাম, হঠাৎ হুকুম আসিল—বর্ম্মায় যাইতে হইবে। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; শুদ্ধ আমার নহে, সম্পর্কে যে যে খানে আছে—আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গ সকলের মুখ শুখাইয়া গেল। একে বিদেশ, তায় উত্তর ব্রহ্মদেশ, সে ত যাইবার স্থানই নহে। কল্পনায় ভয় এবং বিপদের যত প্রকার মূর্ত্তি চিত্রিত হইতে পারে, বর্ম্মায় চাকরী করিতে গেলে সে সকল গুলির সহিত সাক্ষাৎ অবশ্য সম্ভাবী, এইরূপ ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া অনেকে বহুদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপ দুঃসাহসের কথা শুনিলে অসম সাহসী বাঙ্গালীরও বুক দমিয়া যায়, এবং বলা বাহুল্য যে আমি ও একজন বাঙ্গালী; সুতরাং এক প্রকার স্থির হইয়া গেল যে পেটে না খাইয়াও দেশে থাকিতে হইবে এবং বাঙ্গালার কাঙ্গালীর সংখ্যা অন্ততঃ একটী বৃদ্ধি করিয়া আত্মীয় স্বজনের নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে হইবে।

কিন্তু চিরকালই মানুষ মনে করে এক, আর হয় আর এক। না যাইবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ পাকাপাকি হইলেও ঘটনাসূত্রে যাওয়াই পুনরায় স্থির হইল। কি জানি কেমন করিয়া লুপ্ত সাহস পুনঃ সংগৃহীত হইল। যে কার্য্যে বিপদের নামগন্ধ আছে তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিব না অথচ চাকরী পাইবার সময় ইংরাজ ও বাঙ্গালীতে প্রভেদ হইতেছে দেখিলেই অন্যায় বলিয়া চীৎকার করিব ইহা বড় ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না; বাঙ্গালী জাতীর কলঙ্ক যথাসাধ্য অপোনোদন করিবার ইচ্ছা মনোমধ্যে বলবতী হইল; নির্ব্বাপিত প্রায় স্বদেশানুরাগ বহ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া হৃদয়ের জড়তা নষ্ট করিল। আমি পরিজন বন্ধুবর্গের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া ২৮শে এপ্রেল প্রত্যূষে চাকরী উপলক্ষে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করিলাম।

২৮শে এপ্রেল ত্র্যহস্পর্শ—বার তিথি ও নক্ষত্র দোষ ঘটিয়াছিল। এরূপ দিবসে বাঙ্গালী সার্ব্বভৌম নৃপতি হইবার আশয় থাকিলেও বাটীর বাহির হয় না; বিদেশে যাইবার ত কথাই নয়, বিশেষ আবার বর্ম্মায়; অথচ সেই দিন জাহাজ ছাড়িবে সুতরাং যাইতেই হইবে, নহিলে চাকরী যায়। গ্রহ নক্ষত্রের শুভাশুভফল প্রদান ক্ষমতায় আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে সুতরাং সে দিন ভাল কি মন্দ তাহা জানিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু বাটীর অপর সকলে দিন দেখাইয়া-

ছিলেন এবং অশুভ দিন জানিতে পারিয়া অতিশয় বিমনা হইয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে জানিতে পারিলে আমার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় এই জন্য কেহই একথা আমার সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। আমি বর্ম্মা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে অশুভ দিনে যাত্রা করিয়াছিলাম বলিয়া সকলের আশঙ্কা হইয়া ছিল যে আমার কোন বিপদ ঘটিবে। এস্থলে বলা উচিত যে আমি একবৎসর বর্ম্মায়বাস করিয়া ছিলাম, ইহার মধ্যে বিপদ পাতের কথা দূরে থাকুক, এক দিনের জন্য কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা পর্য্যন্ত বোধ করি নাই। আমার বিশ্বাস যে বার তিথি নক্ষত্র দেখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে কার্য্য সিদ্ধি না হইয়া কার্য্য হানির সম্ভাবনা।

২৮শে এপ্রেল প্রত্যুষে সিয়ালদহ হইতে ট্রেনে ডায়মণ্ড হারবার যাত্রা করিলাম। পরিজন ও বন্ধুদিগের মধ্যে যাহারা ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সময়োচিত ও সাধ্যমত অনেক উৎসাহ প্রদান করিলেন, আমি ও হাসিমুখে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। বাস্তবিক তখন আমার প্রাণের ভিতর বড় স্ফূর্ত্তি বোধ হইতেছিল। নূতন দেশ, নূতন মানুষ, নূতন সামগ্রী, সকলই নূতন দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। ইহাতে মনোমধ্যে বেশ একটা উৎসাহ হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে হুস হুস করিয়া গাড়ী কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল।

যে জাহাজ রেঙ্গুনে যায় তাহা পূর্ব্ব দিন কলিকাতার চাঁদপাল ঘাট হইতে ছাড়িয়া ডায়মণ্ড হারবারে যাইয়া নঙ্গর করিয়া থাকে। বর্ম্মার যাত্রী প্রায় সকলেই সেই দিন কলিকাতায় জাহাজে উঠিয়া থাকে ; কিন্তু তারপর দিন প্রত্যুষে সিয়ালদহ হইতে একটা ট্রেন বর্ম্মার ডাক লইয়া ডায়মণ্ড হারবারে যায় এবং জাহাজে ডাক পৌছিলে তবে জাহাজ ছাড়ে। কেহ কেহ কলিকাতায় জাহাজে না উঠিয়া এই ডাকের ট্রেন গাড়ীতে যাইয়া জাহাজে উঠিয়া থাকেন। একদিন অধিক কলিকাতা বাস তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। তবে মাল পত্র আগের দিন জাহাজে উঠাইয়া দিতে হয় কেননা যে বোট খানি জাহাজে ডাক তুলিয়া দেয় তাহা ছোট সুতরাং বেশী ভারি জিনিস তাহার উপর লইয়া যাইতে নিষেধ।

৯॥ টার সময় গাড়ী ডায়মণ্ডহারবারে পৌছিল। দেখিলাম একখানি ছোট ষ্টিম বোট আমাদের লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ডাকের ব্যাগ সমস্ত প্রথমে বোটে উঠিল। তারপর আমরা যে কয়জন যাত্রী ছিলাম সকলেই সেই বোটে উঠিলাম। ডায়মণ্ড হারবারের নিকট নদী অতিশয় প্রশস্ত এবং জলের বর্ণ এখানকার অপেক্ষা অনেক গাঢ়। তখন আবার বড় বড় ঢেউ উঠিতেছিল, আমাদের বোট খানা এত তোল পাড় করিতে লাগিল যে আমরা কিছু একটা না ধরিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারিলাম না। দুই একটা ঢেউ বোটের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। আমাদের কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল। শীতল বারিকনাসংস্পৃক্ত

সুমন্দ বায়ুহিল্লোল সংস্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হইল এবং মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সমাগম হইল। নদীর মধ্যস্থলে জাহাজ খানি নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সেই বোট হইতে জাহাজে উঠিলাম। প্রায় বেলা সাড়ে দশটার সময় আমাদিগের জাহাজ রেঙ্গুন যাত্রা করিল।

নির্দ্দিষ্ট কেবিনে যাইয়া দেখি যে, শয়নের দুইটী স্থান রহিয়াছে। একটী নীচে এবং অপরটী উপরে। কেবিনগুলি বড় ছোঠ। দুইজনের ভিতরে এক সঙ্গে দাঁড়াইবার স্থান নাই। ইহার মধ্যে এক খানি আরসি, একটা ছোট কাঠের ছেপয়ার উপর একটা মুখ হাত ধুইবার চিলিম্‌চি এবং একখানা তোয়ালিয়া, একটা পানীয় জলপূর্ণ কাচের পাত্র, গেলাস, এবং মুখ ধুইবার জলপূর্ণ আর একটা পাত্র। এ সকলগুলিই কেবিনের দেয়ালের গায়ে আটকান। নহিলে জাহাজ যখন্ বড় দোলে তখন পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাই-বার সম্ভাবনা। শয়নের স্থানগুলিও কেবিনের দেয়ালের সহিত আঁটা। উপরে একখানি গদি চাদর ও দুইটি বালিস, অবশ্য চাদর ও বালিসের ওয়াড়গুলি পরি-ষ্কার। আমি যাইয়াই উপরের স্থানটী দখল করিলাম। কারণ এই, যে জাহাজে অনেকেরই বমি হয়। নীচে থাকিলে যদি উপরের লোক বমি করে তবে গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা, এইজন্য সকলেই উপরের স্থান দখল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। আর একটী কারণ এই যে কেবিনে একটি মাত্র প্রবেশের দরজা। সেটী প্রায় বন্ধ থাকে। বাহিরের দিকে একটা গোল গর্ত্ত আছে। সেটা জানালার কাজ করে। ঝড় তুফান না থাকিলে সেটা সমস্ত দিন রাত খোলা থাকে। খুব বাতাসও আসে এবং সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু নিম্নের বিছানা হইতে সেটা অনেক উচ্চ সুতরাং সেখান হইতে কিছুই দেখা যায় না।

কেবিনের ভিতর বড়ই গরম, যেন হাঁপা-ইতে হয়। আবার আমার কেবিনের ছাতের উপর এক পাল ভেড়া রাখিয়াছিল তাহাতে সেস্থানটা বড়ই অপরিস্কৃত এবং দুর্গন্ধময় হইয়াছিল। কেবিনের দরজা খুলিয়া রাখিলে ভয়ানক দুর্গন্ধ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, অথচ দরজা দিয়া রাখিলে বিষম গরম বোধ হয়। কিন্তু দুর্গন্ধ অপেক্ষা গরম ভাল বিবেচনা করিয়া অগত্যা সর্ব্বদাই দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত। আমার কেবিনে আর একটী মুসলমান ভদ্রলোকের স্থান ছিল। তিনি নীচের বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি একজন পঞ্জাবী মুসলমান, ওভারসিয়ার, পিসিন ভালি রেলওয়েতে কাজ করিতেছিলেন বর্ম্মায় বদলি হইয়া যাইতেছেন। সঙ্গী মুসলমান বলিয়া আমার বড় একটা অসুবিধা বোধ হইল না, পোড়া পেটের খাতিরে হিন্দু মুসলমানের বিচার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তুলিয়া দিয়াছি-লাম।

জাহাজে উঠিয়া বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল সঙ্গে অবশ্য কোন খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাই নাই,

কেননা জাহাজে খাইবার অতি সুবন্দোবস্ত আছে জানিতাম। অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন যে হিন্দু হইয়া জাহাজের খানা খাইতে আমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইল বা সঙ্গত বোধ হইল? উত্তরে এই বলিতে পারি যে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার জন্য যদি লোকের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে আমাদিগের অপেক্ষা উহাদের খাদ্যে অধিক প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা; সঙ্গত বোধ হইয়াছিল কিনা একথা উঠিলে ব্যক্তব্য এই যে আমার বিশ্বাস ধর্ম্মের সঙ্গে খাদ্যের কোন সম্পর্ক নাই। কেবিনের দরজায় একটা লোক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, তাহাকে Boy বয়্ বলিয়া সকলেই ডাকে, সে যথাসময়ে সকলকে চা তৈয়ারি করিয়া দেয়, খাবারের আয়োজন করে, মুখধুইবার এবং খাইবার জল দেয় এবং অন্যান্য ফাই-ফরমাস খাটে। আজ্ঞা পাইবামাত্র সে সমস্ত আয়োজন করিয়া দিল, আমিও যথা-সাধ্য উদর পূর্ণ করিলাম। কিন্তু খাইবার সময় ভয় হইতে লাগিল পাছে বমি হইয়া সকল উঠিয়া যায়।

বিলাত যাইলে জাতি যায় এবং গোমূত্র গোবর ইত্যাদি অনেক উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া অথবা সমাজের দলপতি ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে কিছু ঘুস দিয়া পুনরায় সমাজ ভুক্ত হইতে হয়। বেশ কথা;—সমাজ একটা নিয়ম করিয়াছে সমাজে থাকিতে হইলে সকলকেই তাহা মানিয়া চলা উচিত, কেননা সমাজ যখন আমাদিগকে অনেকগুলি স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে দেয় তখন সমাজের দুইএকটা অত্যাচার সহ্য করিতে অস্বীকৃত হওয়া সঙ্গত বোধ হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে বর্ম্মায় যাইলে জাত যায় না কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? বিলাতে যাইতে হইলে যে যে সমাজনিয়ম ভঙ্গের জন্য জাতিচ্যুত হইতে হয়, বর্ম্মায় যাইলেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্পৃষ্ট অখাদ্য ভক্ষণে যদি জাত যায়, তবে বিলাতযাত্রী ও বর্ম্মাযাত্রী উভয়েরই সমানভাবে সমাজদণ্ড বহন করা উচিত। কিন্তু বোধ হয় ইহাতে জাত যায় না, কেননা কলিকাতায় প্রকাশ্যে অনেক বড় বড় হিন্দু অস্পৃশ্য জাতি স্পৃষ্ট অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন, এবং সমাজও তাঁহাদিগকে মস্তকে করিয়া রাখিয়াছেন। তবে কি কালাপানি পার হইলেই জাত যায়? কিন্তু বর্ম্মা যাইলেও ত কালাপানি পার হইতে হয়। তবে কি বিলাতের লোক-দিগের সহিত অনেক দিন একত্র বাসের জন্য লোকের জাত নষ্ট হয়? কারণ বিলাতের লোকেরা বড়ই অপরিষ্কার, অখাদ্য খায় ও অপেয় পান করে। ইহা যদি হয় তবে বর্ম্মায় যাইলে লোকের আগে জাত নষ্ট হওয়া উচিত। পৃথিবীতে এমন অখাদ্য কিছু নাই যাহা বর্ম্মারা খায় না; পচা ভিন্ন তাজা জিনিস কখন ছোঁয় না; সকল প্রকার অপেয়ই পান করে, এবং তাহাদের আচার এত অশুদ্ধ যে তাহাদিগকেই প্রকৃত ম্লেচ্ছ বলা উচিত। তবে বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা বর্ম্মায় চাকরির খাতিরে গিয়া থাকেন বলিয়া এখানে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' এই প্রচলিত কথাটীর সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

তরঙ্গের উপর ঈষৎ নাচিতে নাচিতে আমাদিগের জাহাজ বঙ্গোপসাগরের মুখে চলিতেছে। নদী তীরস্থ বৃক্ষাদি ক্রমশঃ দূর হইতে অধিক দূরে অপসৃত হইতেছে। মাঝে মাঝে দুই একখানা জাহাজের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে। কতকগুলো ষ্টিমার পালতোলা বড় বড় জাহাজকে টানিয়া লইয়া সাগরে ভাসাইয়া দিতে যাইতেছে। ডায়মণ্ড হারবার ছাড়াইয়া কিছু দূর নামিয়া গেলে আর এক খানিও নৌকা দেখিতে পাওয়া যায় না। তরঙ্গগুলি একটার পর আর একটা জাহাজের গায়ে লাগিতেছে এবং বড় করাতে তক্তা চিরিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ করিতেছে। ক্রমে বেলা-ভূমি কৃষ্ণবর্ণ রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং এক একবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে বোধ হইতে লাগিল।

বেলা চারিটার সময় আমরা সাগর পয়েণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সাগর দ্বীপ একটি বিস্তৃত শ্যামল ভূখণ্ড। দ্বীপ হইতে জাহাজ অনেকদূরে থাকে বলিয়া ভূমির উপরিস্থিত কোন দ্রব্য স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। অপরদিগের তীরভূমি আর দেখা যায় না। এইস্থান গঙ্গানদীর মোহানা। শুনিলাম গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে আসিলে এই পর্য্যন্ত আসিতে হয়। সাগর দ্বীপ দূরে পড়িয়া রহিল। ক্রমে একেবারে অদৃশ্য হইল। আর কোন দিকে কিছু দেখা যায় না। যে দিকে চাও অসীম জলরাশি তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠাইয়া উন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছে। ওই যে একটি তরঙ্গ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, ক্রমেই উচ্চে, আরো উচ্চে উঠিল, বুঝি বা সুনীল আকাশতলে ভাসমান মেঘমালাকে স্পর্শ করিতে চাহে। কিন্তু কি মনে করিয়া অতদূর উঠিল না। আস্তে আস্তে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত রজত মণ্ডিত মস্তকটি নত করিল; কি ভাবিয়া আবার যে বারি গর্ভ হইতে উঠিয়া ছিল তাহাতেই ডুবিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি তরঙ্গ উঠিয়া তাহার অগ্রগামী সঙ্গীর ভাব ভঙ্গি পরীক্ষা করিতে-ছিল, সঙ্গীকে জলে নিমজ্জিত দেখিয়া সেও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিল। এইরূপ একটির পর আর একটি তরঙ্গের উত্থানে ও পতনে উদ্বে-লিত সাগরবক্ষের আকৃতি দেখিয়া অত্যুচ্চ শৈল শ্রেণীময় বিস্তৃত প্রান্তর বলিয়া বোধ হয়

বঙ্গোপসাগরে জাহাজ আসিয়া বড়ই আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমি কেবিনে শুইয়াছিলাম। আমার মস্তক একবার উপরে উঠিতে আবার নিচু হইতে লাগিল। নৌকা দুলিলে আমার বমি হইত সুতরাং এরূপ তোলপাড়ে যে অসুখ হইবে তাহা আমি নিশ্চয়ই জানিতাম এবং সেই জন্য আমার মনে মনে বিশেষ ভয় ছিল। মোহানা হইতে কতকদূর পর্য্যন্ত এক একটি বয়া কিছু অন্তরে অন্তরে বাঁধা রহিয়াছে দেখিলাম; এই গুলি জাহাজ যাই-বার পথ নির্দ্দেশ করে। মাঝে মাঝে এক এক খানা আলো দিবার জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহি-য়াছে। বারমাস উহারা ওই খানে থাকে এবং রাত্রিতে ওই জাহাজে এবং বয়াতে আলো দেওয়া হয়। আলো দিবার জাহাজে লোক রহিয়াছে তাহাদের সমুদ্রেই বাস,

তাহাদের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অপর জাহাজে আনিয়া পৌছিয়া দেয়। এই স্থানে অনেক চড়া আছে। জাহাজ চালাইতে পাছে কোন বিপদ উপস্থিত হয় বলিয়া এই আলোর জাহাজ ও বয়াগুলি নজর করিয়া রাখা হইয়াছে, উহার পাশ দিয়া জাহাজ যাইলে আর কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মাঝে মাঝে দুই একটা পাখী উড়িয়া যাইতেছে এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মাছ ধরিয়া খাইতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে আলো দিবার জাহাজে এই সকল পাখী বাসা করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিল যে এই জাতীয় পাখীদের ডানার বড় জোর। তীর হইতে এত দূর এবং ইহা অপেক্ষাও দূরে শীকারের অন্বেষণে উড়িয়া যায়; পাখী গুলি দেখিতে অনেকটা বকের মতন।

জাহাজ বড় দুলিতে লাগিল, আমি ও বমি করিতে আরম্ভ করিলাম। একবার বমি করিয়া মনে করিলাম এই বুঝি সাঙ্গ হইল।—২। ১ মিনিট পরেই আবার বমি। প্রথম প্রথম পেটে যাহা কিছু ছিল সকলি উঠিয়া গেল, অবশেষে বমির চেষ্টা হয় অথচ কিছুই উঠে না; কি ভয়ানক কষ্ট হয় তাহা যে না ভুগিয়াছে সে কল্পনায় ও আনিতে পারিবে না। জল খাইলাম জল উঠিয়া গেল; আনারস নেবু ইত্যাদি অনেক প্রকার ফল লইয়া গিয়াছিলাম সকলি ব্যর্থ হইল। ক্রমে বমি করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম; দুই এক জন ডাক্তার আমার সহযাত্রী ছিলেন, হাত টিপিয়া দেখিয়া বলিলেন নাড়ী বড়ই দুর্ব্বল। এটা ওঠা অনেক জিনিষ খাইতে বলিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। চারি ঘণ্টা ক্রমাগত বমি করিতে লাগিলাম এবং এত অধিক কষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে মনে হইল জাহাজ খানা ডুবিয়া গেলে ভাল হয়, তাহা হইলে এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাই।

জাহাজে একটী লোক কতকগুলি ডাব লইয়া যাইতেছিল; আমার চাকর একটা ডাব কাটিয়া আনিয়া আমাকে খাইতে দিল এবং বলিল যে ডাব খাইলে বমি নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমার বড় তৃষ্ণা ও পাইয়াছিল. ডাব খাইয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একেবারে বমিবন্ধ হইয়া গেল। সমুদ্রে যাইলে যে বমি হয় তাহা বন্ধ করিবার জন্য যে কত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু সকল ঔষধ সকল সময়ে খাটে না। যাহা হউক এবার যাঁহারা সমুদ্রে যাইবেন তাঁহারা কয়েকটা ডাব সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন; ডাবের জলে আরোগ্য হয় কি না তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

বমি করিয়া অবসন্ন প্রায় হইয়াছিলাম সুতরাং বমি বন্ধ হইবার পর নিদ্রা আসিতে অধিক বিলম্ব হইল না। প্রত্যুষে নিদ্রা-ভঙ্গের পর উঠিবার সময় মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং গা বমি করিতে লাগিল—মাথা তুলিলে যতকষ্ট, শুইয়া থাকিলে তত কষ্ট বোধ হইত না। সমস্ত দিন রাত্র শুইয়া কাটিয়া গেল—দিন রাত্র জাহাজ অবিশ্রান্তে একভাবে চলিতে ছিল। স্থানে

স্থানে সমুদ্রের জলের বর্ণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল। কোথাও জল নদী জলের ন্যায় ঘোলা, কোথাও বা নব পল্লবিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় হরিদ্বর্ণ এবং কোথাও গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ ঠিক যেন ইংরাজি কালির রং—সমুদ্রের গভীরতার প্রভেদে জলের বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে; যেখানে অল্প গভীরতা সে খানের জল ঘোলা—এবং যেস্থান অতলস্পর্শ সেস্থানে জল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ; এই কালো জলের উপর জাহাজ আসিলে অনেকেই কালাপানি বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

৩০শে এপ্রেল। প্রাতঃকালে উঠিয়া একবার স্নান করিব মনে করিলাম কিন্তু তখনো উঠিতে গেলে বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক স্নান করিলে শরীর অনেক সুস্থ হইবে এই মনে করিয়া জাহাজের উপরে উঠিলাম। স্নান করিবার ঘর ডেকের উপর—ঘর গুলি ছোট ছোট, ভিতরে একটী কমোড পাতা আছে এবং একটী টিনের বড় টব আছে, তাহার ভিতর বসিয়া বা শুইয়া স্নানকরিতে হয়; দেয়ালের গায়ে একটা ট্যাপ আছে, সেটা ফিরাইয়া দিলেই উপর হইতে ঝাঝরা দিয়া সমুদ্রের জল পড়ে। ঘরের ভিতর ছোট আর একটী টবে খানিকটা পরিষ্কার জল থাকে তাহাতে মুখ ধুইতে হয়; এবং সাবান মাখিবার ইচ্ছা থাকিলে সেই জল ব্যবহার করিতে হয়। সমুদ্রের জল অত্যন্ত লোনা। স্নান করিবার সময় এক ফোঁটা মুখের ভিতর গেলে কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু বড় শীতল। স্নান করিয়া বড় তৃপ্তি বোধ হইল। এত লোনা জল বলিয়া সাবানের ফেনা হয় না, সাবান মাখিলে মাথা ও গা বড় চটচটে হয়। এজন্য সাবান মাখিতে হইলে ছোট টবে যে পরিষ্কার জল থাকে তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

সেদিন দুই একটা উড়ো মাছ দেখিলাম। তাহাদিগের আকৃতি দূর হইতে স্পষ্টরূপে ঠিক করিতে পারিলাম না। বোধ হইল সেগুলি সরু ও লম্বা। সমুদ্রের ভিতর হইতে আকাশে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন করিল, আবার সমুদ্রের মধ্যে ডুবিল। Flying fishএর কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম এখন স্বচক্ষে দেখিলাম।

৩০শে এপ্রিল—সন্ধ্যার সময় জাহাজের উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম। সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্ত দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। বড় বড় ঢেউগুলির মাথা লালবর্ণে রঞ্জিত হওয়াতে দূর হইতে সেগুলিকে প্রদোষ কালের মেঘমণ্ডলী বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। যেদিকেই দেখা যায় সুনীল গগনমণ্ডল অনন্ত বিস্তৃত সুনীল বারিরাশির সহিত মিলিত হইয়াছে; রক্তবর্ণ বিস্তৃতায়তন সূর্য্যদেব আস্তে আস্তে সেই অতলস্পর্শ জলরাশির মধ্যে স্বীয় কলেবর নিমজ্জিত করিয়া সে দিবসের মত বিশ্রাম লাভ করিলেন। অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ মাথার উপরের আকাশ ছাইয়া ফেলিল, তরঙ্গের উত্থানও পতনে বোধ হইতে লাগিল যে কতকগুলি তারকা সমুদ্রের ভিতর হইতে একবার উঠিতেছে ও আবার ডুবিতেছে।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় ঝড় বড় উঠিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। এক জন লোক আমার কেবিনের জানালা

বন্ধ করিতে আসিল। তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া বায়ু বহিতেছে এবং মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে কোন কোন কেবিনে জানালা দিয়া জল আসিয়াছে। জাহাজ তখন অতিশয় দুলিতেছে এবং ডেকের উপরে যে সকল যাত্রী ও ভেড়ার দল ছিল তাহারা গড়াইয়া একবার এদিকে একবার অন্যদিকে পড়িতেছে। আমি উঠিলাম না কেননা জাহাজ যেরূপ দুলিতেছিল, তাহাতে উঠিলেই আমার বমি হইত। প্রায় এক ঘণ্টার পর ঝড় ও বৃষ্টি থামিল। আকাশ পরিষ্কার হইল।

১লা মে প্রত্যুষে ৫টার সময় আমরা ইরাবতীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিন দিনের পর আমরা আবার জমির মুখ দেখিলাম, তীরস্থ গাছ পালা দেখিয়া বড় আমোদ বোধ হইল। ক্রমে আমাদের জাহাজ ইরাবতীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ইরাবতীর উভয় পার্শ্বস্থ তীরভূমি দেখিতে অতি সুন্দর, অগণিত শ্যামল তরু-রাজি দুই ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে তন্মধ্যে তাল ও তন্নামের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য দেবমন্দির, তাহার মধ্যে অনেকগুলি আবার স্বর্ণমণ্ডিত। এগুলি বর্ম্মিজ পাগোডা (Burmese pagoda) এদেশীয় লোকে ইহাকে 'ফায়া' বলে। এইরূপ একটী কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে স্থাপিত হইয়াছে। বেলা সাতটার সময় রেঙ্গুনের বন্দরে আমাদের জাহাজ পৌঁছিল। বন্দরটী প্রকাণ্ড, অনেক জাহাজ সেখানে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। আমাদের জাহাজ পৌঁছিবামাত্র একটা তোপ হইল; কলিকাতার মেল পৌঁছিলেই একটা তোপ হয়। আমরা জিনিস পত্র লইয়া রেঙ্গুনে পদার্পণ করিলাম।

শ্রী——

শৈলজা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই বন্ধু।

রড়ার মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। জন মানব কেহই নাই। কেবল দুইটী তরুণ বয়স্ক বালক গ্রীষ্মের দুই প্রহর রৌদ্রে একটী বৃহৎ অশথ বৃক্ষ তলে বসিয়া কথপোকথন করিতেছে। একজন অপর জনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে "তবে কি আর তাঁহাকে পাইব না।" অপরটী উত্তর করিল "এখনও ত খুঁজিয়া পাইলাম না। তুমি ও ত খুঁজিতে ক্রটি কর নাই।" এই বলিয়া সে নীরব হইল। পূর্ব্বোক্তটী অর্থাৎ প্রশ্ন কর্ত্তা ভবেন, অপরটী যোগেশ, উভয়েই চিন্তাকুল। প্রায় এক মাস গত হইল শৈলজার পিতার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সুরবালা শশুরালয়ে যাইয়াই স্বামীর উপর অভিমান সহকারে—শৈলজার পিতার অন্বেষণের ভার ন্যস্ত করিয়াছিল। নীরবালাও

নরেন্দ্রনাথকে সাদুনয়ে বিনয়ে হরিশ্চন্দ্রের অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সকলেইচেষ্টা করিয়াছিল সকলেরই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। যোগেশের পিতা রাম তনু বাবু ও ক্রমে ক্রমে সুরবালার ও নিরবালার নিকট হইতে সেই অশুভ সম্বাদ যথা সময়ে পাইলেন। তিনিও ক্রমে হতাশ হইলেন।

আজ যোগেশ এক খানি পত্র দেখিয়া এরূপ চিন্তিত এরূপ ব্যাকুলিত হইয়াছে। তাই আজ দুই বাল্য সহচরে অনেক দিনের পর এরূপ বিরলে বসিয়া কথোপ-কথন হইতেছে।

অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধের পর ভবেন যোগেশকে বলিল' কিন্তু যা বল যা কও ভাই আমার কথাটা সত্যি বলে বোধ হয় কারণ আমি শুনেছি সিমুলিয়ার আশু বাবু যার বাগানে মৃত লাস পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার পরম বন্ধু। সে বাগানে বন্ধু বান্ধবের সহিত, জগদীশ্বর না করুণ— আমোদ আহ্লাদ করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া যাইলে তিনি পরিশেষে আত্মহত্যা করিলে ও ত করিতে পারেন।"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'না' আমার তা বিশ্বাস হয় না, তুমি তাঁর প্রকৃতি জানিতে না তাই তুমি একথা বলিতেছ। বল দেখি তাঁকে কি তুমি এই বার বৎসর বাড়ীর বার হইতে বা কাহারও বাড়ীতে যাইতে দেখিয়াছ? বাস্তবিক হরিশ্চন্দ্র তাঁহার বিষয় বিনষ্ট হইবার পর আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতেন না। কোথা ও নিমন্ত্রণ যাইতে ও লজ্জা বোধ করিতেন।

ভব। 'না তা দেখিনি সত্য, কিন্তু নিরবালার সে চিঠি খানা কি সব মিথ্যা। আর যদি মিথ্যা হয় তাহাহইলে আমাদিগেরই বা এত ভাবিবার কারণ কি?'

যো। 'কি জান ভাই এরূপ বেওয়ারিস্ লাস হইলে ওরূপ বোধ হইয়াই থাকে, পচিয়া গিয়াছে চিনিবার ত যো নাই। কেবল পায়ের জুতা জোড়াটাতে ছোট মার (নীর-বালার) সন্দেহ হইয়াছে। কিরূপ কাপড়খানি পরিয়া বাহির হইয়াছেন জানিবার উপায় ও নাই। তাই তিনি স্ত্রীলোক, তাঁর ও সন্দেহ সহজেই হইতে পারে। আর ইহা তুমি জানিও ইহার জন্য আমি চিন্তিত ন'ই।' কিন্তু মনে মনে বলিল আমার চিন্তা শৈলজার জন্যই।

ভব। "তবে কি তুমি মনে কর লালুর কারসাজি। লালুকিন্তু আদালত হইতে বাহির হইবার সময় তোমার ও শৈলজার পিতাকে শাসাইয়াছিল এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে পশ্চাৎ দেশ হইতে একটী আলুলায়িত-কেশা মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধায়ী রমণী মূর্ত্তি "সে মরিবে কেন—সে মরিবে কেন যে বলে সে মরুক তার সাত পুরুষ মরুক" বলিতে বলিতে যোগেশ ও ভবেনের সম্মুখীন হইল। ভবেন সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। যোগেশ তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। রমণী যোগেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "তুইও ও পোড়ার মুখোর সহিত মিশিয়াছিস—শিগ্গির গোল্লায় যাবি—শিগ্গির গোল্লায় যাবি তুই যাবি শৈলি যাবে—উচ্ছন্ন যাবি—উচ্ছন্ন যাবি' এই কথা বলিতে লাগিল ও দন্ত ঘর্ষণ

করিতে লাগিল। ক্রোধে আরক্ত লোচন হইল। একবার সেই আরক্ত লোচনে ভবনের দিকে চাহিল সে চাহনিতে ভবেনের আত্মা উড়িয়া গেল। যোগেশকে আবার বলিল "এখনও কথা শুনিতেছিস না—এখনও বসিয়া রহিয়াছিস বলিয়া যোগেশকে মারিতে উদ্যত হইল। ভবেন বেগতিক দেখিয়া দৌড় দিল। রমণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। ভবেন নিমেষমধ্যে দৃষ্টির বাহির হইল। রমণী ফিরিল। যোগেশকে আবার দেখিতে পাইয়া তাহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিল 'বল্ উহার সাথে আর বেড়াবিনি—বল্ বেড়াবিনি—ওর সঙ্গে আর কথা কহিবিনি আমার মাথা খাস বল ওর সঙ্গে আর বেড়াবিনি' এই কথা রমণী বারম্বার বলিতে লাগিল আর কাঁদিতে লাগিল। যেগেশ হাত ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই পারিল না শেষ বলিল "না উহার সঙ্গে আর বেড়াইব না উহার সহিত আর কথা কহিব না। রমণীর তাহাতে বিশ্বাস হইল না আবার বলিল "ঠিক বলছিস্?—ঠিক্ বলছিস? যোগেশ বলিল "ঠিক্ বলিতেছি।" রমণী হাত ছাড়িয়া দিল। আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল "সে মরিবে কেন? আলাই বালাই—সে মরিবে কেন?—ওই যাচ্চে এই যাচ্চে—ওই ডাকচে ওই ডাকচে—দাঁড়াও—দাঁড়াও—যাই যাই" এই বলিতে বলিতে এক ছুট। যোগেশ তাঁহার পিছনে পিছনে যাইল কিন্তু আর তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। যোগেশ রমণীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বিচলিত চিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া একেবারে আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। শৈলজা তখন কি এক খানি পুস্তক পড়িতে ছিল। জুতার শব্দ পাইয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল যোগেশ কাঁদিতেছে। শৈলজার একবার ইচ্ছা হইল যোগেশের চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করে কেন কাঁদিতেছে কিন্তু লজ্জায় সে তাহা পারিল না। গৃহ হইতে পালাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ যে উন্মাদিনী।

সকাল হইয়াছে। শৈলজা যোগেশের নিকট সকল কথা গত রাত্রে শুনিয়াছে। পিতা নিরুদ্দেশ মাতা পাগলিনী। শেষে শৈলজার ইচ্ছা মাকে একবার দেখিবে দেখিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া একবার কাঁদিবে। অভাগিনী বাল্য কালেই পিতৃ মাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইল। পিতার মুখ আর কখন দেখিতে পাইবে সে আশা তাহার আর নাই। এখন মা'কে একবার দেখিবে দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবে। কত দিন কত লোককে তাহার মা'কে একবার আনিতে বলিয়াছে কিন্তু কেহই আনিতে পারে নাই। যোগেশকেও বলিয়াছিল কিন্তু যোগেশ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াও বাড়ীতে আনিতে পারিলেন না। পাগলিনী পলাইয়া গেল। শৈলজা নির্জ্জনে যাহারি সাক্ষাৎ পায় তাহাকেই তাহার মা'র কথা জিজ্ঞাসা করে সকলেই ওখানে সেখানে দেখিয়াছে বলে। কেহ কেহ শৈলজার

দুঃখে দুঃখীত হইয়া যেখানে দেখিতে পাইয়াছিল সেখান হইতে ধরিয়া আনিবে মনে করিয়া গিয়াছে কিন্তু আর তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইত না, শৈলজার নিকট আর ফিরিয়া ও আসিত না। শৈলজা, মা আসিবে বলিয়া বসিয়া থাকিত ও শেষ হতাশ হইয়া ক্রন্দন করিত। ক্রন্দনই অভাগিনীর এখন একমাত্র সম্বল হইয়াছে।

শৈলজার ক্রন্দনের ও শেষ নাই ভাবনার ও শেষ নাই। একমনে গণ্ডদেশে হস্তস্থাপন করিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে ও মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। চক্ষু দুইটী আরক্ত বর্ণ হইয়াছে দেখিলেই বোধ হইবে অভাগিনীর চক্ষের জল একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে আর কাঁদিতে পারিতেছেনা বলিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। ক্রমে ননদিনী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, শৈলজার সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। মাথায় কাপড় নাই। চুল গুলি আলুলায়িতা, ননদিনী আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, শৈলজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বৌ! কাল তোর চুল গুলি অমন করিয়া বাঁধিয়া দিলাম আর আজ অমনি করিয়া এলো করিয়া বসিয়া আছিস্। আজ তো তোর নাইবার দিন নয়।" শৈলজার চমক ভাঙ্গিল। সসব্যস্তে মাথায় কাপড় দিল ও পরিশেষে ঘোমটা টানিল। ননদিনী বলিল "অত ভাবনাই বা কিসের বাপ ত কারুর নিরুদ্দেশ হয় না, মা'ত কারুর পাগল হয় না তোর বাবু সব বাড়াবাড়ি। আর অমনকরে একশবারি কাঁদিলে যে বাড়ীর অমঙ্গল হয়। তখন বাবাকে বলিয়াছিলাম ও লক্ষীছাড়ার বাড়ীর মেয়ে এনো না, বাবা ত তা শুন্‌লেন না। এখন আমার সঙ্গে নিচে আয়।" শৈলজা ননদিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে ননদিনী বলিল। 'তোর বাপের কাপড় জুতো চিনিস্'। শৈলজা ঘাড় নাড়িল।' ননদিনী বলিল তবে আয় এই বলিয়া নিচের মাঝের দরজায় গিয়া দুইজনে দাঁড়াইল। পিতাকে উদ্দেশ করিয়া চিৎকার করিয়া দরজার আড়াল হইতে যোগেশের ভগ্নী বলিল 'এই তোমার বৌ এসেছে' শৈলজা দরজার আড়াল হইতে দেখিল লালু ইনস্পেকটর ও দুইজন চৌকিদার। তন্মধ্যে একজন চৌকিদারের হাতে এক জোড়া জুতা ও একখানা কালাপেড়ে কাপড়। কাপড় ও জুতা দেখিয়া শৈলজা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। লালু বলিল এখন কাঁন্নাটান্না রাখ বাপু, যা জিজ্ঞাসা করি এখন তা'র উত্তর দাও' এই বলিয়া কাপড় ও জুতা জোড়ার দিকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'এই কাপড় ও জুতা কি তোমার পিতার ?' শৈলজা নিরুত্তর। লালু চিৎকার করিয়া বলিল চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না ? যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার উত্তর দাও।' যোগেশের পিতা তাঁহার বধূমাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন 'বল মা, বল মা, দরজার আড়াল হইতে বলিবে তাহার আর দোষ কি ?' শৈলজা তথাপি নিরুত্তর। শেষ তাহার ননদিনীকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'আমার পিতার।' যোগেশের ভগ্নী বলিল 'বৌ বলিতেছে উহার পিতারি। লালু পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিল 'বাড়ীথেকে তোমার পিতা যখন বেরিয়ে যান তখন তুমি জান ?' যোগেশের পিতা বলিল 'ও কি রূপ করিয়া জানিবে, উনি তখন এখানে।' লালু সক্রোধে বলিয়া উঠিল। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে না উহাকে বলিতে দাও।' যোগেশের পিতা আর কিছুই বড় বলিলেন না। শৈলজা লালুর চোক মুখ ঘুরান দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া এবার আপনিই বলিল 'আমি তখন এখানে।'

লালু। 'যাইবার পূর্ব্বে তোমায় কিছু বলিয়া ছিলেন ?'

শৈল। 'না।'

লালু। 'কোন কথা—কিছুই বলেন নাই।'

শৈল। 'না।'

লালু জুতা কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। যোগেশের ভগ্নী বলিল "মিন্‌সে সত্যি সত্যিই তবে মরেছে।" শৈলজা এই কথা শুনিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া চিৎকার করিরা কাঁদিতে লাগিল! যোগেশের 'মা' আসিয়া শৈলজাকে কত বুঝাইতে লাগিলেন যোগেশের পিতা 'মা' আমি রহিয়াছি তোমার কিসের ভাবনা, তিনি তোমাকে যেমন আদর করিতেন আমি তোমাকে সেইরূপ আদর করিব। আর কেঁদনা মা' বলিয়া শান্তনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শৈলজা তাহাতে আরো কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশিরা দুই একজন করিয়া জমিতে লাগিল। কেহ কেহ শৈলজার সহিত কাঁদিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল 'মানুষের কখন কি হয় তাহা বলা যায় না' কেহ কেহ বলিতে লাগিল' দিদি ও কথা বল কেন ? কাল রাম রাজা হবে, না বনে গেলেন' 'ওকথা কেন বোন কচ্চিস্‌ আর একজন বলিয়া উঠিল হরিশ্চন্দ্রের কি হল বল দেখি।' এইরূপ না না লোক না না কথা বলিতে লাগিল। বালিকার ক্রন্দন কেহ কিছুতেই থামাইতে পারিল না।

হঠাৎ বাড়ী নিস্তব্ধ হইল। কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে আসিতেছে 'সে মরে নি গো'—সে মরে নি' —কেন তাঁর অমঙ্গল কর।' রমণী একেবারে সেই জনতার ভিতর প্রবেশ করিল। ভিতরে যাইয়াই শৈলজাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া মুখচুম্বন করিল। বলিল মা কাঁদ্‌ছিস কেন ?—সে মরেনি মরেনি" এই বলিয়া তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে এক খানি ছবি বাহির করিল। অতি গম্ভীর স্বরে বলিল, 'মা একে নমস্কার কর। শৈলজা ছবির দিকে একদৃষ্টে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। দুইদিন পূর্ব্বরাত্রে এই চিত্র শৈলজা স্বপ্নে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। এই চিত্র একটী সন্ন্যাসীর—উলঙ্গ সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন; সেই রাত্রে শৈলজা এই সন্ন্যাসীর সহিত তাহার পিতাকে স্বপ্নে একত্রে তাহার নিকটে আসিতে দেখিয়াছিল। তাহাকে তাহার পিতাও সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিতে বলিয়াছিল। শৈলজা তাহা পারে নাই। ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আবার সেই মূর্ত্তিই। শৈলজা একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ

চাহিয়া পরিশেষে সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিল। প্রতিবেশিরা সকলে সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল ও বলিতে লাগিল 'ওমা! এ যে উলঙ্গ সন্ন্যাসী এ তুমি কোথায় পাইলে! —কেহ কেহ বলিতে লাগিল 'শৈলির মা! একবার আমার হাতে দাও ত ভাল করিয়া ছবিখানি দেখি। শৈলজার মা উত্তর করিল 'আমি দিব না—দিব না—তাকে তোরা কেড়ে নিয়েছিস আবার একেও কেড়ে নিবি' এই বলিয়া ছবিখানি সজোরে ধরিয়া 'সে মরেনি সে মরেনি' বলিতে বলিতে এক ছুট। পিছনে পিছনে দুই একজন প্রতিবেশিরা 'ও শৈলীর মা! শুনে যাও—একটা কথা শুনে যাও' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শৈলজার মা কোথায় চক্ষের নিমেষে পলাইয়াছে। একজন তাহার পিছনে পিছনে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'আর দেখিতে পাইলাম না'। শেষ সকলে আপন আপন বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার সময় বলিতে লাগিল 'এ ত ঘোর উন্মাদিনী।'

ক্রমশঃ।

ছবি।

(১)

নীরব আকাশ তলে বসিয়া রমণী,
বুক ভেঙ্গে আসে ক্রমে ফোটে নাক কথা
কি ব্যথা, কি আশা তার. শোনে না দেবতা
অশ্রুবিন্দু ঝোরে যায়, স্তবধ রজনী!
তিতিছে অলকাগুচ্ছ, তিতিছে ধরণী,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ফুটে গভীর বেদনা,
কি যেন রহিছে প্রাণে অব্যক্ত যাতনা,
বুঝাতে না পারে শুধু বিবশা রমণী!
ক্রমে তারা নিভিতেছে অলস সমীর,
ক্রমে শশী ডুবে যায় পশ্চিম গগনে,
বালিকা উন্মত্তা তবু চেয়ে শূন্য পানে;—
আশা-কণা নিভে গেল, হৃদয় অধীর!
কোথায় শীতল বায়ু, সিনিগ্ধ মরণ,
এস' তবে নিয়ে যাও এ ঘোর জীবন!

(২)

এত হাসি এত খুসি, কিসের কারণ?—
হাসিছে রমণী হের পতির কোলেতে।
এত কথা, এত ব্যথা কিসের যতন?—
শিখিছে রমণী আজি মোহিতে প্রেমেতে।
দেখ দেখ জীবনেতে অন্য কিছু নাই,
প্রেমে অন্ধ রমণী সে নিতান্ত বিভুল,
সদা শূন্য পানে চায়, নাহি পায় কূল,
স্বামীর প্রশস্ত বুক আঁকড়িছে তাই!
কোথা মা প্রকৃতি সতি, তুলে নে কোলেতে,
আজিকার মত আমি পরি সে রতন;
ফিরাইয়া নিও পুন, মনের মতন
যদি কভু নাহি হই, তোমারে মোহিতে!
দূরে রহে বাসনাটী, দূরে রহে ছবি,
উনমত্ত হয় শুধু উন্মাদ সে কবি!

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম।

"বিরোধ" "বিরোধ" এই এক কেমন ধুয়া উঠিয়াছে। আজ কাল'কার সাহিত্য-হাটে একদল বিক্রেতা দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা সকলতাতেই "বিরোধ" দেখেন এবং তাহাই প্রচার করেন। বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে বিরোধ, সাঙ্খ্য বেদান্তে বিরোধ—বিরোধ কিসে নয়? হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাদের মতে বিরোধময়। প্রমাণের অভাব নাই "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" আরে বাপু, "ভিন্ন" আর "বিরুদ্ধ" কথা দুটা কি এক? দুইটী বা দশটী বিভিন্ন উপায়ে একই কার্য্য সাধন হইতে পারে। কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী উপায়ে এক ফল কখনও পাওয়া যায় কি? তা একথা বলে কে? বাবুরা উন্মত্ত। "বিরোধ দেখাইতেই ব্যস্ত। বলিলেই বা শুনে কে? বিভার "জ্ঞান ভক্তির বিরোধ" এই "বিরোধ" ব্যাধি হইতেই উৎপন্ন। বাস্তবিক জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের মনে বড়ই ভ্রান্তি-সঙ্কুল ধারণা আছে। এতিনটী কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, পরস্পর বিভিন্নও নয়। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত এই মাত্র। বস্তুতঃ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম ঠিক একই পদার্থ, ইহাদের মধ্যে অবস্থাগত ও কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তিনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। জ্ঞান কাহাকে বলে? জানা—বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়। পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ উপলব্ধি। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বা সোঽহংভাব। যখন আমিত্বের আর পৃথক উপলব্ধি হইবেনা, এক বই অপর অস্তিত্বের বোধ একেবারে লোপ পাইবে, যখন প্রকৃত পক্ষে উপলব্ধি হইবে "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখনই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা। আর ভক্তি কি?—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ঈশ্বরে পরা অনুরক্তি। অনুরাগের পরাকাষ্ঠা, যাহার পর আর অনুরাগ নাই, হইতে পারে না। সে কিরূপ? না আমাকে আমি যেমন ভালবাসি। ভক্তবীর প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন "মনুষ্য যে তীব্র অনুরাগের সহিত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভগবান্ আমার যেন তোমাতে সর্ব্বদা সেইরূপ আসক্তি থাকে।" এ "পরানুরক্তি" আরও বড়। আমার প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, ইহাই ত অনুরাগের পরাকাষ্ঠা। নয় কি? তবে কি হইল? ঈশ্বরে আত্মবোধ বা সোঽহং ভাব। ভেদ ঘুচিয়া আমিত্বের পৃথক জ্ঞান ডুবিয়া গিয়া একই অস্তিত্বের উপলব্ধি। তখনও আর দুই নাই "একমেবাদ্বিতীয়ং।" "বিরোধ" চুলোয় যাক্, জ্ঞান ভক্তিতে কিছু বিভিন্নতা আছে কি? কর্ম্ম সম্বন্ধে ও ঠিক ঐ ভাব। কর্ত্তৃত্ববোধ বিসর্জ্জন দিয়া যে কর্ম্ম তাহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মের স্বরূপ। অর্থাৎ যে অবস্থায় সকল কর্ম্মের ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এস্থলেও জ্ঞানের বিষয়

সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং।" তবে আর বিভিন্নতা কোথায়? জ্ঞানভক্তি কর্ম্ম ঠিক একই পদার্থ কিছুমাত্র ভেদ নাই। শাস্ত্রে যে ঐ ঐ নামধারী তিনটী বিভিন্ন পন্থার উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত অবস্থা বা মোক্ষ-প্রাপ্তির তিনটী বিরুদ্ধ নহে, বিভিন্ন উপায় মাত্র। যে প্রণালীদ্বারা বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই জ্ঞানপন্থা। ভজনপূজনাদি যে সকল উপায়ে ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া চরমে দুই ঘুচিয়া এক হয়, তাহা ভক্তিপন্থা আর কর্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়া কর্ম্মাভ্যাস করার নাম কর্ম্মপন্থা। তিন পন্থাই একস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে। জ্ঞান ভক্তি ওকর্ম্ম সেই একই মিলনস্থানের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। জ্ঞান পন্থা ধরিয়া গেলে সে স্থানের নাম জ্ঞান। ভক্তি পন্থা ধরিয়া গেলে তাহার নাম ভক্তি। আবার কর্ম্মপন্থা ধরিয়া গেলে তাহারই নাম কর্ম্ম। ইহাই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রকৃত পরিচয়। এখন পন্থার সুগমত্ব দুর্গমত্ব লইয়া একটা কথা আছে। কেহ বলেন জ্ঞান পন্থা বড়ই দুর্গম, কর্ম্ম পন্থা ও তদ্রূপ, ভক্তি পন্থা অতি সুগম। এরূপ ধারণা নিতান্ত অজ্ঞানতামূলক। যাঁহারা ও কথা বলেন তাঁহারা বুঝেন না যে তিনের একটী পন্থা অবলম্বন করিলে অন্য দুইটী নিঃশেষে পরিহার করিতে হইবে। এখন কি ভক্তি পন্থা সুগম বোধ হয়? কর্ম্ম পরিহার কি আমাদের মত মানবের পক্ষে সম্ভব? তিন পন্থাই সমান। তাহার সাধারণ কোনরূপ দুর্গমত্ব সুগমত্ব নাই। যিনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, জ্ঞান পন্থা তাঁহার পক্ষে সুগম; ভক্তিপ্রবণের পক্ষে ভক্তি পন্থা সুগম এবং কর্ম্মশীলের পক্ষে কর্ম্মপন্থা সুগম। কিন্তু আমাদের মত মনিষের বোধ হয় তিনের বা ভক্তি কর্ম্ম দুয়ের মিশ্র পন্থা অধিকতর সুগম ও তাহাই অবলম্বনীয়। যাক্ সে কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারের ভ্রান্তত্ব সপ্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আয়াস সফল হইল বা বিফল হইল, সুধীগণ বিচার করিবেন।*

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
নং ৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

---

* "জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম" প্রবন্ধ লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে "বিভার জ্ঞান ভক্তির বিরোধ' এই 'বিরোধ' ব্যাধি হইতেই উৎপন্ন" বলিয়াছেন ও জ্ঞান ভক্তির বিরোধ প্রবন্ধ লেখককে 'সাহিত্য হাটের বিক্রেতার দলে ফেলিয়াছেন। এরূপ করিয়া তিনি ভাল করিয়াছেন কিনা দেখাইবার জন্য আমরা দুই একটা কথা বলিব। 'জ্ঞান ভক্তির বিরোধ' প্রবন্ধ লেখক 'তাঁহার প্রবন্ধের টীকায় লিখিয়াছেন" 'সম্প্রতি ধর্ম্ম তত্ত্বে' বঙ্কিম বাবু এ দুইয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিতেছেন। তাঁহার মতে দুইই প্রয়োজনীয়। জ্ঞান বিকাশ ভিন্ন ভক্তির বিকাশ ও ভক্তি বিকাশ ভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ—উভয়ই পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ পরিপন্থি সুতরাং মোক্ষের অন্তরায়। জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদিগণ উক্তগ্রন্থ পাঠ করিয়া পরস্পর মিলিত হইতে পারেন না কি?" ইহা পাঠ করিয়া উক্ত জ্ঞান ভক্তির বিরোধ প্রবন্ধ লেখককে ও বিভাকে অযথা গালি ও আক্রমণ করা হইয়াছে কি না? দ্বিতীয় কথা কোন প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিতে হইলে তাহার লেখককে আক্রমণ না করিয়া কি প্রতিবাদ বা সমালোচনা করা যায় না। ? এ অভ্যাস হইতে আমরা কত দিনে অব্যাহতি পাইব জানিনা। বিভার প্রবন্ধ লেখক দিগের নিকট সানুনয়ে ও করযোড়ে নিবেদন তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা যেন যথা বা অন্যথা প্রবন্ধ লেখককে আক্রমণ বা গালি না দেন।

প্রকাশক।

সমালোচনা।

বুদ্ধদেব চরিত *—পুস্তক খানি এডুইন আর্ণল্ড মহোদয় কৃত "লাইট অফ্ এসিয়া" হইতে গৃহীত। মূল পুস্তক অপেক্ষা বুদ্ধদেব চরিত আমাদিগের নিকট অধিক কবিতাময়ী, অধিক সুমিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

রূপ-সনাতন *—ভক্তমাল গ্রন্থের রূপ-সনাতন লইয়াই গিরিশ বাবুর রূপ-সনাতন। ভক্তমালের রূপ-সনাতন রূপ কথা—পড়িলে তাহার বড় একটা ধারণা হয় না। কিন্তু গিরিশ বাবুর রূপ-সনাতন পাঠ করিলে লোকটা কি, জিনিসটা কি, এমন কি তখনকার রূপ-সনাতন যেন এখনও জীবিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যে কবি এরূপ জাজ্জল্যমান ছবি আঁকিতে পারেন, সে কবি যে একজন উৎকৃষ্ট কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে পুস্তকে এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যে অতি আদরের সামগ্রী, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ইহার একটী বৃহৎ সমালোচনা আমরা শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি বলিয়া আর ইহার অধিক সমালোচনা করিলাম না, সময়ান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

বিল্বমঙ্গল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মূল্য ১৲ এক টাকা বিষয়টী এই—

"শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিহারী।
সাধু চূড়ামণি পরাকাষ্ঠা প্রেম ভারি॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল।
অলৌকিক রীতি, সুচরিত সুনির্ম্মল॥
কৃষ্ণ হস্ত ধরি যেই জোরাবরি কৈলা॥
পুনর্ব্বার শ্যামরূপ সাগর দেখিলা॥
তাঁর সুচরিত্র সাগরের এক কণা।
গাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা॥
দক্ষিণ দেশেতে কৃষ্ণ বেন্নানামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নামে বিপ্র।
লম্পট স্বভাব ধর্ম্ম অংশে অতি ক্ষিপ্র॥
নদী পারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী॥
এক দিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ মৃতাতিথি।
বেশ্যা কহে নদী পারে না আইসহ ইতি॥
সমস্ত দিবস গৃহে উদ্বিগ্ন মানস।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥
বৃষ্টি বরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিল নাহি মানে বজ্রাঘাত॥
নদী পার যাইতে নাহিক নৌকা ভেলা।
কামতরণীতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে॥
জ্ঞানহত কাষ্ঠ বুঝে মুর্দ্দার ধরিয়া।
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া॥
সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হৈয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদিকে ফিরে ধাইয়া॥
প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ রজ্জু জ্ঞান করি।
সেই সর্প ধরি উঠি প্রাচীর উপরি॥
ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া।
দেখে বিল্বমঙ্গল রহে অঙ্গনে পড়িয়া॥

* শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রণীত। মূল্য ১, এক টাকা, ষ্টার ডিপজিটরি কলিকাতা ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

পড়িয়া মূর্চ্ছিত দেহ উঠিতে না পারে।
ধরাধরি করিয়া আনিল সবে ঘরে ॥
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়।
যেরূপে আইল গিয়া প্রত্যক্ষ দেখায় ॥

স্নান আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে।
বিশেষ ভৎর্সনা করি বেশ্যা বহুকহে ॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তোর হেন দুষ্ট বুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি ॥
হেন তম মদ যাতে শব কাল সর্প।
না চিনিলে অধীন হইয়া কাম দর্প ॥
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোরে ক্রীড়া অনুচিত ॥
এ হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শত অংশ অংশের এক ভাগ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমায়।
তবে কিনা হইত চতুর্ব্বর্গ সেবে যায় ॥
চিন্তামণি বেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সখ্য ॥
প্রাণমন ক্লেশ আর ভৎর্সন বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে ॥
রাত্রি কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লইল অভিরাম ॥
এক ভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন।
করিয়া পাইল যত্ন শুদ্ধ প্রেম ধন ॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায় ॥
কৃষ্ণ দরশনে মনে উৎকণ্ঠা হইল।
হাহা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল ॥
বৃন্দাবন যাইবার হইল আশয়।
দিগ্বিদিগ নাহি জ্ঞান অনুরাগে ধায় ॥

কতেক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া।
সরোবর তীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া ॥
প্রেমাবেশে অন্ন না দুই চারি দিন।
বসিয়া রহিল তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন ॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র ॥

সরোবরে স্নান করে বহু নর নারী।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী ॥
দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল।
হেন যে সাধুর মন ঈষৎ টলিল ॥

আপন অন্তর রীতি বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিল কিছু শাস্তির কারণে ॥
স্নান করি সেই নারী যে দিকে চলিল।
সাধু তার পিছে পিছে গমন করিল ॥
বধূ নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা ॥
হেন কালে সেই বধূর স্বামী সুচরিত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইল চকিত ॥
বহুস্তব করি কহে কর যোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ, করি শিরে ধরি ॥

সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ ॥
বনিক চরিত্র কিছু আলৌকিক হয়।
বৈষ্ণবের পিরীতার্থে স্বীকার করয় ॥
অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিল রমণী নিজ সুবেশ করিয়া ॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপাদ মস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥
চক্ষু সম্বোধন করি কহিতে লাগিলা।
তত্ত্ব বিচারিয়া নিজ মন বুঝাইলা ॥
আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়া ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য আবিদ্যাপথে কি ধন লইয়াছ ॥
রক্তমাংস ক্লেদ বিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক আচ্ছাদন মাত্র দরশ সুবহ ॥
নির্লজ্জ তোমার মতি এ হেন কদর্য্যে।
লালসা করহ যাতে নিন্দিত অভুজ্যে ॥
ধিক ধিক অরে দুষ্ট অসৎ ইন্দ্রিয়।
ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অস্থয় ॥

এই ত ইহার তত্ত্ব জানিলা এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ।
এতেক বিচারী যুবতীর স্থানে কহে ॥
তীক্ষ্ণ দুই সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে ॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজ চক্ষে তারে বিন্ধিতে কহিলা ॥

পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিশ্বেশ।
বনিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে ॥
আজ্ঞা ক্রমে পুনঃ সেই সরোবর তীরে।
হস্ত ধরি লইয়া রাখিল ধীরে ধীরে ॥

কৃষ্ণ ভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত্ত।
যে হেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈল দৃঢ়ব্রত ॥
কৃষ্ণ দরশন রাগে চলিলা বৃন্দাবনে।
অনুরাগে চক্ষু যার কি করে নয়নে ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ গুণ মধুমিতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি ॥
মাতোয়াল প্রায় থরমর করি চলে।
বর্ণয় মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥
যে গীত অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত।
কৃষ্ণবর্ণামৃত নাম অদ্যাপিহ স্থিত ॥

বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্ম কুণ্ডের নিকটে।
বসি কৃষ্ণ প্রাপ্তি কথা ভজবার ঘাটে ॥
ভকত বৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া ॥
রৌদ্রে কেন বসি ভাব ভুকে কেন রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ ॥
তেঁহ কহে অন্ধ আমি দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে মুই যাই ॥
কৃষ্ণ কহে আমি গোপ শিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইল তব ঠাঁঞি॥
শ্রীঅঙ্গ সদ্গন্ধে আর সুমিষ্ট বচনে।
সাধু অনুভাবে অত জানি গেলা মনে ॥
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হিয়া গুরগুরি।
সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি ॥
কহে তবে হাত ধরি বৃক্ষছায়া লহ।
অন্ন যে আনিয়া আছ তাহা খাই দেহ ॥
কৃষ্ণ দূরে থাকিয়া বাম হস্ত বাড়াইয়া।
তর্জ্জনি ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া ॥

আহা মরি যেই ভঙ্গি মন্দ মন্দ হাসি।
ধিক ধিক কোটি চন্দ্র কোটী সুধারাশি ॥
ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হেথা আইসহ হস্ত নাহি পাই আমি ॥
পুনঃ কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গি করি।
সাপটীয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি ॥

সুদরিদ্র যেন স্পর্শমণি পথে পায়।
মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ যায় ॥
বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত পাইয়া সুধারাশি।
যেমত আনন্দ পায় তেমতি সরসি ॥

কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই।
কি কারণে ধর মোরে কহ ওরে ভাই ॥
তেঁই কহে হেন হস্ত ছাড়িতে না পারি।
ধরিয়া রাখিব আজি হৃদয় মাঝারি ॥
বহু দুঃখে অনেক সাবধানে হেন ধন।
পাইয়াছি যদি ছাড়ি দিব কি কারণ ॥
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখন।
তুমিত কেমন প্রভু না দেখি এমন ॥
নিজ হানি নাহি, পর দুঃখ বিমোচন।
দরশন দিয়া মাত্র তাহে না কারণ ॥

তথাপি শ্রীকৃষ্ণ করে হাত টানাটানি।
চোরা যেন নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিল।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিল ॥
বেদনা লাগয়ে বলি সাধু চমকিলা।
যে হেতুক হস্তশ্লথ পাই পলাইলা ॥
ফাফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছাড়ি খেলা ॥
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবে ত জানিয়েমুঞি পৌরুষ তোমাতে ॥
তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুনঃ কহে প্রিয়ভক্তে।
ছায়াতে আইসহ এই মোর সাথে সাথে ॥

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়,
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে।
চুম্বক মণির সাথে, লৌহ স্বাভাবিক রীতে,
ধাইয়া চলিল তেন মতে ॥
বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা,
তেঁহ কহে কভু না খাইব।
যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার,
তবে যাহা কহ তা করিব ॥
কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কিবা হবে,
গোপ শিশু কভু দেখ নাই।
সাধু কহে কিবা কহ, না দেখিয়া প্রলাপহ,
গোপ সনে কার্য্য সে সদাই ॥

ছাড়িয়া নিকটে যায়, পুন কৃষ্ণ পিছে ধায়,
আনন্দ কৌতুক ভক্ত সনে।
নানান কৌতুক রসে, খেলে সে পরমোল্লাসে,
সাধু হৃদে হয় বিদারণে॥

সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধী,
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি।
আন্ধার ঘরেতে যেন, কাল সর্প হয় তেন,
উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি॥

কহে অহে কৃষ্ণধৃষ্ট, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শ্রেষ্ঠ,
দয়া নাহি তিল আধ তোমা॥
দরশন মাত্রে যদি, রক্ষা পায় হত নিধি,
গত প্রাণ দেহে হয় সমা।
তাহে তব কিবা ক্ষতি, কিবা লাগে কিবা ব্যতি,
কিবা হাস চাঞ্চল্য প্রকাশ॥

পুনঃ কহে অহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
উপায় কি তাহা মোরে ভাষ।
মোর নিন্দা বাক্য শুনি, রুষ্ট হৈল হেন মুনি,
তবে এই স্তুতি করি শুন॥
এত কহি স্তব পুন কুরয়ে উন্মত্ত যেন,
প্রলাপে যে ধায় উঠি ঘন॥
কৃষ্ণচন্দ্র মৃদুহাসি, শশীর আনন্দ রাশি,
কৌতুক করিয়া পুনঃ কহে।
কাল রূপ কি দেখিবে, তাহে কিবা সুখ পাবে,
বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে, কি দিয়া ভুলাবে মোহে,
কি ধন তোমার আর আছে।

মুক্তি ভক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ীদ্বয়,
পদ সেবি ফিরে পাছে পাছে॥
হেন ভক্তি ঠাকুরাণী, প্রেম ধন রত্নমণি,
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া।
মো হৃদয় সিংহাসনে, বৈস চেড়ীগণ সনে,
অতএব ভুলাবে কি দিয়া॥

যদি মোরে কৃপা কর, এই বর দান কর,
মোর দুটি চক্ষু দান দিয়া।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হৈয়া, মুরালী বদনে দিয়া,
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখা দিয়া॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় পদাম্বুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।

অপ্রাকৃত দেহ সহ, দিব্য চক্ষু হৈল তেঁহ,
কৃষ্ণরূপ পানের পিয়ালা॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হেরি অচেতনে পড়ে ভূমে।

পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্ট অনুভব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে॥
এইরূপ দরশনে, নানা গুণ বর্ণনে,
পরম আনন্দে দিন যায়।
কৃষ্ণ নিজ ভুজ শেষে, দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে,
দোনা করি নিত্য নিয়োগায়॥
দৈব যোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যানামা,
কৃষ্ণ কৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণ প্রেমাবেগ ভরে,
আসি মিলে বৃন্দাবন পুরী॥

সুবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল আগে,
আসিয়া মিলিল চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, রত্নদর্শী গুরু ভাবে,
প্রণমহে বহু ভক্তি রীতে॥
কৃষ্ণদত্ত অন্ন দোনা, মিষ্টান্ন পক্কান্ন নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঞি,
না আইল, আইল অর্থ হেরি॥
কৃষ্ণ কৃপা তোমাপরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগৎ শুধিতে পার হেলে।
শরণ লইল মুঞি, আর কিছু নাহি চাই,
কৃষ্ণ মোরে দেখাহ বিরলে॥
এত কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেম মধু,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া॥
আশ্বাসয় বহুবেরি; কৃষ্ণ কৃপা তোমাপরি,
অবশ্য দিবেন দরশন।

এত কহি কৃষ্ণ স্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিল দৃঢ় পণ॥
চিন্তামণি অধিকারী; ভক্তি অনুরোধে ভারি
দুই তবে দিল দরশন।" (১)

ভক্তমাল গ্রন্থ।

(১) ইহা লইয়া বিল্বমঙ্গল রচিত। বিল্বমঙ্গল অভিনয় করিয়া ষ্টার থিয়েটার যতদূর

অর্থোপার্জ্জন করিয়াছে এমন আর কোন পুস্তকে করিয়াছে কিনা সন্দেহ সুতরাং ইহা যে বঙ্গ সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বিল্বমঙ্গল উপদেশপূর্ণ, হিন্দুর আদরের সামগ্রী। অনেকেই ইহা হইতে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

"পূর্ণচন্দ্র"—শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত; মূল্য আট আনা মাত্র; ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ষ্টার ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় দুচারি খানি নাটক ভিন্ন অন্য গুলিকে নাটক বলিতে পারা যায় না। সেই দুই চারি খানি নাটকের ভিতর পূর্ণচন্দ্র একখানি। আবার ইহার মূল্য সকল নাটক অপেক্ষা ন্যূন।

Select English Poems Part I & II. শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত। পুস্তক দুইখানি বালকদিগের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী হইয়াছে। ইঙ্গরাজী ভাষায় যত কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা আছে ইহাতে প্রায় সমস্তই দেখিলাম। কাগজ ছাপা সুন্দর—মূল্য অল্প। এরূপ অল্প মূল্যে এত সুন্দর পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের ধারণা ছিল না। বিদ্যালয় সমূহের ইন্স্পেক্টর মহাশয়দিগের সহিত সম্পর্ক বা আত্মীয়তা থাকিলে পুস্তক খানির কাটতি হইবারই সম্ভাবনা; নতুবা পোকায় কাটতি হইবে এরূপ আমাদিগের বিশ্বাস কারণ আজি কালি সচরাচর গিল্টিরই আদর অধিক, জলুস্ বেশী, সাঁচ্চার আদর কোথায়?

সরল আদর্শ ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস দে প্রণীত। ছোট ছোট বালকদের ব্যাকরণ যেরূপ, এখানি ও প্রায় সেইরূপ, তবে স্থানে স্থানে সংস্কৃত ব্যাকরণের পথ অনুসরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাকরণ গুলি যদি বিদ্যালয়ের পঠোপোযোগী হয়, তাহা হইলে এখানিও পাঠোপযোগী হইতে পারে। বড় দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত এক খানি ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখিলাম না। Model Geographyf ৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ বৃটানিয়া প্রেসে ও ষ্টার ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়, মূল্য দুই আনা। শিশুমতি বালক দিগের এ পুস্তক খানি মানচিত্র দর্শনের বিশেষ সহায়তা করিবে আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ষ্টার ডিপজিটারি, ৩০ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। পুস্তকের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেনঃ—"আদর্শ মনুষ্য' কথাটার অর্থ কি? পূর্ব্ব পক্ষ কর্ত্তার মতে

"যাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই আদর্শ মনুষ্য"

যদি পাঠকগণ এতদ্বারাও পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে সংক্ষেপে বলিতেছি, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্, উন্নতমনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক তিনিই মনুষ্য মধ্যে আদর্শ সন্দেহ নাই। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ ছিলেন কি না? পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা বলেন এবং আমরাও বলি—"ছিলেন"; তবে আমাদের আদর্শ এবং পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তার আদর্শ মূলে স্বতন্ত্র এবং নমুনায়ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তার আদর্শ মনুষ্য একজন প্রবীণ যোদ্ধা, প্রথম শ্রেণীর নীতিজ্ঞও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক হইলেই হইল কিন্তু আমাদের আদর্শ—ঐ দরের হইলে চলিবে না, তাঁহাতে ধর্ম্মের—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য অক্রোধ—এই দশবিধ গুণের এরূপ পূর্ণবিকাশ থাকা চাই যে, যদ্দারা ঐ চরিত্র যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাগণ অপেক্ষাও উচ্চ স্থান অধিকার

করিতে পারে। (২) তাঁহাতে এত বীর্য্য থাকা আবশ্যক যে, তিনি জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাম্ব, ভীষ্ম, ভীমেরও ভয়ের কারণ হন। (৩) তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য এইরূপ থাকা আবশ্যক যে ঐ যোগ বিভূতি, কপিল, নারদ, ব্যাস, শুক, জনক প্রভৃতি পরম যোগিগণের যোগৈশ্বর্য্য অতিক্রম করিতে পারে। তাঁহার সৌন্দর্য্য এত থাকা চাই, যেন সকলেই ঐরূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন। (৫) তাঁহার এরূপ বৈরাগ্য থাকিবে যে, পরম বৈরাগ্যবান্ শুকদেব, নারদ ও তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। (৬) তাঁহার জ্ঞান এরূপ থাকা প্রয়োজন যে, পরম জ্ঞানী ব্যাসাদি মহর্ষিগণও যেন তৎসদৃশ না হন। ঈদৃশ গুণ থাকিলে কোন পুরুষ সমগ্র হিন্দুর আদর্শ হইতে পারেন; অন্য কথায় তাঁহাকে ঈশ্বর হওয়া চাই। ঈশ্বর না হইলে কাহারও শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তি সকল পূর্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

আমরা ইহার মূলে কিছুই বিভিন্নতা দেখিতে পাইলাম না। তিনি যাহা এক ছত্রে এক কথায় বলিয়াছেন, শরৎ বাবু বিশ ছত্রে অনেক কথায় তাহাই বলিয়াছেন। পূর্ব্ব লেখক পাকা শরৎ বাবু কিছু কাঁচা। যাহাই হউক পুস্তক খানি যে বহু পরিশ্রমে রচিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সহিত আমাদিগের মত ভেদ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। শরৎ বাবু কোন কবিতা পুস্তক, নভেল বা নাটক লিখিতে উদ্যম না করিয়া এরূপ পুস্তক লইয়া আসরে নামিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি ও এ উদ্যমকে আমরা সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

Introductory Lecture by R. G. Kar L. R. C. P. &c.—কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের কার্য্য আরম্ভ উপলক্ষে ১৮৮৮ অব্দের ৯ই জুন তারিখে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর এল, আর সি, পি, কর্তৃক পঠিত। কলিকাতা মেডিকেল স্কুল নাম শুনিয়াই আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্বেল হস্পিটেল চিকিৎসা বিদ্যা এক চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, দুইটী বিদ্যালয়ই গবর্ণমেন্টের। সাধারণ শিক্ষা বিভাগ গবর্ণমেন্টের হস্ত হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। নাবালক, সাবালক হইলে যেরূপ তাহার বিষয়, তত্ত্বাবধারকের নিকট হইতে বুঝিয়া লয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সেইরূপ বুঝিয়া লইয়াছেন। একদিন (সার রিভার্স টমসন) ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালার গবর্ণর মহোদয়কেও বলিতে হইয়াছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত এত বড়, এত ছাত্র পূর্ণ ইউরোপের কোন বিদ্যালয় নাই।

চিকিৎসা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল দেখিলাম। কুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, হাইকোর্টের সুবিখ্যাত প্লিডার শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই বিদ্যালয়ের সাহার্য্যার্থে অগ্রসর হইয়াছেন। উক্ত মহোদয়গণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে উক্ত বিভাগ বুঝিয়া লইলে কিযে আনন্দের বিষয় হয় তাহা বলিতে পারি না। বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই বলি "ক্রমে ফুল কলি হাসে, ক্রমে ফুলে মধু আসে শশধর পূর্ণকায় কলায় কলায়" জগদীশ্বরের নিকট আমাদিগের কায়মনবাক্যে প্রার্থনা শশধরের ন্যায় যেন এ বিদ্যালয়েরও কলায় কলায় পূর্ণকায় দেখি।

ডাক্তার কর মহাশয়ের বক্তৃতাটী আমাদিগের নিকট এত সুন্দর বোধ হইয়াছিল যে বিভায় স্থান থাকিলে তাঁহার বক্তৃতাটী সমস্তই উদ্ধৃত করিয়া দিতাম।

বিভা।

[২য় খণ্ড   সন ১২৯৫ সাল   ৩।৪র্থ সংখ্যা]

বায়ু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ওঝোন। (Ozone) ইহা অম্লজানের একটী ভিন্ন আকার ব্যতীত আর কিছু নহে, ইহা ঘনীভূত অম্লজান। তিন ভাগ অম্লজান ঘনীভূত হইয়া দুই ভাগ ওঝোন উৎপন্ন হয়। ওঝোনের প্রদাহ শক্তি অম্লজান অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। এই বাষ্প অম্লজান অপেক্ষা দেড় গুণ ভারি। অমিশ্রিত অবস্থায় ইহা জীবজগতের ধ্বংস সাধন করে।

উৎপত্তি বিবরণ ;—

১। যখন বায়ুরাশি অথবা জলীয় বাষ্প মিশ্রিত অম্লজান মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখনআমরা একটী উগ্র গন্ধ ঘ্রাণ করিয়াথাকি ; ওঝোন এই গন্ধের উৎপত্তি কারণ, বায়ু মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলে ওঝোন উৎপন্ন হয়।

২। জলীয় বায়ু পূর্ণ একটী বোতলের মধ্যে এক খণ্ড ফসফরাস ঝুলাইয়া রাখিলে রাসায়নিক সংযোগে ওঝোন উৎপন্ন হয়।

৩। বৈদ্যুতিক ক্রিয়া দ্বারা জলের বিশ্লেষণ (Electrolytic decomposition of water) উপস্থিত হইলে অল্প পরিমাণে ওঝোন উৎপন্ন হয়।

৪। পোটাসিয়ম পারমাঙ্গানেট নামক (Potassium permanganate) নামক পদার্থের সহিত গন্ধক দ্রাবকের (Sulphuric acid) রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ওঝোন উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ওঝোন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তত্ত্ব গুলি আবিষ্কার করিয়াছেন ;—

১। দিবামান অপেক্ষা রাত্রিমানের বায়ুতে ওঝোন অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান

থাকে; প্রাতঃকালের বায়ুতে ওঝোনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

২। গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা শীতকালের বায়ুতে ওঝোনের পরিমাণ অধিক থাকে; বজ্রাঘাত হেতু বায়ু রাশি মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইলেও শরতকালে বায়ুতে ওঝোনের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা কম।

৩। উচ্চ স্থানের বায়ুতে ওঝোনের পরিমাণ অধিক থাকে।

৪। সমুদ্রতীরস্থ বায়ুতে (বিশেষ যখন সমুদ্র হইতে তীরাভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়) অভ্যন্তর প্রদেশ অপেক্ষা ওঝোনের পরিমাণ অধিক।

৫। নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের বায়ুতে ওঝোনের ভাগ অধিক।

৬। বজ্রাঘাতের পর বায়ু মধ্যে ওঝোনের ভাগ বেশী হয়; কুজ্ঝটিকাবৃত আকাশে ওঝোনের পরিমাণ খুব কম।

৭। ইংলণ্ডে পশ্চিম প্রবাহী বায়ু রাশিতে পূর্ব্বপ্রবাহী বায়ু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ওঝোন থাকে।

৮। বায়ুতে $\frac{১}{১০০,০০০}$ ভাগের অপেক্ষা অধিক ওঝোন কখনই থাকে না।

৯। বাসগৃহ স্থিত বায়ুতে অনেক সময়ে ওঝোনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

সানিটাস্ (Sanitas) নামক যে এক দুর্গন্ধ নিবারক পদার্থ আছে, তাহাতে পার্‌অক্সাইড অব্ হাইড্রোজেন (Peroxide of Hydrogen) প্রধান কার্য্যকারী পদার্থ; ওঝোন উক্ত পদার্থের সহিত সানিটাসে বর্ত্তমান থাকিয়া দুর্গন্ধ নিবারণে সাহায্য করে। যবক্ষার জান হইতে উৎপন্ন নাইট্রাস্ অক্সাইড্ নামক বাষ্পের সহিত ওঝোনকে একত্র অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ওঝোনকে শ্বাস রূপে গ্রহণ করিলে শ্বাস পথের উগ্র প্রদাহ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে বায়ুতে অধিক পরিমাণে ওঝোন বর্ত্তমান থাকিলে ইন্‌ফ্লুয়েন্জা (Influenza) নামক শ্বাস পথের রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে ওঝোন উগ্র অম্লজানিক দাহন ক্রিয়া দ্বারা ম্যালেরিয়া-জ্বরোৎপন্নকারী বিষ নষ্ট করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যখন বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, বায়ুতে ওঝোনের ভাগ অতি অল্প থাকে; ইহাও দেখা-গিয়াছে যে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব কালে একটী দ্বিতল বাটীর উপরের ঘরে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা বিসূচিকায় আক্রান্ত হন নাই, কিন্তু নিম্নতলস্থ গৃহে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা কেহই উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। উপরের গৃহের বায়ুতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ওঝোন বর্ত্তমান থাকাতে বিসূচিকা বিষের প্রতিযোগিতা সাধন করিয়াছিল, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

ওঝোনের নিরূপণ (Test)। একটু আরারুট অল্প পরিমাণ জলের সহিত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লও এবং উহার সহিত একটু আইওডাইড অব পোটাসিয়ম্ (Iodide of Potassium) মিশ্রিত কর। একখণ্ড কাগজ এই দ্রবে (Solution) ভিজাইয়া ওঝোন বাষ্পের মধ্যে ধারণ কর; ওঝোন বাষ্প এই কাগজের উপর লাগিলে

কাগজ খানি নীলবর্ণ হইয়া যাইবে। ওঝোন আইওডাইড অব পটাস্‌কে বিশ্লিষ্ট করিয়া আইওডিন্ উৎপন্ন করে এবং আরারুট মধ্য স্থিত শ্বেতসারের (starch) সহিত আইও ডিনের রাসায়নিক সংযোগ হইয়া নীল্‌বর্ণ আইও ডাইডঅব্ ষ্টার্চ (Iodide of Starch) উৎপন্ন হয়। ওঝোনের এ নিরূপণটী ভ্রম-শূন্য নহে; ক্লোরিন (chlorine) এবং নাই-ট্রাস্ অক্সাইড(nitrous oxide)নামক অপর দুইটী বাষ্পের সহযোগে ও এই রূপ রাসা-য়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়।

২। এক খণ্ড অল্প লাল লিট্‌মস্ (Litmus) কাগজ আইওডাইড্ অব্ পোটাসিয়মের দ্রবে (Solution of Iodide of Potassium) ডুবাইয়া ওঝোন বাষ্পের মধ্যে ধারণ করিলে এই কাগজ খণ্ড নীলবর্ণ হইয়া যাইবে। এই নিরূপণটী প্রথমটীর অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও একেবারে ভ্রমশূন্য নহে, কেননা এমোনিয়া(Ammonia)বাষ্প ও এই রূপ রাসায়নিক প্রতি ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এই ভ্রম দূর করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে যদি ওঝোন না হইয়া আমোনিয়া বাষ্প হয় তাহা হইলে লিট্‌মস্ কাগজ খানি আইও ডাইড অব্ পোটাসিয়মের দ্রবে না ডুবাইলেও শুদ্ধ আমোনিয়া বাষ্প সহযোগে নীলবর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু শুদ্ধ ওঝোন এইরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনা।

রসায়নতত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত এই যে ওঝোনের ভ্রমশূন্য নিরূপণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

যবক্ষর জান(Nitrogen)। বায়ু রাশির পাঁচ ভাগের মধ্যে চারি ভাগ যবক্ষার জান। ইহা স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বিহীন; উদ্ভিদ ও জীবগণের দেহে এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থে ইহা বর্ত্তমান আছে। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে লঘু; ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৭২। অম্লজানের যেরূপ ক্লোরিন ব্যতীত অন্য সমুদয় ভৌতিক পদার্থের সহিত রাসায়-নিক সংযোগ হয়, যবক্ষার জানের সেরূপ হয় না; বোরণ(Boron)এবং টিটানিয়ম্ (Titanium) ব্যতীত অন্য কোন ভৌতিক পদার্থের সহিত যবক্ষারজান সম্মিলিত হয় না। ইহা একটী নিষ্ক্রিয় (Inert) পদার্থ অর্থাৎ এই বাষ্প দাহ কার্য্য বা জীবন ধারণের সাহয্য করে না এবং ইহা স্বতঃ দাহ্য ও নহে। কিন্তু যবক্ষারজান জীবন রক্ষক নয় বলিয়া জীবন নাশক ও নহে; কোন জীবকে এই বাষ্পের মধ্যে নিমগ্ন করিলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহার কারণ অম্লজানের অভাব মাত্র। যবক্ষার জান ও উদ্‌জান এই দুই বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে এমোনিয়া বাষ্প উৎপন্ন হয়। যবক্ষার জান, উদ্‌জান ও অম্লজান মিলিত হইয়া যবক্ষার দ্রাবক (Nitric Acid) উৎপন্ন হয়।

অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic Acid gas)। কয়লা কিম্বা কাঠ পোড়াইলে এই বাষ্প প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই জন্য ইহার নাম অঙ্গারক বাষ্প। স্বাভা-বিক অবস্থায় দশ হাজার ভাগ বায়ুতে এই বাষ্প চারি ভাগ থাকে। ইহা জীবন ধার-ণের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট প্রদ, কারণ বায়ুতে

এই বাষ্প অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে শ্বাস প্রশ্বাস সময়ে ফুসফুস যথা প্রয়োজনীয় অম্লজান গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং বায়ু সংযোগে ফুসফুসে আগত রক্তের আবশ্যকীয় শোধন হয় না। ইহা বর্ণ ও গন্ধহীন; ইহা সহজেই জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং মিশ্রিত জলের স্বাদ এবং রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঈষৎ অম্ল হয়। ইহা বায়ু অপেক্ষা ১.৫২ গুণ ভারি। ইহা দাহ কার্য্যের বা জীবন ধারণের সাহায্য করে না। স্বভাবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা অঙ্গারক বাষ্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে :—

১। জীবগণের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া; নিশ্বাস গ্রহণ কালীন আমরা অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া থাকি; উক্ত অম্লজান ফুসফুসে আগত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র চালিত হয় এবং শরীরাভ্যন্তরে অম্লজানিক দাহন ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন করে। আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়।

২। জীবগণের দেহ হইতে ঘর্ম্ম প্রভৃতি অন্য পদার্থের সহিত অঙ্গারক বাষ্প নির্গত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই বাষ্প প্রশ্বাসের সহিত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়; অবশিষ্টাংশ ঘর্ম্মের সহিত বাহির হইয়া যায়।

৩। দাহ ক্রিয়া (Combustion)। অঙ্গার ঘটিত পদার্থের সহিত অম্লজানের মিলন হইলে স্বভাবে দাহ ক্রিয়া উপস্থিত হয়। সকল দাহ ক্রিয়াতেই অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়।

৪। পচন ক্রিয়া (Decomposition) স্বভাবে পচন ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫। গাঁজন ক্রিয়া (Fermentation) স্বভাবে গাঁজন ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে শস্য ভিজা অবস্থায় কোন রুদ্ধ স্থানে থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই গাঁজিয়া উঠে, এবং এত অধিক অঙ্গারক বাষ্প নির্গত হয়, যে; কেহ সেই রুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। উষ্ণ প্রধান দেশে জাহাজের খোলের মধ্যে ও পুরাতন কুপের মধ্যে (কুপের মধ্যে অনেক পচা গাছ ও প্রাণি থাকিলে এইরূপ হইয়া থাকে) এই ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য এরূপ স্থলে প্রথমে একটী আলোক নামাইয়া দেওয়া উচিত; যদি আলো নিবিয়া যায় তাহা হইলে জানা যায়যে সেই স্থানের বায়ুতে অম্লজানের পরিমাণ অল্প আছে সুতরাং সে স্থানে যাইলে প্রাণনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। জাহাজের তলদেশে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালনের পথ রাখিলে এই বাষ্পদূরীকৃত হইয়া যায় এবং উক্ত স্থান মনুষ্যগমোনোপযোগী হইয়া থাকে।

যে গৃহে অধিক লোক বাস করে যে স্থানে অনেক মনুষ্যের সমাগম হয়, যেমন বিদ্যালয়, নাট্যশালা, উপাসনা স্থল ইত্যাদি, সেই সকল স্থানের বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। কারখানাতে কয়লা, কাষ্ঠ, প্রভৃতি অঙ্গার ঘটিত পদার্থ সর্ব্বদা দগ্ধ হইয়া থাকে,

এই সকল পদার্থ দগ্ধ হইলে অধিকাংশ ভাগ অঙ্গারক বাষ্পে পরিণত হয়, এইজন্য কারখানা প্রভৃতি স্থানের বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। সকলেই জানেন যে আমরা সোডাওয়াটার, লেমনেড প্রভৃতি যে সকল স্নিগ্ধকারী পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকি, উহা প্রস্তুত করিবার জন্য বিস্তর অঙ্গারক বাষ্পের প্রয়োজন হয়; বাস্তবিক উহাদের যাহা কিছু গুণ তাহা কেবল এই বাষ্প মিশ্রিত থাকে বলিয়া। লেমনেড প্রস্তুত করিতে হইলে গুঁড়া সোডা (Bicarbonate of soda) এবং লেবুর আরক অল্প পরিমাণে জলে মিশ্রিত করিয়া বোতলে পোরা হয় এবং সেই বোতলের মধ্যে গুরু চাপ দ্বারা অঙ্গারক বাষ্প প্রবিষ্ট করাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। অঙ্গারক বাষ্প প্রস্তুত হয় বলিয়া সোডাওয়াটারের কারখানাতে এই বাষ্প এত অধিক পরিমাণে অবস্থিত থাকে যে উক্ত স্থানের বায়ু নিশ্বাস গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া সহসা বোধ হইতে পারে, এমন কি বাস গৃহের বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্প সেই পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে নিশ্বাস গ্রহণে প্রাণ বিয়োগ হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সোডাওয়াটারের কারখানার বায়ুতে এত অধিক পরিমাণে অঙ্গারক বাষ্প বর্ত্তমান থাকিলে কিরূপে কারখানার কর্ম্মচারী গণের স্বাস্থ্যের হানি হয় না? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হইবার দুইটী প্রধান কারণ এই—

১ম—সোডাওয়াটারের কারখানার বায়ুতে যে অঙ্গারক বাষ্প রহিয়াছে তাহা অম্লজানের বিনিময়ে নহে;—বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে যে পরিমাণে অম্লজান রহিয়াছে কারখানার বায়ুতে ও সেই পরিমাণে আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অম্লজানই জীবন ধারক-বায়ু এবং অঙ্গারক বাষ্প সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষাক্ত নহে। বাস গৃহ অথবা অন্য বহুজনপূর্ণ স্থানে বায়ু স্থিত অম্লজান নিশ্বাসে গৃহীত হয় এবং উহার পরিবর্ত্তে অঙ্গারক বাষ্প বায়ুতে প্রদত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং ক্রমেই অম্লজানের ভাগ কমিয়া যায় এবং অঙ্গারক বাষ্প তাহার স্থান পূরণ করে; এই জন্যই এই সকল স্থান বাসের অনুপোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু সোডাওয়াটারের কারখানার বায়ুতে অম্লজানের অংশ যেমন তেমনই সমপরিমাণে থাকে। সুতরাং কেবল অঙ্গারক বাষ্প বায়ুতে অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় না।

২। বাস গৃহের বায়ুতে শুদ্ধ অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া উহা অনিষ্টকর নহে। জীবগণের প্রশ্বাসের সহিত এবং ত্বক্ দ্বারা অঙ্গারক বাষ্পের সহিত ক্রমাগত জীব জগতের সূক্ষ্মাংশ পুঞ্জ (Organic matter) বায়ু মধ্যে নির্গত হইতেছে; নিশ্বাসে ইহা বায়ুর সহিত গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং ইহাদিগের পরিমাণ বায়ু মধ্যে অধিক হইলে জীবের জীবন সংশয় হয়। অঙ্গারক বাষ্প অল্প পরিমাণে থাকিলে ও বায়ু মধ্যে যদি এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে বায়ুকে বিষাক্ত বলা যায় এবং উহা শ্বাস গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সোডাওয়া-

টারের কারখানার বায়ুতে প্রতি সহস্র ভাগে দুই ভাগ অঙ্গারক বাষ্প থাকে, কিন্তু জীবজগতের সূক্ষ্মাংশ পুঞ্জ বর্ত্তমান না থাকাতে উক্ত বায়ু কর্ম্মচারী দিগের স্বাস্থ্যের বা জীবনের অনিষ্ট সাধন করে না। এমন কি যে বায়ুতে প্রতি সহস্র ভাগে ৩০ ভাগ বিশুদ্ধ অঙ্গারক বাষ্প আছে কিন্তু অনিষ্টকর সুক্ষ্ম পদার্থ নাই, সে বায়ু মধ্যে কোন প্রাণিকে রাখিয়া দিলে তাহার জীবন নষ্ট হয় না; প্রতি সহস্র ভাগ বায়ুতে পঞ্চাশ হইতে এক শত ভাগ অঙ্গারক বাষ্প থাকিলে উহা জীবনের অনিষ্টকর হয়। বহুজন-সমাকীর্ণ স্থানের বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেই এই সকল অনিষ্টকর সূক্ষ্ম পদার্থের পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া যায় এবং উক্ত বায়ু শ্বাস গ্রহণের উপযোগী কিনা সহজেই স্থিরীকৃত হয়।

বায়ু মধ্যে কি পরিমাণে অঙ্গারক বাষ্প থাকিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় না? যে বায়ুতে এক কিম্বা বহুলোক প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহা শ্বাসরূপে গ্রহণ করে, উহাতে অঙ্গারক বাষ্পের পরিমাণ প্রতি ১০০০০ ভাগে ৪।৫ ভাগ হওয়া উচিত; প্রতি দিবস একজন পরিশ্রমী যুবাপুরুষের ফুস্‌ফুস্ হইতে ১২ হইতে ১৬ ঘন ফিট অঙ্গারক বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। অর্দ্ধসের তৈল পোড়াইলে ১০ ঘন ফিট অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রতি সহস্র ভাগ বায়ুতে ১.৫ হইতে ৩ ভাগ অঙ্গারক বাষ্প থাকিলে শিরপীড়া উপস্থিত হয়। নিরূপণঃ—

অঙ্গারক বাষ্পের নিরূপণ সহজ। একটা কাঁচের গেলাসে পরিষ্কার চুনের জল রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে চুনের জলের উপর একখণ্ড পাতলা সরের ন্যায় পদার্থ জমিয়াছে এবং জল সাদা হইয়া গিয়াছে। এই নূতন শ্বেত পদার্থ চাখড়ি; বায়ুস্থিত অঙ্গারক বাষ্পের সহিত চুনের জলের রাসায়নিক সংযোগ উপস্থিত হইয়া চাখড়ি উৎপন্ন হয় এবং চাখড়ি জলে দ্রবনীয় নহে বলিয়াই চুনের জলের উপর সর পড়িয়া থাকে এবং জল ঘোলা হইয়া যায়। যদি একটী নলের মধ্য দিয়া এই গেলাশের চুনের জলে ভিতর ফুঁ দেওয়া যায় তাহা হইলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই জল দুধের মত শাদা হইয়া উঠে; ইহার কারণ এই যে আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত অঙ্গারক বাষ্প প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

"আদর্শ ইতিহাস" ও "মহাকাব্য"।

বিষয় অতীব গুরুতর। আমাদের মত লোকের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা জানি, কিন্তু মহাজন পথ প্রদর্শক। শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বসু "মহীমতি" অন্ধকারে আলোকদাতা। সেই আলোকে দেখা যাক্ কতদূর অগ্রসর হইতে পারা যায়।

"আদর্শ ইতিহাস" কি তাহা মেকলের ভাষায় "মহামতি" বলিয়াছেন, "অতীতকে বর্ত্তমান করা, দূরস্থকে নিকটবর্ত্তী করা, মহাজনগণের সহবাস সুখে সম্ভোগী করা অথবা কোন মহাযুদ্ধের উপক্রমী উচ্চরসে আমাদিগকে উত্তোলিত করা, অলৌকিক গুণভূষিত ও মায়াময় রূপক সৃষ্টি সমুচিত মহাত্মাগণকে রক্তমাংসময় দেহীরূপে মূর্ত্তিমান করা, ও পূর্ব্ব পুরুষগণ যেন সশরীরে আমাদের সমক্ষে বিচরণ ও কথা কহিয়া বেড়াইতেছেন এরূপে তাঁহাদিগকে পরিদৃশ্যমান করা প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের কার্য্য। অন্য দিকে আমরা দেখিতে পাই সেই ইতিহাস চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া পুরাবৃত্ত সমুদায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বাহির করিতেছে। ঘটনাও মানব চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নানা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছে, কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে, এবং অতীত ঘটনাবলীর সারোদ্ধার স্বরূপ নানা নৈতিক তত্ত্ব ও রাজধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য সঙ্কলন করিতেছে। যিনি এইরূপে কল্পনা সৃষ্টি ও চিন্তার কার্য্য একত্রে মিলাইয়া পুরাবৃত্ত রচনা করিতে পারেন তাঁহারই পুরাবৃত্ত প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস নামের যোগ্য। তিনিই যথার্থ বিরোধী ধর্ম্মাক্রান্ত কাব্য ও দর্শনকে একাধারে মিলাইতে পারিয়াছেন। যে ইতিহাসে এই মিলন সংঘটন হইয়াছে সেই ইতিহাসই আদর্শ ইতিহাস। আদর্শ ইতিহাসে শুদ্ধ যে পুরাকালের ঘটনাবলীও পাত্রগণের চরিত্র জীবিত বর্ণে চিত্রিত হয় এমত নহে, সেই ভাস্বর ও জীবিত চিত্রেই ফলস্বরূপ নানাবিধ নিগূঢ় উপদেশ ও সারতত্ত্ব অন্তরে চির অঙ্কিত হইয়া যায়।"

এই "আদর্শ ইতিহাস ব্যাখার প্রতি-পংক্তি" "মহামতি" বলেন, "মহাভারতে প্রতীতিহইতেছে। কি তাহার কাব্যাংশ, কি তাহার দার্শনিকাংশ যে অংশই দেখুন না কেন, দেখিতে পাইবেন মহাভারত সর্ব্বাংশেই মেকলে নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ইতিহাসের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ অথবা শ্রবণ করিয়া আমরা কি ফল লাভ করি? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্যাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আজিও আমরা তাহা প্রত্যক্ষবৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি। কালের ও স্থানের দূরতা আমাদের মানস চক্ষু হইতে অপনীত হইয়াছে। সকলই আমাদের সমক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের সমক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আমরা সমুদায় দেদীপ্যমান দেখিতেছি। যে সমস্ত রসোদয়ে সেই সেই যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল, সেই সমুদায় রসে আজিও আমরা ভাসিতেছি। সেই উচ্চরসের শিখরে উঠিয়া আমরাও মহাযুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি। ভীষ্মাদি মহাজনগণের সহবাসসুখে সুখী হইতেছি। আমাদিগের নিকট অতীত কিছুই নাই। সেইপ্রাচীন সমাজের সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বভাব আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। তখনকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গী শিষ্টাচার প্রভৃতি সমুদায় বিষয় আনুপূর্ব্বিক আমরা জানিতে

পারিয়াছি। এত দূর জানি যে বোধ হয় এক্ষণকার বর্ত্তমান সমাজের বিষয় ততদূর জানি কিনা সন্দেহ। যুধিষ্ঠিরাদি পাত্রগণ কি বাস্তবিক জীবিত লোকের চিত্র কি কাল্পনিক রূপকময় চিত্র তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।"

এই বর্ণনায় তুই স্থলে শেষ রাখিবার জন্য "মহামতি" একটু চালাকি খেলিয়াছেন। প্রথম, "সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্যাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আজিও আমরা তাহা প্রত্যক্ষবৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি। "দ্বিতীয়" যুধিষ্ঠিরাদি পাত্রগণ কি বাস্তবিক জীবিত লোকের চিত্র কি কাল্পনিক রূপকময় চিত্র তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।" দুইটী কথাই ঠিক নহে "আদর্শ ইতিহাসের" লক্ষণ সংজ্ঞার বহির্ভূত। "To make the past present, to bring the distant near "অতীতকে বর্ত্তমান করা দূরস্থকে নিকটবর্ত্তী করা" "ব্যাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন" বলিলে কথাটা কিন্তু দ্ব্যর্থবাচক হইতে পারে, অর্থাৎ সে লেখা ব্যাসের কল্পনাপ্রসূত ও হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে "অতীতকে বর্ত্তমান করা বা দূরস্থকে নিকটবর্ত্তী করা" হইল না। "অতীতকালের ঘটনা ব্যাস যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন" বলিলে তবে আদর্শ ইতিহাসের লক্ষণ-সম্মত হইবে। বর্ণনার জোরে "কালের ও স্থানের দূরতা মানস নয়ন হইতে অপনীত করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর "পূর্ব্বের" ঘটনা "প্রত্যক্ষবৎ" প্রদর্শন করাই ইতিহাসের কার্য্য। বহুকালের কল্পিত একটা গল্প আজি "প্রত্যক্ষবৎ" প্রতীয়মান হইতে পারে। সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্প ও পড়িবার সময় "স্থান কালের দূরতা মানস নয়ন হইতে অপনীত" হইয়া থাকে; তাই বলিয়া আরব্য উপন্যাস "আদর্শ ইতিহাস" হইবে না। অতএব আদর্শ ইতিহাসের লক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বর্ণিত বিষয় "Occurrences of former Times অতীত ঘটনাবলী" হওয়া চাই। "মহামতির" দ্বিতীয় চালাকিটি ও এইরূপ। "To invest with the reality of human flesh and blood beings whom we are too much inclined to consider as personified qualities in an allegory. অলৌকিক-গুন-ভূষিত ও মায়াময় রূপক সৃষ্টি সমুচিত মহাত্মাগণকে রক্তমাংসময় দেহীরূপে মূর্ত্তিমান করা"। "বাস্তবিক জীবিত লোকের চিত্র কি কাল্পনিক রূপকময় চিত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিনা, একথাও পূর্ব্বমত দ্ব্যর্থবাচক। চিত্রটী তাহা হইলে "কাল্পনিক রূপকময়" হইলে ও হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। চিত্রের বিষয় "বাস্তবিক জীবিত লোক" হওয়া চাই। তাহারা এরূপ "অলৌকিক" যে মন স্বতঃই তাহাদিগকে "রূপকময়" বিবেচনা করে। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-পরম্পরা প্রদর্শনে "অলৌকিক"ত্ব "মায়াময়"ত্ব ও "রূপক"ত্ব খণ্ডন করিয়া এরূপ "মহাত্মাগণকে রক্তমাংসময় দেহীরূপে মূর্ত্তিমান করা" ইতিহাসের কার্য্য। সুতরাং মহাভারতকে "আদর্শ ইতিহাস" করিতে হইলে "যুধিষ্ঠিরাদি পাত্রগণকে" আর "কাল্পনিক রূপকময়" বলিবার উপায় নাই। তাহাদিগকে "বাস্ত-

বিক জীবিত লোক" বলিতেই হইবে। আবার "প্রাচীন সমাজের সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বভাব প্রত্যক্ষ" করাইতে হইলে, "তখনকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ভাব ভঙ্গী শিষ্টাচার প্রভৃতি সমুদায় বিষয় আনুপূর্ব্বিক" জানাইতে হইলে বর্ণিত ঘটনা নিচয় ও চিত্রিত পাত্র পাত্রীগণকে "বাস্তবিক" না বলিয়া উপায় কি? "মহামতি" কিন্তু তাহা বলেন না। অথচ বলেন ইতিহাসের লক্ষণ মহাভারতে "সর্ব্বাংশে" বর্ত্তিয়াছে। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের উপদেশ সমন্বিত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস।" "পুরাবৃত্ত" বলিতে ত পুরাকালের বিবরণ বুঝাইবে? যদি বল কল্পিত "আখ্যান" সাহায্যে সেই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও ত স্বীকার করিতে হইবে সে কালের রাজারা ঐরূপ ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন এবং ঐরূপ জ্ঞাতিযুদ্ধে কুলক্ষয়াদি ঘটিয়াছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কেবল "ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি" নাম গুলা ঠিক নয়; ও নামের কেহ জন্মায় নাই। আচ্ছা না হয় "ভস্মা ধোণা কানাই" হইল, তাহাতে আসিয়া গেল কি? যদি সেই পুরাকালের বিবরণই দিতে হইল, তবে নাম গুলা মাত্র লুকাইয়া "কল্পিত আখ্যানের" প্রয়োজন কি? "আদর্শ ইতিহাসে শুদ্ধ যে পুরাকালের ঘটনাবলী ও পাত্র পাত্রীগণের চরিত্র জীবিত বর্ণে চিত্রিত হয় এমত নহে, সেই ভাস্বর ও জীবিত চিত্রের ফলস্বরূপ নানাবিধ নিগূঢ় উপদেশ ও সারতত্ত্ব অন্তরে চির অঙ্কিত হইয়া যায়।" "শুদ্ধ পুরাকালের ঘটনাবলী ও পাত্রগণের চরিত্র" লইয়া "আদর্শ ইতিহাস" হয়না বটে, তাহার উপর আরও কিছু চাই; কিন্তু "সে ভাস্বর ও জীবিত চিত্র" যে চাইই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে কি? সেটা বর্জ্জিত করিয়া কিরূপে "আদর্শ ইতিহাস" হইতে পারে "মহামতি" বলিয়া দিবেন কি?

এইবার "মহাকাব্যের পরিচয়"। "আমি মহাভারতকে কাব্য রূপেই সৃষ্টি করিয়াছি।" মহাভারত বস্তুতঃ কাব্য ভিন্ন "আর কিছু" না হইলে ওরূপ উক্তির সার্থকতা থাকেনা। মহাভারত বস্তুতঃ ইতিহাস। তাই ব্যাস দেব বলিলেন "আমি তাহাকে কাব্যরূপে (অর্থাৎ কাব্যের আকারে) সৃষ্টি করিয়াছি।" "মহামতির" ইহাতে আপত্তি কি? কাল্পনিক চরিত্র না হইলে কি "কাব্য" হইতে পারে না? "না" বলিলে কারণ দর্শাইতে হইবে। "ঋষি সমাজ মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়াছেন।" তবে সন্দেহের কারণ কি? "ব্যাস ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্, আমি এক অদ্ভুত কাব্যরচনা করিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি জন্মাবধি সত্যব্যবহার করিয়াছ, এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণীমুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। এস্থলে দেখা যায়, ব্যাস ইহাকে কাব্য বলিয়াছেন বলিয়াই যেন ব্রহ্মা কাব্য নামে মহাভারতকে আখ্যাত করিলেন, নহিলে যেন তিনি ইহাকে আর কিছু বলিতেন।" কথা অতীব যথার্থ। "এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে।"

একথায় নিশ্চয়ই বলা হইল "গ্রন্থ বস্তুতঃ "কাব্য" নয়, তাহা ছাড়া "আর কিছু।" ব্রহ্মার মনের "ভাব" টানিয়া আনিতে না গিয়া কথায় ত এইরূপই বুঝা যায়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ব্রহ্মা কি "ভাবিয়া" ও কথা বলিলেন, "মহামতি" ব্যাখ্যা করিতেছেন, শুনুন।—"সাধারণ লোকে উহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে সেই ভাব ভাবিয়া"।— বিশ্বাস করুন; নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মনের ভাব এই। "মহামতি"র কি ভুল হইতে পারে? কিন্তু ব্যাস যদি মহাভারতকে 'কাব্য' না বলিতেন, তবে "ব্রহ্মা ইহাকে আর কিছু বলিতেন।" অর্থাৎ মহাভারত যাহা নয় তাহাই বলিতেন। এমন না হইলে কি "ব্রহ্মা"? ব্যাসের সহিত ব্রহ্মার কথোপ-কথন রূপ আখ্যায়িকা" হইতে ত আমরা মহাভারতকে "কাব্যাকারে ইতিহাস" বলি-য়াই বুঝিয়াছি। "মেকলে নির্দিষ্ট আদর্শইতি-হাসের" লক্ষণ যদি ইহাতে "সর্ব্বাংশে" বর্ত্তিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদের কথাই প্রমাণিত হইবে। বর্ণিত "ঘটনা-বলী"ও চিত্রিত "পাত্র পাত্রীগণ" যদি "কল্পনাপ্রসূত" হয় তবে মাথা কুটিয়া মরি-লেও আর মহাভারত "ইতিহাস" হইবেনা। "কল্পনা ইতিহাসে কি করে" তাহা ত "মহা-মতি" "সুন্দর বর্ণন" করিয়া আসিয়াছেন।— "অতীতকে বর্ত্তমান করা" ইত্যাদি। অর্থাৎ অতীত ঘটনানিচয়কে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা। বর্ণিত ঘটনা কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা হইলে "অতীত বর্ত্তমান" নিশ্চয়ই হইলনা, সুতরাং কাব্যের ও ইতিহাসত্ব সমাধান হইল না। "সেই আখ্যান-কাব্যই উৎকৃষ্ট কাব্য, যাহা ইতিহাস রূপে প্রতীত হয় (কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ইতিহাস নহে) এবং সেই ইতিহাসই উৎকৃষ্ট ইতিহাস যাহা কাব্য-রূপে প্রতীত হয় (কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কাব্য নহে)। "যথার্থতঃ যদি বর্ণিত বিষয়ের মিথ্যাত্ব ও সত্যত্ব লইয়া কাব্যত্ব ও ইতিহাসত্ব হয়, তাহা হইলে "কাব্য" কখন ও "ইতি-হাস" হইবেনা এবং "ইতিহাস" ও কখন "কাব্য" হইবেনা। তবে যদি কাব্যের মূল বিষয় সত্য "ঘটনা" লইয়া হয় তাহা-হইলে তাহাতে "ঐতিহাসিক গুণ" বর্ত্তিতে পারে, নচেৎ নয়। "রামায়ণ মহাভারতে যদি সে গুণ বর্ত্তিয়া" থাকে তবে তাহাদের বিষয় সত্য "ঘটনা" ও "বাস্তবিক জীবিত লোক।" কাব্যে তাহা থাকিবার কোন বাধা নাই। এইরূপ হইলেই কেবল বলিতে পারা যায় "রামায়ণ মহাভারত" একাধারে "কাব্য ও ইতিহাস।" ইহাতে "মানবের অন্তর্জগতে যাহা সত্য সত্যই ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণিত" হইবার বাধা নাই। সুতরাং ইহার "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা"ও অসম্ভব নয়। এই "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" দেখিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করেন সমস্তই কল্পিত, কিছুই বাস্তবিক ঘটে নাই। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কাল যদি ওয়াটার্লু যুদ্ধের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির হয় অমনি কি বলিতে হইবে ওয়া-টার্লু যুদ্ধ কাল্পনিক? কখনই নয়। তবে রামায়ণ মহাভারতকে "কল্পিত আখ্যান" বলিবার কারণ কি? "মহামতি" বলেন প্রথম "ব্যাসোক্তি।" আমরা দেখাইয়াছি তাহাতে মহাভারতের "কাব্যাকারে ইতি-

হাসত্ব" বই আর কিছু সপ্রমাণ হয় না। দ্বিতীয় "পাত্র ও পাত্রীগণের দেবসম্ভবত্ব।" "মহামতি" বলেন তাহাতে সপ্রমাণ হয় উহারা "কাল্পনিক সৃষ্টি," "প্রকৃত ঐতিহাসিক লোক" নহেন, কারণ "কেহই সাধারণ মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করেন নাই।" "সাধারণ মনুষ্য" ওরূপে জন্মায় না বলিয়াই কি ওরূপ জন্মের অসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন হইল ? ইহজগতে যাহা সম্ভব নয় তাহা কাব্যেই বা সম্ভব হইবে কিরূপে ? গাঁজাখুরী অবশ্য কাব্য নয়। ওরূপ জন্ম যদি অসম্ভব হয়, তবে কাব্যে ও সে কথা চলিতে পারেনা। অসম্ভবত্ব কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ। নতুবা ব্যাসবাক্য অবিশ্বাস করিতে পারিব না। প্রমাণ কিছু "মহামতি" দিতে পারেন কি ? তৃতীয়" ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে সেই সকল চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্গতি সাধনের দুঃসাধ্যত্ব।" কারণ "প্রকৃত মানব শরীরে একাধারে এত গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবনীয় নহে।"—প্রমাণ ? একথা বিশ্বাস করিতে "মহামতি"র উক্তি মাত্র যথেষ্ট নয়। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে ব্যাসবাক্য অবিশ্বাস করা যায় না। "মহামতি" কিন্তু প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। "ঘটনা সম্বন্ধে"ও ঐরূপ, অর্থাৎ তাহারা "ঐতিহাসিক রূপে" অসঙ্গত কিন্তু কাব্যে সঙ্গত। কারণ "কাব্য কোন কথা প্রমাণ করিতে চাহে না"। "মহামতি" একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

"একথা" নাকি "ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রমাণীকৃত" হয় না। কারণ "যুধিষ্ঠির এবং সকল পাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত" হন নাই। এবং "সকল পুণ্যবান্ মুক্তি রূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত" হন নাই। অথচ "মহাভারত এরূপে কল্পিত ও সজ্জিত, যে তাহাতে ধর্ম্মেরই উদ্ধার সাধন হইয়াছে এবং অধর্ম্মের ধ্বংস হইয়াছে।" "প্রমাণে" কিন্তু "একথা খাটিবেনা।"—না যদি খাটে তবে কথা মিথ্যা বলিয়া শতবার মহাভারতের "সজ্জায়" দোষ দিব। সহস্রবার বলিব "কল্পনা"স্বরূপ "সজ্জা" মহাভারতে নাই। যাহা দেখাইবেন ব্যাসের "কল্পনা", তাহা দেখাইতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছেন। "সাধুর পরিত্রাণ" "দুষ্কৃতের বিনাশ" ও "ধর্ম্মসংস্থাপন" এ সমস্যা যদি মহাভারতে অপূর্ণ থাকে তবে মহাভারত কিছুই হয় নাই। কিন্তু অপূর্ণআছে কে বলিল ? "সাধুর পরিত্রাণ" বলিতে যদি "সকল পুণ্যবানের মুক্তিরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি" এবং "দুষ্কৃতের বিনাশ" বলিতে "যুধিষ্ঠিরাদি সকল পাপীর বিনাশ প্রাপ্তি" না বুঝায়, তবে "মহামতির" "দৃষ্টান্ত" কোথায় থাকে ? যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত হয় তখন অর্থাৎ যুগে যুগে ভগবান্ অবতার হইয়া ধর্ম্মশীল সাধুর পরিত্রাণ ও অধর্ম্মশীল পাপীর বিনাশ দ্বারা অধর্ম্মের অভ্যুত্থানক্ষমতা অর্থাৎ ধর্ম্মকে অভিভূত করিবার ক্ষমতা বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপনানন্তর চলিয়া যান। মহাভারতে এ কার্য্যের ব্যত্যয় হইয়াছে কি ? নিতান্ত

অন্ধ না হইলে স্বীকার করিবেন নিশ্চয়ই হয় নাই। "মহামতি" মহাভারতের মাথা খাইতে বসিয়াছিলেন। চতুর্থ "মহাকাব্যের সাদৃশ্য।" "প্রধান ঘটনাসমূহ যদি এই কাব্যদ্বয়ের প্রকৃত হইত তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্যের এত ঘনিষ্ঠতা হইতনা।" কারণ "যাহা প্রকৃত হয় তাহা ধারাবাহিকরূপে অন্য ব্যাপারের সহিত সদৃশ হইয়া ঘটিতে পারেনা।" অথচ রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া আমরা সেই সেই কালের "প্রচীন সমাজের সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বভাব প্রত্যক্ষ দেখি।" তত্তৎকালীয় "রাজা রাজপুত্র রাজমহিষী ও পৌরগণ আমাদের নেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়ায়"। এখন "একজন যদি অন্যের সামগ্রী ও কল্পনা লইয়া নিজকাব্য প্রস্তুত" করিয়া থাকেন তবে ইহা কিরূপে সম্ভব? সেই সেই কালের বিবরণ ত দুই জনকেই দিতে হইবে? তবে উপায় কি? "মহামতি" মহাগোলে পড়িলেন। রামায়ণমহাভারতকে "আদর্শ ইতিহাস" বলিয়া আবার তাহাদিগকে "কল্পিত" বলিতে গেলে পদে পদে এইরূপ স্ববচোব্যাঘাত দোষ ঘটিবেই ঘটিবে। "মহামতি" প্রদর্শিত "সাদৃশ্য" যে তত্তৎকালীয় যথার্থ বিবরণে ঘটে নাই তাহা কে বলিল? "ঘটিতে পারেনা' বলিলেইত শুনিব না। প্রমাণ কোথায়? বাল্মীকি বেদব্যাসকে অবিশ্বাস করাইতে হইলে অখণ্ডনীয় প্রমাণের প্রয়োজন। তাহার পর রামায়ণ মহাভারত "কল্পিত" বলিলে রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি ইতিহাসে পাণ্ডবাদি হইতে যে সকল রাজবংশ বিস্তারের কথা আছে তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিতে হইবে। "মহামতি" প্রস্তুত আছেন কি? আর অধিক বলিতে চাহিনা। রামায়ণ মহাভারত মূলতঃ কল্পিত বলিয়া "মহামতি" যথার্থই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। "রামায়ণে রাজসভা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ণিত আছে, ব্যাস সেই ছবিকে ম্লান করিবার জন্যই যেন উজ্জ্বলতর ও অতুলনীয় রাজসভা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিলেন।" মহাভারতের বর্ণনা এইরূপ রামায়ণের দেখাদেখি, অথচ মহাভারত" আদর্শ ইতিহাস।" ইহা অপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক কথা কখন কেহ শুনিয়াছেন কি? এবার এই পর্য্যন্ত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যুত্তর।

"আদর্শ ইতিহাস" ও "মহাকাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক উপেন্দ্রবাবু বলেন যে পূর্ণ বাবু 'রামায়ণ মহাভারতকে মূলতঃ কল্পিত বলিয়া যথার্থ্যই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ণবাবু নিজ মতে কোন কথা বলেন নাই, ব্যাস নিজে মহাভারতকে কাব্য বলিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মার নিকট মহাভারতকে 'কাব্য রূপে সৃষ্টি করিয়াছি" বলেন নাই। একথা লেখকের আরোপোক্তি। ব্যাস-বাক্য এই—

"কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতং।
ব্রহ্মন্ বেদরহস্যঞ্চ্ছান্যৎ স্থাপিতং ময়া॥

"হে ভগবন্ আমি এই পরম শ্রদ্ধাস্পদ কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি। ব্রহ্মন্! সমুদায়

বেদের রহস্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের রহস্য ইহাতে স্থাপিত হইয়াছে।” মহাভারত রচয়িতা ব্যাস এস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, তিনি এক খানি কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদ-রহস্য যাহার প্রতিপাদ্য। এই ব্যাসোক্তিই লেখকের সমুদায় যুক্তি খণ্ডন করিতেছে। কাব্য কি উপকরণে প্রস্তুত হয়, ব্যাস অবশ্য বিলক্ষণ বুঝিয়া তবে নিজ গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সৃষ্টি ও কল্পনা যদি কাব্যের প্রধান উপকরণ হয়, যদি লোকের মনে কাব্যরস-সঞ্চার দ্বারা বেদ-রহস্য দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া মহাভারতের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে আর ব্যাস তাহাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ কোন্ মুখে বলিবেন। তিনি যে উপকরণে তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং তাহাকে কাব্য বলিয়াই প্রথিত করিয়াছেন।

উক্ত বাক্যে “কাব্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছি' ব্যাস একথা কোথায় বলিয়াছেন দেখিতে পাইলাম না। নিজ গ্রন্থকে ব্যাস কিরূপে গড়িয়াছেন, তাহা ব্যাস নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। পাছে অন্য লোকে তাহাকে অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের বিপর্য্যয় সাধন করে, এজন্য সাবধান করিয়া দিবার জন্য একথা গ্রন্থের প্রারম্ভেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। রামায়ণেও তদ্রূপ। লেখক নিজ প্রস্তাবের অন্যান্য স্থলে ব্যাস-বাক্যকে যেরূপ অখণ্ডনীয় বলিয়া ধরিয়াছেন, এস্থলে সেরূপ ধরেন নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যদি নিজ মতের সঙ্গতি রক্ষা করিতেন, তবে এই ব্যাসোক্তি দেখিয়াই নিরস্ত হইতেন। ব্যাস যেমন নিজ গ্রন্থকে কাব্যরূপে সাজাইয়াছেন, তদীয় টীকা ও ভাষ্যকারগণও তাহাকে তদ্রূপ বজায় রাখিয়াগিয়াছেন। মহাভারতের অবতরণিকা প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ স্বামীর টীকা যদি লেখক একবার পড়িয়া দেখেন তবে একথা বুঝিতে পারিবেন। পর্ব্ব-সংগ্রহের পর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার তাৎপর্য্য গাণেশঃ নামক ভাষ্যে কেমন সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। লেখকের যদি এই তাৎপর্য্যার্থ সংগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে তিনি আর বলিতেন না যে, মহাভারতীয় ঘটনাবলী ঐতিহাসিক ঘটনা; ব্যাস বলিয়াছেন এই পর্ব্বসংগ্রহই ভারত-বৃক্ষের বীজ স্বরূপ। রত্নগর্ভ, বিমল বোধ, শঙ্কর প্রভৃতির ব্যাখ্যাসমূহ কাব্য সৃষ্টির আলোক স্বরূপ। শাস্ত্রে যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, সেই আভাস-মতই পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন,—শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে। তাহাতে তিনি যদি হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন, তবে উপেন্দ্র-বাবু বোধ হয় অধিকতর হাস্যাস্পদ; তাহার ইতিহাসের ব্যাখ্যাও ততোধিক হাস্যাস্পদ। মহাভারতের সমুদায় ঘটনাবলি যদি প্রকৃত বলিয়া ধরিতে হয়, ধরিবেই বা কেন, ব্যাস ত ধরিতে বলেন নাই, এবং তজ্জন্য ভারতকে ইতিহাস বলিতে হয়, তবে সেরূপ ইতিহাস বাস্তবিক হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। মহাভারত যদি এই অর্থে ইতিহাস হয়, তবে আরব্যোপন্যাসকে ইতিহাস বলিবার বাধা

কি? আস্তীকোপাখ্যান অবধি স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত কোন্ ঘটনাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা বলিবে? মহাভারত যদি ইতিহাস হয় তবে তাহাতে কোন্ যুগের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে? মহাভারত হিন্দু শাস্ত্র মতে সাদি না অনাদি? আদি পর্ব্বের কোন্ বৃত্তান্তকে প্রকৃত বলিবে? আধুনিক কালের Modern history কি পূর্ব্বকালের ঋষিগণোক্ত ইতিহাস শব্দের প্রতিবাক্য? শিবরহস্যাদিও ইতিহাস নামে প্রথিত হইয়াছে। ঋষিরা যাহাকে ইতিহাস বলিতেন, সে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বেদার্থ ছিল, প্রকৃত ঘটনাবলি তাহার বিশেষ প্রতিপাদ্য ছিল এমত বোধ হয় না। মহাভারতেই লিখিত আছে"সত্যবতী-নন্দন ব্যাস, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সনাতন বেদ বিভাগ করিয়া তাহার ভাব সংগ্রহ পূর্ব্বক এই পবিত্র ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।" ইতিহাসের প্রতিপাদ্য যদি বেদ হয়, তবে সেই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী করিয়া কি তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে না? ঋষিগণ যে মহাভারতকে শুদ্ধ ইতিহাস বলিয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা উহাকে পুরাণ, আখ্যান, সংহিতা, কাব্য প্রভৃতি অন্যান্য বাক্যেও অভিহিত করিয়াছেন। * পুরাণ কি আধুনিক ইতিহাস (Modern history) শব্দের প্রতিবাক্য? ঋষিরা কিজন্য মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়াছেন, তাহাও পূর্ণবাবু বুঝাইয়া দিয়াছেন। কাহাদের চক্ষে মহাভারত প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া প্রতীত হইবে, সে কথাও বুঝাইয়া দিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। যাহাদের চক্ষে মহাভারতীয় সমগ্র ব্যাপার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রতীত হয়, তাহাদিগকে কোন কথা বুঝান বড়ই দুষ্কর। কারণ, তাহারা সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন (উপেন্দ্রবাবুও একথার পরিচয় দিয়াছেন,) সকল সম্ভবকে অসম্ভব করিতে পারেন। তাহাদিগের নিকট যুক্তি পরাস্ত।

মহাভারত কিরূপ অর্থে ও কোন্ স্থলে ইতিহাস এবং কোন স্থলে কাব্য, পূর্ণবাবু তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই রূপে ঋষি ও ব্যাস-বাক্য উভয়েরি সঙ্গতি দেখাইয়াছেন, অথচ মেকলে-নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও মহাভারতে প্রয়োগ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, পূর্ণবাবুর মতে এই জন্য মহাভারত ঐতিহাসিক কাব্য। উপেন্দ্রবাবুও মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিতে চাহেন, কিন্তু পূর্ণবাবু যে রূপে মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলেন, উপেন্দ্রবাবু যদি তাহাই বলেন, তবে ত তাহার প্রতিবাদের কোন প্রয়োজনই নাই। যদি না বলেন, তবে উপেন্দ্রবাবুর ঐতিহাসিক কাব্যের ব্যাখ্যা আবশ্যক। স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের কয়েক খানি ঐতিহাসিক কাব্য আছে, তাহা কি উপকরণে গঠিত এবং মিল্টনের মহাকাব্য কি রূপ উপকরণে নির্ম্মিত, একবার তুলনা করিয়া তবে মহাভারতের বিচার করা আবশ্যক। মহাভারত মধ্যে প্রকৃত ঘটনা ও পাত্রগণের চরিত্রাঙ্কন থাকিলে তাহা বাহির করা কি সুসাধ্য?

* "যেমন অন্যান্য আশ্রম গৃহাশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না, তাহার ন্যায় কোন কবিকৃত কাব্য এই মহাভারত হইতে উৎকৃষ্ট হইতে পারে না।" ২ অধ্যায়।

সৃষ্টি করিয়া যে কাব্য-চরিত্র গঠিত হয়, তাহা কি রূপে প্রকৃত বলিবে? কোন প্রয়োজন সাধন জন্য সৃষ্টি করিয়া যে ঘটনাবলির কল্পনা করা হয়, তাহাকে কিরূপে প্রকৃত ঘটনা বলিবে? স্বর্গ,মর্ত্ত্য, পাতল পৌরাণিক কাব্যের আয়ত্তাধীন। মহাভারত সেই রূপ ঘটনা ও চরিত্রে পরিপূরিত হইয়া কাব্য নামে প্রথিত হইয়াছে। সেই কাব্য-সৃষ্টির সহিত যে স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনা মিশ্রিত থাকে, যে স্থলে ইতিহাসকে বিশ্লিষ্ট করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ম্যাকবেথের কোন্ স্থলে ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা আজি নিরাকরণ করিতে গেলে হয় ত অনেক স্থলের কল্পনাবিজৃম্ভিত মিথ্যা ঘটনাকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মহাভারত মধ্যে যদি তদ্রূপ কোন প্রকৃত ঘটনা মিশ্রিত থাকে, তাহা আজি বাহির করিতে গেলে অনেক অসত্য কল্পনাকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। অন্যদিকে আবার দেখুন, মহাভারত মধ্যে এত অদ্ভুত ও অভৌতিক কাণ্ডের বর্ণনা আছে যে সে সমুদয়কে একেবারে সকল আপত্তি-বর্জ্জিত করা বড় সহজ কথা নহে। যে উপাখ্যান ধরিবে সেই উপাখ্যানে একটা না একটা আপত্তি আছে। যে পাত্রের ও পাত্রীর চরিত্র ধরিবে তাহার সহিতই অদ্ভুত, অভৌতিক, ও অমানুষীভাব মিশ্রিত আছে। কাহাকে তুমি ঐতিহাসিক চরিত্র বলিতে চাও? সকল আপত্তি বিবর্জ্জিত করিতে হইলে, সকল ঘটনা ও চরিত্রই অতি সামান্য হইয়া পড়ে। এইরূপ করিতে গেলে হয় ত অবশেষে এই সত্য মাত্রে দাড়াইতে হইবে যে, কুরুক্ষেত্রে একটা গৃহ-যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে উভয় পক্ষীয় রাজগণের কুলক্ষয় হয়। এইমাত্র যদি ইতিহাস হয় তবে কি মহাভারতকে ইতিহাস বলিবে? যুদ্ধ ত পৃথিবীতে কত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কি আইসে যায়? কিন্তু মহাভারতীয় ঘটনাবলি ও পাত্রগণ যদি প্রকৃত যুদ্ধের ঘটনাবলি ও পাত্রগণ না হয়, তবে আর মহাভারতের সহিত প্রকৃত যুদ্ধের একতা কোথায়? ইতিহাস নিষ্কাশন করিয়া যে তথ্য বাহির হইবে, তাহা ত মহাভারতীয় বৃহৎব্যাপার নহে। যাহা মহাভারতীয় বৃহৎব্যাপার, তাহা যদি সমুদায় প্রকৃত না হয়, তবে সে ইতিহাসে ফল কি? যে ইতিহাস শুদ্ধ রাজাবলির নাম ও যুদ্ধবর্ণন, সে ইতিহাস পাঠে কি কোন ফল আছে? পূর্ণবাবু সেরূপ ইতিহাসকে তাহার প্রবন্ধ মধ্যে যে স্থান দিয়াছেন তাহা অবশ্য উপেন্দ্র বাবু দেখিয়া থাকিবেন। পূর্ণবাবু রামায়ণ ও * মহাভারতকে কিরূপে ইতিহাস বলিয়াছেন, কিরূপে মেকলের কথা তাহাতে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা লেখকের ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া কথা কওয়া উচিত ছিল। পূর্ণবাবু কি বলেন

* ইতিহাসপ্রিয় ইংরাজ লেখকেরাও কি বলেন দেখুন। রামায়ণ সম্বন্ধে কোন লেখক বলিতেছেন—It is generally believed to be in part *allegorical* representing the introduction of Ary an Culture, and dominion into Southern India" vide Introduction to his "Sanskrit grammar" by W. D. Whitney, Professor of Sanskrit and Comparative Philology in Yale College.

নাই যে, "ইতিহাস এখন শুদ্ধ রাজবৃত্তান্ত নয়, তাহা একটি দেশের অথবা সমাজের কোন বিশেষ কালের সমুদায় বৃত্তান্ত।" একথা কেন বলা হইয়াছে, তাহার কারণ পূর্ণবাবুর প্রস্তাব মধ্যেই বিদ্যমান আছে।

মহাভারত ও রামায়ণ এই জন্য ইতিহাস যে তাহাতে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যসমাজ চিত্রিত দেখি। সমাজের চারিদেশ আমাদের চক্ষে জাজ্বল্যমান ফুটিয়া উঠে। এইটিই প্রকৃত চিত্র। যদি প্রকৃত বিষয়ের কোন মাল-মসলা ঐ কাব্যদ্বয়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহা এই রূপ মাল মসলা। ঘটনা সত্য হইতে পারে, না ও হইতে পারে, রাজ-চরিত্র সত্য হইতে পারে, না ও হইতে পারে। তাহাতে কিছু আইসে যায় না। কিন্তু যেখানে সমাজ চিত্রিত হয়, সেই খানে আমরা ইতিহাস দেখি। আরব্যোপন্যাস মধ্যে যতটুকু সমাজ-চিত্র আছে, ততটুকু ইতিহাস আছে, আরব্যোপন্যাস ততটুকু ইতিহাস। ইতিহাস কেবল রাজার জীবন-বৃত্তান্ত নহে। সেরূপ বৃত্তান্তকে জীবনী আখ্যা দিলেই ঠিক হয়। প্রকৃত ঘটনা ও রাজবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইতিহাসের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, পূর্ণবাবু তাহা উজ্জ্বল বর্ণে লিখিয়া গিয়াছেন। সে প্রকৃত ইতিহাসকে পূর্ণবাবু অগ্রাহ্য করিয়া যাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন, উপেন্দ্রবাবু তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াই গোলে পড়িয়াছেন। যে প্রবন্ধ যে ভাবে কল্পিত, তাহাকে সেই রূপেই গ্রহণ করা উচিত। "আদর্শ ইতিহাস" নামক প্রবন্ধটি উপেন্দ্রবাবুর ভাল করিয়া পড়িয়া তবে প্রতিবাদে উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। এই দেখুন ব্যাস তদীয় গ্রন্থমধ্যে ইতিহাসের কিরূপ প্রকৃত বিষয় স্থাপন করিয়াছেন—

"ব্রহ্মন্, সমুদায় বেদের রহস্য ও অন্যান্য শাস্ত্রের রহস্য ইহাতে স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ও ছন্দ এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদ ও উপনিষদের বিস্তার, ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির সংগ্রহ; বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কাল-নিরূপণ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, প্রভৃতির নির্ণয়; বিবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ, বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, চতুর্বর্ণ বিধান; পুরাণ-সংগ্রহ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, তারা, প্রভৃতির পরিমাণ; যুগনিরূপণ; ঋগবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অধ্যাত্মবিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, দানধর্ম্ম, পাশুপত ধর্ম্ম, দেবজন্ম, ও মনুষ্যজন্মের কারণ ও তাহার বৃত্তান্ত। পবিত্র তীর্থের বিবরণ, পবিত্র দেশ সমুদায়ের বিবরণ, নদী, পর্ব্বত বন, সমুদ্র প্রভৃতির নির্ণয়, রমণীয় কল্প অর্থাৎ ধনুর্ব্বেদোক্ত শাস্ত্রাদির বিধি ও দুর্গ সেনাদি ব্যূহ রচনা প্রভৃতির বিধি, প্রাচীন যুদ্ধ-কৌশল, বাক্যজাতি বিশেষ অর্থাৎ রাজা, অমাত্য, চেট প্রভৃতি বক্তাভেদে বাক্যভেদ, লোকযাত্রাক্রম অর্থাৎ নীতি-শাস্ত্র ইত্যাদি যে যে বিষয় সর্ব্বসাধারণের আবশ্যক তৎসমুদায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

এইরূপ অতীতকে মহাভারত বর্ত্তমান করিয়াছে। এইজন্য পূর্ণবাবু মহাভারত ও

রামায়ণকে ইতিহাস বলিয়াছেন। কোন ঘটনা সত্য হউক বা, না হউক, তাহা ভাবিয়া তিনি মহাভারতের ইতিহাসত্ব বিচার করেন নাই। কারণ, ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করা বড় সহজ কথা নয়। একথা তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তদ্বিষয় লইয়া পেড়াপীড়ি করিয়া তাঁহার কথা বিচার করা উপেন্দ্র বাবুর যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। তিনি বরং একথা বলিতে পারিতেন যে, পূর্ণবাবু যাহাকে ইতিহাস বলিয়াছেন সে প্রকার ইতিহাস আমার গ্রহণীয় নহে। তিনি যাহা ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহাতে তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, পূর্ণবাবু সে সন্তোষের হন্তারক নহেন। নহিলে ভূমি বদলাইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করা নিরর্থক।

কিন্তু উপেন্দ্র বাবু আবার নিজ মতেরই সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন কই? তিনি যেরূপ ইতিহাসের পক্ষপাতী, সেইরূপ ইতিহাসেরই মাথা খাইয়া আবার বলিতেছেন—

"তবে কেবল ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি নামগুলা এক নয়, ও নামের কেহ জন্মায় নাই। আচ্ছা না হয় ভম্বা ধোনা কানাই হইল, তাহাতে আসিয়া গেল কি?" যদি তাহাতেই না আসিয়া যায় তবে তাঁহার ইতিহাস রহিল কোথায়? তিনি ত ঘুরিয়া পূর্ণবাবুরই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেন। উপেন্দ্র বাবু কি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, মহাভারত মধ্যে কি কি প্রকৃত বিষয় আছে। রামায়ণ ও ঠিক নিজকালের মহাভারতোক্ত বিষয় সকলের আলোচনা করিয়া এক খানি তাৎকালিক সমাজ-চিত্র দিয়াছে। এই দুই চিত্রের তুলনা করা একজন বিচক্ষণ ইতিহাস-বেত্তার কার্য্য। প্রফুল্ল বাবু এই বিষয় লইয়া এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাও তবু সম্পূর্ণ নহে। কিন্তু মহাভারত ও রামায়ণের তুলনা করিয়া আজিও যে কোন ইতিহাস-বেত্তা একখানি ইতিহাস লেখেন নাই তাহাই বড় ক্ষোভের বিষয়। রামায়ণের সময় বাহু বলের বোধ হয় অধিকতর প্রাদুর্ভাব ছিল, এইজন্য সীতার বিবাহে ধনুর্ভঙ্গপণ। কিন্তু মহাভারতের কালে লক্ষ্য-ভেদ, তখন বোধ হয় ধনুঃ বিদ্যার অধিকতর প্রাদুর্ভাব। এই সমুদায় বিষয় আলোচিত হইলে আমরা প্রাচীন-আর্য্য সমাজের একখানি চমৎকার ইতিহাস প্রাপ্ত হই।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সেরূপ ব্যাখ্যা পূর্ণবাবুর সম্পত্তি নহে। তাহা শাস্ত্রেই আছে। এইজন্য নীলকণ্ঠ স্বামী নিজ টীকার নাম "ভারত-ভাব-দীপ রাখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্য গৃহের বহির্দ্দেশ আলোকিত করেন, কিন্তু কেবল দীপই তাহার অভ্যন্তর দেশ প্রকাশ করিয়া দেয়। মহাভারত-অভ্যন্তরস্থ গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া নীলকণ্ঠের টীকা বাস্তবিক দীপ স্বরূপ হইয়াছে। একথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক শাস্ত্রকারেরা যদি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না দিতেন, তবে মহাভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেহ বাহির করিতে সাহসী হইত না। অপর লোকের অশাস্ত্রীয় কথা গ্রাহ্যই বা হইবে কেন? ওয়াটর্লুর যুদ্ধের মত যদি সামান্য আকারে মহাভরতীয়

ঘটনাবলি বর্ণিত হইত, তবে কি তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির হইত? কে সেই যুদ্ধের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিতে যায়? যাহা আধ্যাত্মিক ভাবে কল্পিত হইয়া কাব্য নামের যোগ্য হইয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা।

লেখক পূর্ণবাবুর প্রস্তাব পাঠ করিয়া কথায় কথায় প্রমাণ প্রমাণ বলিয়া চেঁচিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাহার স্মরণ রাখা উচিত ছিল, পূর্ণবাবু মহাভারতের কাব্য-সৃষ্টি এবং কাব্য গুণ দেখাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ব্যাস মহাভারতকে যে কাব্য-কল্পনা ও রসের আধার করিয়াছেন, তদীয় টীকা ও ভাষ্যকারগণ তাহাকে যে ভাবে বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন, পূর্ণবাবু তদনুসারী হইয়া সেই মহাকাব্যের মহাকল্পনার সমালোচনা করিতেছেন। কাব্য পড়িতে যিনি প্রমাণ চান, তিনি ইতিহাস পড়িবার সময় কি করেন বলিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করি, বাবু হে, যখন তুমি ইংরাজীতে বড় বড় ইতিহাসের কেতাব পড়, তখন কতবার প্রমাণ চাও। যখন ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ছাই ভস্ম অধ্যয়ন কর, তখন কি পাতে পাতে প্রমাণ চাও? যখন সম্বাদ পত্রে যুদ্ধের নানা রকম গুজবী "টেলিগ্রাম" দেখ তখন কি প্রমাণ চাও? তুমি যে সকল বিষয় শৈশব হইতে বিশ্বাস করিয়া আছ, তাহার কত প্রমাণ লইয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিয়া তবে বিশ্বাস করিয়াছ? প্রমাণ দেখিয়া পড়িতে হইলে, ইংরাজীর বড় বড় ইতিহাস-গ্রন্থ কি কি গঙ্গায় ভাসাইতে হয় না? যেখানে প্রমাণের ছড়াছড়ি, সেই ইংরাজী-আদালতে কি সকল সময় সত্য নিরূপিত হয়? নানা সাহেবের সাতবার ফাঁসি হইল কেন? যদি ইতিহাস পড়িবার সময়ে তুমি কথায় কথায় প্রমাণ না চাও, তবে কাব্য ব্যাখ্যা পড়িবার সময় প্রমাণ চাহিয়া কি তুমি নিতান্ত হাস্যাস্পদ হও নাই? যে মহাভারতকে ব্যাস কাব্য বলিয়াছেন, সেই মহাভারতের কবিত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া যদি পূর্ণবাবু তাহার মাথা খাইয়া থাকেন তবে নিজের ইতিহাসের ভাবানুযায়ী তাহাকে ইতিহাস রূপে গ্রহণ করিয়া লেখক যে শুদ্ধ সেই মহাভারতের মাথা খাইতে বসিয়াছেন এমত নহে তাহার ধড় শুদ্ধ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বলিতে হইবে। তিনি আরও একটি প্রলাপ বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "গাঁজাখুরী অবশ্য কাব্য নয়।" ভাল, গাঁজাখুরী যদি কাব্যে স্থান না পায়, ইতিহাসে কি তাহার স্থান পাইবার সম্ভাবনা? মহাভারত যদি লেখকের মতানুযায়ী ইতিহাস হয়, তবে তাহাতে গাঁজাখুরী যে আদৌ স্থান পাইতে পারে না। যে গাঁজাখুরী কাব্যেই লেখকের মতে স্থান পায় না, ইতিহাসে তাহাকে স্থান দিতে গেলে কি আরও অধিক গাঁজাখুরী হয় না? ইংরাজী অনেক ঐতিহাসিক কাব্যে ও আমরা অনেক গাঁজাখুরী বিদ্যমান দেখিয়াছি। কাব্যে গাঁজাখুরী অনেক স্থলে বরং শোভা পায়, কিন্তু ইতিহাসে তাহার স্থান কোথায়?

লেখক আরও একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রাচীন সমা-

জের সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বভাব প্রত্যক্ষ করাইতে হইলে তখনকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গি, শিষ্টাচার প্রভৃতি সমুদায় বিষয় আনুপূর্ব্বিক জানাইাত হইলে বর্ণিত ঘটনা নিচয় ও চিত্রিত পাত্র পাত্রীগণকে বাস্তবিক না বলিয়া উপায় কি।" এই কথা বলিয়াই আবার বলিতেছেন "কেবল ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি নাম গুলা ঠিক নয়; ও নামের কেহ জন্মায় নাই। আচ্ছা না হয় ভম্মা ধোনা কানাই হইল তাহাতে আসিয়া গেল কি।" ওদিকে উপায় দেখিতে পাইতেছেন না, এদিকে আসিয়া ও যাইতেছে না। যদি আসিয়া না যায়, তবে কি লেখক উপায় দেখিতে পান নাই? দেশ কাল পাত্রের যথাযথ বিবরণ যে ঐতিহাসিক চরিত্র ভিন্ন কাব্য চরিত্রে প্রদর্শন করা যায় না একথা লেখকের কোন ইতিহাস আছে কি? অন্য দৃষ্টান্ত দূরে থাক, একটি সামান্য আজিকার দিনের দৃষ্টান্ত ধরুন। "বিবাহ বিভ্রাট" নামক যে দৃশ্য কাব্য লিখিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকৃত ঘটনা? যদি প্রকৃত ঘটনা না হয় তবে তাহাতে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের বৈবাহিক রীতির অনুচিত্র কিরূপে প্রদত্ত হইল? ওয়াল্‌টার স্কটের ঔপন্যাসিক কাব্য ও নভেল গুলিতে বিলাতী সমাজ চিত্র কিরূপে সম্ভব হইল? মেকলে কি এই প্রকার নভেল ও কাব্যকেই ইতিহাস স্থানীয় বলিয়া অভিহিত করেন নাই? যদি করিয়া থাকেন, কেন করিয়াছেন? পূর্ণবাবু কি মেকলের এই ব্যাখ্যানুসারে মহাভারতকে ইতিহাস বলেন নাই?

আমরা এ প্রস্তাব আর বাড়াইতে চাই না। লেখকের অন্যান্য কথা গুলিও এইরূপ যুক্তি পূর্ণ ভবিষ্যতে আমরা কোন প্রবন্ধ শেষ হইয়া না যাইলে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিব না।

প্রকাশক।

মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চ্চা।

মুসলমান সম্রাটদের প্রতি হিন্দুগণের চিরকালই বিদ্বেষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানেরা যে ভারতবর্ষের কখন কোন উপকার করিয়াছে অথবা উহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে ইহা কেহই স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানেরা আমাদের সমস্ত পুস্তকাদি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অনেক শিক্ষিত লোক অদ্যাপি মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ছিল, মুসলমানেরা উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। একথা বাস্তবিক সত্য নহে। সুসভ্য ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া অধুনা হস্ত-লিখিত সংস্কৃত পুস্তক রক্ষার্থ এবং দুর্ল্লভ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের বহুল প্রচার

ও অনুবাদার্থ যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন প্রাচীন কালে মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে অনেকেও সেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনাতন ইংরাজ পুরুষগণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার যেরূপ সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে পূর্ব্বে মুসলমাণ সম্রাটগণের মধ্যেও সেইরূপ সমাদর ছিল। আকবর বাদশাহ সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ীগণকে বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহার যত্নে বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। তন্মধ্যে রামায়ণ মহাভারত কথাসরিৎসাগর বেদ, উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি প্রধান। চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক গুলি গ্রন্থ আকবরের বহুতর বর্ষ পূর্ব্বে পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র সি, আই, ই, মহোদয়—সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পারস্য ভাষার সর্ব্ব প্রধান অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থ এক খানি সংস্কৃত অশ্ব চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু পারসী পুস্তক খানি অনেক পারস্য ভাষার পুস্তকালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের সময়ে যে কেহ সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে পারিত রাজদরবারে তাহার চাকরী পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য তাঁহারই সময়ে বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয়। সম্রাটের নিজ পরিবার মধ্যে অনেকেও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর, সাজাহান, খসরু পারবিজ্—প্রভৃতি সকলই সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়াছিলেন।

সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো সংস্কৃত চর্চ্চায় প্রায় আকবরের ন্যায় অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। হিন্দুদিগের সহিত সর্ব্বদা মিলিতে মিশিতে ভাল বাসিতেন এবং সম্পূর্ণরূপে আকবর প্রবর্ত্তিত রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং অনেক গুলি সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদিত উপনিষদাবলী অদ্যাপি স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের ভাষা প্রচলিত কাব্যাদির ভাষা অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন ও অনেকাংশে বিভিন্ন। অনেক স্থলে উহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা স্ব স্ব মত সমর্থনার্থ উপনিষদের নানা রূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। দারাশিকোর অনুবাদের বিশেষ চমৎকারিত্ব এই যে সংস্কৃত উপনিষদ গুলি যত প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে তাঁহার অনুবাদের তত প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে অর্থাৎ তিনি তাৎপর্য্যার্থের অনুবাদ করেন নাই, অক্ষরার্থের অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার অনুবাদ প্রাঞ্জল, ও পারস্যভাষাবিৎগণের সুখ-বোধ্য। দারাশিকো কর্ত্তৃক অনুবাদিত উপনিষদাবলীর মধ্যে এক্ষণে ৫০ খানি উপনিষদ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার বহুল উন্নতি সত্ত্বেও এবং সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের যথেষ্ট উৎসাহ, সমাদর ও সুযোগ থাকিলেও অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষায় ৫০ খানি উপনিষদ্ অনুবাদিত হই-

য়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার অনুবাদ মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্য, শ্বেতাশ্বতর, গর্ব্বসার, তেজোবিন্দু, আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী, ধ্যানবিন্দু অথর্ব্ব-শিরস অথর্ব্বশিখা, হংসনাদ, অমৃত-বিন্দু, ক্ষুরিকা ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, শতরুদ্রীয়, নৃসিংহতাপনী, মৈত্রায়ণী, কৌষীতকি, জাবাল, প্রভৃতি উপনিষদ দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য অক্ষারে সংস্কৃত শব্দ লেখা অতি কঠিন হইলেও দারাশিকো কি প্রকার উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়াছেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

উপনিষদ	উপ্‌নেখট্‌
ঈশাবাস্য	ঈশ্‌বস্‌
কেন	কিন্‌
কঠ	কৎ
মুণ্ডক	মণ্ডুক
মাণ্ডুক্য	মান্দোকৎ
প্রশ্ন	পোরনস্‌
ছান্দোগ্য	ছান্দোগ্‌
বৃহদারন্যক	বৃদারন্‌
শ্বেতাশ্বতর	শ্বতাশ্বতর
সর্ব্বসার	সরূপ্‌সর
তেজোবিন্দু	তেজবিন্দ
ধ্যানবিন্দু	ধ্যান্‌বিন্দ
আনন্দ বল্লী	আনন্দব্লি
ভৃগুবল্লী	ভ্রগব্লি
অথর্ব্বশিবর	অথর্ব্বশর্‌
অথর্ব্বশিখর	অথর্ব্বশঙ
হংসনাদ	হেংসনদ্‌
অমৃতবিন্দ	অমৃত্‌বিদ
ক্ষুরিকা	ছর্‌কা
শতরুদ্রীয়	শতরুদ্র,
নৃসিংহতাপনী	নরসিংহ
মৈত্রাবলী	মিত্রি।
কৌষীতকি	কৌষ্‌তক

গত শতাব্দীর শেষভাগ যখন ইংরাজগণ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের পারস্য ভাষা শিক্ষা বহুল প্রচার হইয়া উঠে। ঐ সময়ে অনেক পারস্যভাষায় অনুবাদিত সংস্কৃত গ্রন্থ। লাটীন্‌ ও ইংরাজীভাষায় পুনরনুবাদিত হইয়াছিল। এইরূপ অনুবাদিত একখানি মহাভারত হইতে টালবয়স্‌ হুইলর সাহেব তাঁহার ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। দারাশিকোর অনুবাদিত উপনিষদগুলিতে সেই সময় লাটীন্‌ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। অনুবাদকের নাম আঁন্‌কুইটল্‌-পেরন। ইতিন দৌলতরাও সিন্ধিয়ার একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইহার ঐ বাহুবলে সিন্ধিয়া হিন্দুস্থান জয় করতঃ অন্ধ সম্রাট সাহআলমকে আপনার আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার নিবাস সেভয়। সিন্ধিয়া ইহার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্য-বহার করিলে ইনি ইংরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছুকাল লক্ষ্ণৌ নগরে অব-স্থিতি করেন। পরে ওলন্দাজাধিকৃত চুঁচুড়া নগরে আপনার বাস স্থান স্থির করিয়া তথায় এক মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। উক্ত প্রাসাদ পরে ৺ প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বৈটকখানা ও এক্ষণে হুগলী কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে। অনেকে বলেন যে আমাদের প্রসিদ্ধ কবি-

ওয়ালা আণ্টুনিসাহেব ইহারই পুত্র। পেরন কর্তৃক লাটীনভাষায় অনুবাদিত উপনিষদ্গুলি এক্ষণে অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শ্যামপাখি। *

১

দেখ সখি শ্যামপাখী ব্রজ পুরে উড়িছে—
রাধা রাধা রবে ডাকি ত্রিভুবন জুড়িছে।
অমন মধুর স্বরে, কে শিখালে বুলি ওরে,
তবে কেন রাধিকারে, ছেড়ে কারে ঢুঁড়িছে
হ্যাদে দেখ শ্যামপাখী ব্রজ পুরে উড়িছে।

২

ধরে দেরে ওই পাখী মন মোর পুড়িছে—
বারে বারে কি মধুরে সেই স্বরে ছাড়িছে।
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর-হৃদি, উড়ে গেছে মোর নিধি,
মরমের ব্যথা তাই মরমেতে বাড়িছে—
দেরে ধরে ওই পাখী মন মোর পুড়িছে।

৩

পোড়া বিধি কার নিধি কারে দেয় আনিয়া-
বাড়াইল কেন প্রেম তবে শ্যাম জানিয়া।
কত যতনেতে রাখি, পুষেছিনু ওই পাখী,
কার কুঞ্জে গেছে মোর হৃদয়ের মণিয়া—
হায় বিধি কার নিধি কারে দেয় আনিয়া!

৪

পড়াতাম দিন রাত নাহি কিছু মানিয়া—
পড়িত সে রাধা বুলি কত ছাঁদ বানিয়া।
বেঁধেছিনু মায়া ডোরে, বাঁধিয়াছে সেও মোরে,
খাও'তাম শুধু তারে ক্ষীর ননী ছানিয়া—
পড়াতাম দিন রাত নাহি কিছু মানিয়া।

৫

সাধের রায়ের পাখী বলে সবে জানিত—
সবাই রায়ের পাখী বলে তারে মানিত।
গোপিনীরা তাই তারে, পরায়েছে স্নেহহারে,
মন তার তুষিবারে ননী ভারে ছানিত‡—
সাধের রায়ের পাখী বলে তারে জানিত।

---

* পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেম ও অনুরাগ কৃষ্ণলীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে কৃষ্ণলীলা এক অপূর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্র। নায়ক নায়িকা রূপে এই ভক্তিশাস্ত্র কল্পিত। রাধিকার কল্পনা এই প্রেমের বিভিন্ন ভাব ও অবস্থা। রাধার পার্শ্বে চন্দ্রাবলী, আত্মার দুইটী অবস্থা প্রদর্শন করে। যে প্রেমে উত্থিত ও মগ্ন হইলে স্বেচ্ছাগত আত্মায় কৃষ্ণাবির্ভাব ঘটে, সেই প্রেম চন্দ্রাবলীর কল্পনা। এই প্রেমে জীব কৃষ্ণকে নিত্যসম্ভোগ করে সুতরাং কৃষ্ণবিরহ ঘটে না। চন্দ্রাবলীর প্রেম তজ্জন্য নিঃস্বার্থ। কিন্তু এই প্রেমোদয়ের প্রাক্কালে আত্মার যে প্রেমাবস্থা থাকে, সে অবস্থায় কৃষ্ণবিরহ সম্ভব হয়। তখন কৃষ্ণ আত্মার নিত্য সম্ভোগী নন। নিত্য সম্ভোগী হইবার জন্য আত্মার তখন একান্ত যত্ন ও ইচ্ছা। আত্মার এই ঐকান্তিক অভিলাষ রাধা। রাধার সেই ভাব এই কবিতার বিষয়।

‡ হৃদয়ের অষ্টভাব রাধিকার অষ্ট সহচরী গোপিনী এবং হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার ক্ষীর ও ননী।

৬

কোন্ ছলে চন্দ্রাবলী নিল তারে ছলিয়া—
ওরে সখি সেই ছল দেনা মোরে বলিয়া।
ফিরে তারে আনি ঘরে, রাখি তারে পিঞ্জরে,
সাধি তারে প্রেমাদরে প্রাণ মন ঢালিয়া—
কোন্ ছলে চন্দ্রাবলী দেখি লয় ছলিয়া।

৭

বনে বনে ডাক তারে রাধা নাম করিয়া—
ছলনার ডোরে পাখী রাখিয়াছে ধরিয়া।
রাধা প্রেমে বাঁধাপাখী, রবেনা সে বাঁধাথাকি,
কাঁন্দিবে তাহার মন রাধানাম স্মরিয়া—
বনে বনে ডাক তারে রাধানাম করিয়া।

৮

ওই দেখ আসে পাখী বনবেশ পরিয়া—
বনবিহারীর রূপে বনে বনে ফিরিয়া।
শিরে শিখি-পুচ্ছধরা, বনমালা কণ্ঠে পরা,
মুখে কত সুধাভরা রাধানাম ধরিয়া।
দেখ সখি আসে পাখী বনবেশ পরিয়া।

৯

আয় রে সাধের পাখী রাখি তোরে বাঁধিয়া--
সদা মন তুষি তোর মনোসাধে সাধিয়া।
তুই মোর প্রাণ মন, বড় যতনের ধন,
বারেক না হেরে তোরে সারা হনু কাঁদিয়া–
আয়রে সোনার পাখী রাখি তোরে বাঁধিয়া।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

রামসিয়ানা।

যদিও ঠগী কমিশন আজও অস্থিপঞ্জরাবৃত, অতিক্ষীণ দেহভার লইয়া—অলক্ষ্য ভাবে ভারতের কতিপয় স্থলে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে—যদিও ব্রিটিশ সিংহের সুশাসনের প্রভাবে—ভারতের সকল প্রদেশেই শান্তির ছায়া পড়িয়াছে—যদিও ঠগী বর্গীর কথা আজ কালের এই রেলওয়ে টেলিগ্রাফের দিনে, উপন্যাসের কুহেলিকাবৃত হইয়া পড়িয়াছে—তত্রাচ ঠগ সম্প্রদায়ের নাম স্মরণ পথে উদিত হইলেই শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাঙ্গালীরা যেমন আজও ঠগীর কথা সম্পূর্ণ রূপে স্মৃতি পথ বিলুপ্ত করিতে পারে নাই—দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসীরাও তদ্রূপ ঠগীর লোমহর্ষণ চিত্র মনঃ ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

পৃথিবীর নানা স্থানে নানাবিধ নরঘাতক সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছিল ও এখনও হইতেছে; কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই—ঠগদিগের ন্যায় প্রকৃত সমাজ বন্ধন করিয়া এতাদৃশ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। যে কোন গুপ্ত সম্প্রদায় হউক না কেন—সমাজ বন্ধন করিয়া বর্দ্ধিত প্রতাপ হইলেই কার্য্য প্রণালী সুশৃঙ্খল রূপে পরিচালন করিবার জন্য তাহারা কতকগুলি সাঙ্কেতিক নিয়ম বিধি বদ্ধ করে। এই সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই ভারতীয় ঠগ সম্প্রদায়ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক কার্য্য সমূহ সুশৃঙ্খলে

নির্ব্বাহ করিবার জন্য—কতক গুলি নিয়ম ও একটী ক্ষুদ্রতর সাঙ্কেতিক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। উহাদের এই সাধারণ দুর্ব্বোধ্য ঘোরতর রহস্য জড়িত ভাষার নাম—"রামসিয়ানা"। মেরুদণ্ড ও অস্থি পঞ্জরাদি যেরূপ মাংসপিণ্ডময় মানব শরীর চালনা কার্য্যে যথেষ্ট সাহয্য করে রামসিয়ানাও সেইরূপ ঠগসম্প্রদায়ের ঘৃণিত কার্য্যসমূহ সুকৌশলে সমাধা করিয়া দিত। এই অশ্রুত পূর্ব্ব ভাষার প্রতি পদে ঘোরতর রহস্য—এতদাদিষ্ট প্রত্যেক কার্য্যের মূলে ঘোরতর নৃশংসতা ও পৈশাচিকতা—ইহার প্রত্যেক শব্দসমষ্টির মুখে ঘোরতর চতুরতা। অতি সামান্য দৃষ্টিতেই ইহা বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

নানাবিধ বনস্পতি পূর্ণ দুর্গম অরণ্যানীকে পরমেশ্বর বিবিধ প্রকার হিংস্র শ্বাপদ সংকুল করিয়া সৃজন করিয়াছেন—মানব সম্প্রদায় এই সকল স্থানে বিচরণ না করিলেই তাহাদের জীবন রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু বহুজন পূর্ণ সমৃদ্ধি শালী নগর মধ্যে,—বহুদূর-বিস্তৃত-পথিক-পরিপুরিত প্রকাশ্য রাজপথে, বা প্রান্তরে—মানব দেহ ধারী এমন এক হিংস্র সম্প্রদায় অবাধে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিত—যে তাহাদের হিংস্র স্বভাবের মুখে পড়িলে কোন পান্থেরই পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় ছিল না। ইহারা যে কি এক প্রকার রাক্ষসী-মায়ায় আবৃত হইয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া আত্ম স্বভাব গোপন করিয়া থাকিত; তাহার ইয়ত্তা করা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির ও সীমা বহির্ভূত।

দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির অনেক উপায় আছে—নিশীথ বিহারী, গুপ্ত হত্যাকারী ক্রূর তস্করের শাণিত ছুরিকা হইতেও পরিত্রাণ পাইবার উপায় আছে—কিন্তু ঠগী সম্প্রদায়ের লোক অনুসরণ করিলে—তাহাদের চত্বর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া এক সময়ে অতীব দুরূহ ব্যাপার ছিল। পাঠক! ঠগদিগের অদ্ভুত-রহস্য-জড়িত, বিভীষিকাময় কার্য্য প্রণালীর যতই পরিচয় পাইতে থাকিবেন—ততই এই বিশ্বাস আপনার মনে দৃঢ় বদ্ধ হইবে।

ঠগী সম্প্রদায়ের প্রথম উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে, ঐতিহাসিক মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহা সম্যক রূপে স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। অনুমান ও অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহারা ভারত বর্ষে দৃঢ় মূল হইয়াছে। হিন্দুরাজত্বে ছিল কিনা জানি না—কিন্তু মুসলমান রাজত্বে ইহাদের প্রভাব অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থলে এমন কি দিল্লী ও আগ্রার অতি সান্নিধ্যেও ইহাদের সর্ব্বদা গতি বিধি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী থিভোনাট, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া স্বলিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে, ঠগী সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়াছেন। এক স্থলে এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"They (Thugs) use a certain rope with a running noose which they can cast in so much sleight

about a man's neck that they never fail."

ইহা হইতেই বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়—মোগল বাদসাহ দিগের শাসন কালে ঠগী-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে অতিশয় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

ঠগী ভারতবর্ষে যে প্রথম উৎপত্তি হয় নাই—তৎসম্বন্ধেও দুই একটী প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। ষ্ট্রাবো, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে—পারস্য ভূমিতে Xerxes এর সৈন্য দলে ঠগজাতীয় এক প্রকার সৈন্য ছিল। ইহারা ফাঁস লইয়া যুদ্ধ করিত। ফাঁস পাকাইয়া তাহা এত দূর কৌশলের সহিত বিপক্ষের অশ্ব ও অশ্বারোহী দিগকে এককালে ধরাশায়ী করিত যে তাহা শুনিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ঘটনা ও মেজর শ্লিমান (Sleeman) কথিত কাহিনী অনুসারে আমারা কতকাংশে স্থির করিতে পারি যে ভারতের অপর পার্শ্ব হইতে এই সম্প্রদায় ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া এ দেশে ক্রমশঃ বল সঞ্চয় করিয়াছে ও অনার্য্য সম্প্রদায় কর্তৃক এদেশে প্রথম প্রচলিত হইয়াছে।

অ[illegible] ব্যাপার সম্বন্ধে শ্লিমান, ভারতীয় গণের চক্ষে যেরূপ ঘোরতর কলঙ্কিত হইয়াছেন—ঠগীর ন্যায় নৃশংস নরহত্যাকারী সমাজের ধ্বংশ সাধন করিয়াও অপর পক্ষে তাহাদের নিকট তদ্রূপ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারই সহায়তায় তাঁহারই—জীবন ব্যাপী পরিশ্রমে, তাঁহারই অদমনীয় উদ্যমে ভারতে ঠগী সম্প্রদায়ের মূলচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ঠগী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিপি পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহার সময়ে—অর্থাৎ কোম্পানীর রাজত্বের শেষভাগে উত্তরে হিমাচল হইতে—সুদক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, ও পশ্চিমে কচ্ছ হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত ভারতের সকল প্রদেশেই—ঠগীর প্রাদুর্ভাব ছিল। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, রাজপুতনায়, ও বেহার বাঙ্গালা প্রদেশে, ইহাদের প্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রতিদিন এই সকল নৃশংস নরঘাতকদিগের দ্বারা সমস্ত ভারতে বোধ হয়—৪।৫ শত নর হত্যা হইত।* এ সমস্ত বিষয় কল্পনার চক্ষে দেখিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে—আতঙ্কে হৃদয়ের আমূল কম্পিত হয় এবং পুণ্য ভূমি ভারতে যে এই নৃশংস নরঘাতক সম্প্রদায় এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া ঘোর অনিষ্ট সংসাধন করিয়াছিল ও কেহই তাহাদের উন্মুলিত করিতে পারেন নাই ইহাতে মোগল বাদসাহ ও ভারতীয় সমস্ত রাজগণের অক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ ঠগী সম্প্রদায় ভারতের পক্ষে পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া ভারতীয় জনসাধারণের যে প্রকার ক্ষতি সংসাধন করিয়াছে সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ ও নাদের সাহের নৃশংস আক্রমণে তাহার এক চতুর্থাংশও ক্ষতি হয় নাই।

* এই অমানুষিক উপায়ে নরহত্যা দ্বারা ইহারা এত উপার্জ্জন করিতেছিল—যে দাক্ষিণাত্যের কেবল খান্দেশ ও কর্ণাট প্রদেশ হইতেই ১৮২৬ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ইহাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।

অক্ষত প্রতাপশালী মোগলবাদসাহদিগের আমলে এবং অমিততেজা ব্রিটিশ সিংহের শাসনকালে—অরাজকতা না থাকিলেও—কি প্রকারে ভারত বক্ষে ঠগ-সম্প্রদায় এইরূপ পরিপুষ্টি লাভ করে—ইহা ভাবিতে গেলে আপাততঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এত পুলিযের সুবন্দোবস্ত,—কোতোয়ালির এত হৃৎকম্পকারী ক্ষমতা থাকিতেও—কি প্রকার তৎকালীন রাজপুরুষ দিগের চক্ষে ধূলি দিয়া ঠগ সম্প্রদায় আপনাদের দলপুষ্টি করিয়াছিল তাহার কয়েকটী কারণ আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। প্রথমতঃ উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী দিগের নিকট হইতে সহায়তা লাভই তাহাদের ক্ষমতা সঞ্চয়ের প্রধান কারণ। যাহারা রক্ষক—তাহারা ভক্ষক হইলে রক্ষার কোন উপায়ই নাই। বাহিরের চোর হইলে বরঞ্চ উদ্ধারের উপায় আছে—ঘরের চোরের হস্তে কোন রূপেই পরিত্রাণ নাই। ঠগেরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও লুণ্ঠিত দ্রব্য দিয়া প্রাদেশিক মোগল শাসন কর্ত্তা, অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ও কখন কখন স্থানীয় রাজগণকে বশীভূত করিত। অনায়াস-লব্ধ প্রচুর অর্থ ও অন্যান্য বহুমূল্য মণি মুক্তাদির লোভে তাঁহারাও ঠগদিগকে কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতেন না। সুতরাং তাহারা বিনা বাধায় বিনা আপত্তিতে আপনাদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত—মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে, ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বর্দ্ধিষ্ণু সামন্ত রাজগণ কেবল স্ব স্ব রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ ও সন্নিহিত রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে পরিব্যাপ্ত থাকিতেন—বাহ্যিক বিষয়ে তাঁহাদের অধিকতর ব্যস্ত থাকিতে হইত সুতরাং কোন প্রকার আভ্যন্তরিণ বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগ প্রদান করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা উল্লিখিত প্রকারে উৎকোচ খাইয়া ঠগীদিগকে প্রশ্রয় দিত। তৃতীয়তঃ তৎকালে ভারতের কোন প্রদেশেই—আজকালের ন্যায় গতায়াতের সুবিধা ছিলনা। প্রকাশ্য রাজপথও সম্যকরূপে বিপদ পরিপূর্ণ ছিল—গবর্ণমেণ্টের মালামাল যে রাস্তায় চলিত—তাহা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সুবিধাজনক ছিল বটে—কিন্তু তদবলম্বনে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে সাধারণ পথিকদিগকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইত; অথচ অপ্রশস্তবনপথ দিয়া যাতায়াত করিলে—দূরত্বের ওপরিশ্রমে অনেক লাঘব হইত—এমন কি ইহা দ্বারা অর্দ্ধেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত সুতরাং যাহারা পদব্রজে যাইত—তাহারা প্রায়ই বন পথ আশ্রয় করিত। এই বনপথ ধরিয়া গমনাগমনকালে পথিকগণ অনেক সঙ্গী পাইত—আশ্চর্য্যের বিষয় এই—সঙ্গীদের মধ্যে অনেক গুলিই ব্যবসাদার ঠগ!! ইহারা সুবিধা পাইলে তাহাদিগকে সেই বনপথে বিনাশ করিত—এবং মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া নিহত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন কথাই বাহিরে যাইতে দিত না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও শোচনীয় কারণ এই যে স্থানীয় জমীদার ও বড় বড় ব্যবসায়ীগণ—অসংকুচিত চিত্তে ইহা-

দিগকে সাহায্য করিতেন। ইহাদের—ও অনেক উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর সহায়তায়—ঠগ সম্প্রদায় এক স্থানে বহুকাল নির্ব্বিঘ্নে বাস করিত—এবং এতদপরিবর্ত্তে উক্ত ক্ষমতাপন্ন ঠগ দিগকে তাহাদের অসদুপায়োর্জ্জিত ধন রাশির অংশ প্রদান করিত। এই প্রকার উৎকোচ প্রদান প্রথা—কেবল যে বাদসাহী আমলেই ছিল এরূপ নহে। সুসভ্য ইংরাজ শাসনেও ইহা সম্যক রূপে লোপ পায় নাই *। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী ও ফকিরদিগের নিকট—হইতে এই নরঘাতক সম্প্রদায় অনেক সাহায্য পাইত। দোকানদার ও সরাইয়ের অধিকারিরাও ইহাদিগকে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়া ইহাদের লাভের অংশী হইত। এমন কি পান্থশালার মধ্যে হতভাগ্য পান্থদিগকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া সেই কথা প্রকাশ হইবার ভয়ে সেই সরাইয়েব মধ্যেই তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিত। কি নৃশংস ব্যাপার! স্মরণেও হৃৎকম্প হইয়া উঠে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—অর্থাৎ সেই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ বর্জ্জিত হাঁটাপথের দিনে—সরাই বা পান্থশালাই, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত পথিকের এক মাত্র আশ্রয় স্থান ছিল। যখন সেই পান্থশালার মধ্যেই অসন্দিগ্ধ চিত্ত পথিক দিগকে, শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় এইরূপ বধ করা হইত—তখন ব্যাপারটা যে কি ভয়ানক তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী ও ফকিরদিগের নিকট হইতেও ঠগেরা অনেক সাহায্য পাইত। পূর্ব্বে যে বনপথের কথা বলা হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুই চারি জন মঠ ধারী সন্ন্যাসী বাস করিত। ইহারা ক্ষুদ্র উদ্যান প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফলপূর্ণ বৃক্ষ, ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করিয়া সুমিষ্ট জল রক্ষা করিত। নিদাঘার্ত্ত পথশ্রান্ত পান্থ উপস্থিত হইলে অতিথি বলিয়া—তাহাকে সমাদরে ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় প্রদান করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিত। এ প্রকার সদাশয়তায়, মহানুভবতায় কে না ভুলিয়া যায়? কে না প্রাণপণে সেই গভীর বন প্রদেশস্থ একমাত্র আশ্রয় দাতার সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া পড়ে?

* মোগল রাজত্বের কথা দূরে যাক্—সুসভ্য সুশাসিত, শান্তিময় ইংরাজ রাজত্বে রাজকর্ম্মচারিগণ কি প্রকার অসঙ্কুচিত প্রাণে ইহাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করিয়া ইহাদের কার্য্যে যোগদান করিতেন তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনা হইতে বিশেষ রূপে প্রমাণ হয়। হরি সিংহ নামে এক জন সওদাগর অতিশয় ধন সম্পন্ন ও প্রকারান্তরে একদল ঠগীর অধিনায়ক ছিলেন। কতক গুলি বহু মূল্য দ্রব্য সহ এক জন বণিক বন্দর পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাণিজ্যার্থে আগমন করিতেছে—এই কথা হরি সিংহ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হন। তিনি এক উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারির সহায়তায় অতি সহজে এক খানি ছাড বাহির করিয়া লইলেন। ছাড়ের মর্ম্ম এই যে—শীঘ্রই তাঁহার কতকগুলি মাল আসিয়া সেই নগরে উপস্থিত হইবে। ইত্যবসরে তিনি এক দল লোক পাঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত বণিককে পথিমধ্যে সদলে নিহত করিলেন। কার্য্যটা এত সুশৃঙ্খলে সমাধা করা হইল যে কেহই তাহা জানিতে পারিল না। পরের দ্রব্য এইরূপ অমানুষিক উপায়ে লাভ করিয়া কতিপয় দিবস পরে প্রকাশ্যরূপে তিনি হিঙ্গলি ক্যান্টনমেণ্টের বাজারে সেই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলেন। সত্য ঘটনা যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গেল। কিন্তু এই হরিসিংহই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মেজার শ্লিমানকে এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলেন শ্লিমান ও কথাটা শুনিয়াই স্তম্ভিত ও হত বুদ্ধি হইলেন। বস্তুতঃ সুসভ্য ইংরাজ শাসনেও তখন এই সমস্ত ব্যাপার নিত্যকার্য্য মধ্যে গণিত হইয়াছিল—

হতভাগ্য পথিক ক্রমশঃ তাহার মিষ্ট কথায় ভুলিয়া আত্ম সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আরম্ভ করিত। অতিথিপরায়ণ ভাক্তধার্ম্মিক সন্ন্যাসীও তাহার গন্তব্যস্থান, যাত্রার উদ্দেশ্য, প্রভৃতি নানাবিধ সন্ধান তাহার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইত ও অবসর ক্রমে তাহার স্বরক্ষিত ঠগদলের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিত। গভীর নিশীথে, পথের শ্রান্তিতে, যখন সেই নিরীহ হতভাগ্য পান্থ ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িত, সেই সময়ে কয়েক জন হত্যাকারী নিশব্দপদ-সঞ্চারে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফাঁস দ্বারা সেই নিদ্রিত আশ্রয়হীন শ্রমক্লান্ত পথিককে হনন করিত। হত্যার পর প্রথমত সমাধি—সুতরাং এই ভয়ানক কথা কখন ও সেই কুটীরের বাহির হইত না। এই রূপে কত শত হতভাগ্য পথিক এই প্রকার ভাক্তধার্ম্মিকের প্রলোভনে ভুলিয়া পরিশেষে শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিত তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ধর্ম্মের পবিত্র আচ্ছাদনে ধর্ম্মানুমোদিত অতিথি সেবার ছলে—কত শত লোককে যে এইরূপে হত্যা করা হইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীরঙ্গ পত্তন জয়ের পূর্ব্বে (১৭৯৯ খৃঃ অব্দে) ভারতে ঠগীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইংরাজেরা অত্যল্প সন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু শ্রীরঙ্গ পত্তন জয়ের পর কতক গুলি ঠগ ঘটনাবশে ধরা পড়াতে ইংরাজের এ বিষয়ে প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মে। অবশেষে ইহার পর এমন একটী ঘটনা ঘটিল যে ভারতে ঠগী সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

আমার বর্ম্মায় চাকরী।

২

রেঙ্গুনে।

আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু রেঙ্গুনে বড় চাকরী করেন; আমার পৌঁছিবার সংবাদ পুর্ব্বেই তাঁহাকে টেলিগ্রাফ্ করা হইয়াছিল। সে দিন রবিবার. তাঁহার আফিসের ছুটি—তিনি যথা সময়ে জেটিতে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং এক খানি ভাড়াটে গাড়ীতে আমার সমস্ত জিনিষ পত্র উঠাইয়া দিয়া আমাকে এবং আমার সহযাত্রী দুই এক জন বাঙ্গালীকে লইয়া বাসায় চলিলেন।

দুই শ্রেণীর ভাড়াটে গাড়ি রেঙ্গুনে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম ও দ্বিতীয়। গাড়ী গুলি ছোট কিন্তু বড় পরিষ্কার ; সকল গুলি নুতন বলিয়া বোধ হয় এবং দূর হইতে দেখিলে ছোট ছোট ব্রুহাম বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। গাড়ী গুলি প্রায়ই একটা

ঘোড়াতে টানে, ঘোড়া গুলা বর্ম্মা পনি—দেখিতে ছোট কিন্তু বেশ সবল। এখানে মান্দ্রাজীরাই প্রায় গাড়ী হাঁকাইয়া থাকে; ইহারা বর্ম্মা, ইংরাজি ও তামিল ভাষা বুঝিতে পারে, অনেকেই হিন্দি বুঝিতে পারে না। বদমাইসিতে ইহারা কলিকাতার গাড়োয়ান দিগের অপেক্ষা কিছুতেই কম নহে।

জেটিতে আরও কয়েকটী ভদ্রলোক আমাদিগের আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে চাকরি করেন, এক জন মাত্র উকিল ছিলেন। যে যে দিন কলিকাতার জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছে, ইহাঁরা সেই সেই দিন জেটিতে গমন করেন এবং পরিচিত অথবা অপরিচিত যে কোন ভদ্র বাঙ্গালী রেঙ্গুনে আগমন করেন, অতি সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া যান এবং বাসা প্রভৃতির সুবন্দোবস্তকরিয়া নবাগত ব্যক্তিকে প্রথম বিদেশ আগমন জনিত ক্লেশ অনুভব করিতে দেন না। এ পর্য্যন্ত যে কেহ রেঙ্গুনে গিয়াছেন সকলকেই উল্লিখিত উন্নতচরিত্র ব্যক্তিদিগের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং এই সদনুষ্ঠানের জন্য সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। আমার বাঙ্গালী সহযাত্রীরা সকলেই আমার সঙ্গে আমার বন্ধুর বাসায় যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল ভদ্রলোকদিগের অনুরোধে কয়েকজন তাহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

রেঙ্গুন একটী বড় সহর—কলিকাতা অপেক্ষা ছোট হইলেও ইহাকে একটি বড় সহর বলিতে পারা যায়। সমুদ্রতীর হইতে একুশ মাইল উত্তরে ইহা রেঙ্গুন নদীর উপর অবস্থিত। রেঙ্গুন নদী ইরাবতীর একটি শাখা, প্রোম নগরের নিকট ইরাবতী হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদী দিয়া সমুদ্র হইতে বড় বড় জাহাজ গুলি সকল সময়েই রেঙ্গুন নগর পর্য্যন্ত যাইতে পারে; কিন্তু আরো উত্তরে নদী তত গভীর নহে বলিয়া বড় জাহাজ চলে না। উখান, মাগরি, মভি এবং লিঙ্গুন এই চারিটি ইহার প্রধান শাখা নদী। পশ্চিমে ভলে, পালেঙ্গ এবং অন্যান্য কয়েকটি খাল রেঙ্গুন নদীকে ইরাবতীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে পেগু নদী পেগুইয়োমা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া রেঙ্গুন সহরের নিকট রেঙ্গুন নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে ছোট ছোট ষ্টিমার গুলি পেগু নদীর উপর দিয়া পেগু সহর পর্য্যন্ত যাইতে পারে।

রেঙ্গুনের রাস্তা গুলি খুব প্রশস্ত—দুই পাশেই ফুট পাথ—দুই ধারেই বড় বড় বাড়ী এবং প্রায় সকল গুলিই ব্যবসার স্থল। পথ গুলির দুই পার্শ্বেই অগনিত বৃক্ষ শ্রেণী—তাহাদের শাখা প্রশাখা গুলি দুই ধার হইতে আসিয়া মধ্য স্থলে মিলিত হইয়া খিলানের আকার ধারণ করিয়াছে এবং ছায়া প্রদান করিয়া পথিককে আতপ ও বরিষা হইতে রক্ষা করিতেছে। দুই পার্শ্বে এইরূপ বড় বড় গাছ আছে বলিয়া রেঙ্গুনের রাস্তাগুলি দেখিতে অনেকটা বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মত।

রেঙ্গুনে অধিকাংশই কাঠের বাড়ী; সব গুলিই প্রায় দ্বিতল, মেঝে, দেয়াল, ছাদ,

বারাণ্ডা সকলই কাঠের তৈয়ারি। অনেকগুলি বাড়ীর ছাদ খাপরা দিয়াও প্রস্তুত। আজ কাল রেঙ্গুনে অনেক পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে; গভরমেন্টের আফিস্ গুলি প্রায়ই পাকা এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বণিকদিগের কারখানাও পাকা করিয়া নির্ম্মিত; কিন্তু ছাদ গুলি বিলাত কিম্বা বোম্বাইয়ের বাড়ীর মত দুই ধারে গড়ান। এত কাঠের বাড়ী আছে বলিয়া মধ্যে মধ্যে রেঙ্গুনে ভয়ঙ্কর অগ্নি কাণ্ড উপস্থিত হয় এবং সহরের এক এক অংশ একেবারে সমভূম হইয়া যায়। এই কারণেই আজ কাল রেঙ্গুনে অনেক পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে।

কলিকাতার ন্যায় রেঙ্গুনেও ট্রামওয়ে চলিতেছে। গাড়ি গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অপরিষ্কার; বসিবার স্থানে চিটে পড়িয়া আছে, বসিলেই কাপড়ে দাগ ধরিয়া যায়।

রেঙ্গুনের রাস্তায় কেরোসিনের আলো দেওয়া হয় এবং জলের কল বসান আছে। রেঙ্গুন সমুদ্র হইতে বেশী দূর নহে বলিয়া এইস্থানে নদীর জল বড় লোনা, পানের উপযোগী নহে। রেঙ্গুন হইতে কিছু দূরে অবস্থিত একটি হ্রদ (Royal Lake) হইতে জল আনিয়া নলের দ্বারা সহরের সর্ব্বত্র চালিত হয় এবং ঐ জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। রয়াল লেক একটী বিস্তৃত জলাশয়; প্রবাদ আছে যে রেঙ্গুনের সর্ব্বপ্রধান দেবমন্দির সোয়েডাগন নির্ম্মিত হইবার সময় এইস্থান হইতে মাটি কাটা হইয়াছিল এবং তাহাতেই এই হ্রদের উৎপত্তি। রেঙ্গুন সহর অপেক্ষা এই জলাশয় উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, সেইজন্য কোন কলের সাহায্য ব্যতিরেকে জল আপনা হইতে নলে চলিয়া আসে। রেঙ্গুন হইতে কয়েক মাইল দূরে কোকাইনা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে; সেটি রয়াল লেক হইতে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নল দিয়া উক্ত জলাশয় হইতে রয়াল লেকে জল আনীত হয়; নলের মুখে একটি ছাঁকন বসান আছে।

রেঙ্গুনে অনেকগুলি বড় বড় বাজার আছে, তন্মধ্যে মিউনিসিপাল, হোলসেল এবং সুরাটি এই তিনটি বাজারই প্রধান। কলিকাতার প্রায় সমস্ত সামগ্রীই এখানে পাওয়া যায়। সুরাটি বাজারে রেশমী কাপড় অধিক পরিমানে বিক্রয় হইয়া থাকে। আজকাল ক্ষীরের জিনিস, সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন রেঙ্গুনে প্রস্তুত হইতেছে—দর কলিকাতা অপেক্ষা বেশী। শুনিলাম রেঙ্গুনে পটল পাওয়া যায় না। এখানে সকল দ্রব্যই এমন কি কাঁঠালের কোয়া পর্য্যন্ত ওজন দরে বিক্রয় হয়; মাছ মাংস, ঘি, চিনি, ময়দা, আলু প্রভৃতি সকল জিনিষেরই দর কলিকাতার অপেক্ষা বেশী। এখানে সের দরে জিনিস বিক্রয় না হইয়া বিশাদরে বিক্রয় হয়, সাত পোয়াতে এক বিশা হয়। বিশেষতঃ দুগ্ধ বড় মহার্ঘ, এক টাকায় তিন সেরের অধিক পাওয়া যায় না। এখানে বোতলে করিয়া দুধ বিক্রয় হয়, এক এক বোতলে তিন পোয়া দুধ থাকে; এইরূপ চারি বোতল দুধ এক টাকায় পাওয়া যায়।

বাজারে বিক্রেতা অধিকাংশই যুবতী রমণী (অবশ্য ব্রহ্মদেশীয়)। ইহারা অতি

পরিপাটীরূপে বেশভূষা করিয়া হাস্যমুখে ক্রেতাকে আহ্বান করে; সুতরাং ক্রয় করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও শুদ্ধ রমণী-গৌরব রক্ষার জন্য অনেককেই কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়। এখানে সামগ্রী নিজের গুণে বিক্রীত না হইয়া অনেক সময়ে বিক্রেতার গুণে ক্রেতার গৃহে গমন করে।

রেঙ্গুনে গমন করিলে প্রায় সকল জাতিরই মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বর্ম্মা, ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী, পার্সি, চিনেমান, জাপানী প্রভৃতি সকল জাতিই ব্যবসা এবং চাকরি উপলক্ষে রেঙ্গুনে বাস করে। বর্ম্মার দেশ হইলেও ব্যবসার স্থলে বর্ম্মা অপেক্ষা ভারতবাসীদিগকে (বিশেষতঃ মান্দ্রাজী) অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

রেঙ্গুন সহরের অধিবাসী সংখ্যা ১৩৪,১৭৬ তন্মধ্যে ইউরোপীয় ৩৩৬৬; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৭০৬, দেশীয় খৃষ্টান (অধিকাংশই বর্ম্মা) ৩৬৬৯, হিন্দু ৩৫৮৭১, মুসলমান ২১১৬৯, পার্সি ২১০, বৌদ্ধ ও জৈন (বর্ম্মারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত) ৬৭১৩১ এবং অসভ্য জাতি ৩৪ জন। উল্লিখিত অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে পুরুষ ৭৯২২৯, স্ত্রীলোক ৩০৬১৭, বালক ১২২৭৫, এবং বালিকা ১২০৫৫। হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে মান্দ্রাজীর সংখ্যাই অধিক; ইহারা সকল কার্য্যই করিতে সক্ষম, অবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যবসার পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না; উচ্চ পদ ছাড়িয়া খানসামাগিরি করিতে হইলেও বিশেষ অপমানিত বোধ করে না। রেঙ্গুনে আজ কাল বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে; প্রতি সপ্তাহে অনেক বাঙ্গালী চাকরী ও ব্যবসা উপলক্ষে এমন কি উমেদার হইয়াও রেঙ্গুনে গমন করিতেছেন। কেহ কেহ আবার পরিবার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। পশ্চিমে স্থানে স্থানে যেমন এক একটি বাঙ্গালীটোলা আছে রেঙ্গুনেও একটী পল্লী সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেঙ্গুনবাসী বাঙ্গালীদিগের কথা পাড়িলেই তাঁহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে দু একটা কথা না বলিলে চলে না। নবাগত বাঙ্গালীর অভ্যর্থনা উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্বেই রেঙ্গুন-বাসী কয়েকজন বাঙ্গালীর উদার প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। যে সমাজে এইরূপ দুই একজনও মহানুভব ব্যক্তি আছেন, সে সমাজ সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ তহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে রেঙ্গুন-বাসী বাঙ্গালীর চরিত্র প্রশংসনীয় নহে, অবশ্য সকল বাঙ্গালীই এই শ্রেণী ভুক্ত নহে কিন্তু অনেকেরেই যে চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ আছে; ১ম--বিদেশে থাকিতে হইলে সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং সমাজ নিন্দিত কার্য্য করিতে মনে ভয় বা লজ্জা অল্প হইবারই কথা; ২য়। অভিভাবক বা গুরুজন নিকটে থাকিলে চরিত্র সম্বন্ধে সকলকেই সাবধানে চলিতে হয়; কিন্তু রেঙ্গুনে অভিভাবক সঙ্গে লইয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠে না; ৩য়—স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে চরিত্রে সহজে দোষ স্পর্শ করে না, কিন্তু রেঙ্গুনে চাকরি করিতে গেলে বেশী খরচ, সমুদ্র গমন, ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধক

নিবন্ধন অনেকেই সস্ত্রীক গমন করেন না; ৪র্থ—রেঙ্গুনে প্রলোভনের সামগ্রী অন্য স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থাৎ সহজেই—লভ্য। রেঙ্গুনের অনেক বাঙ্গালীই সুরাপান ও ব্যভিচার দোষে দোষী; বিশুদ্ধ চরিত্র নবাগত ব্যক্তি দলে পড়িয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠেন। যাঁহারা প্রথম রেঙ্গুন যাইতেছেন তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য উপরে কয়েকটি কথা লিখিত হইল।

রেঙ্গুনের প্রাচীন ইতিবৃত্ত। অতি প্রাচীন সময়ে তৈলঙ্গ বংশীয়েরা মান্দ্রাজ প্রদেশান্তর্গত উত্তর সরকার হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া দক্ষিণাংশ জয় করেন এবং পেগুদেশে আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫৮৫ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক রেঙ্গুন সহর যে স্থানে অবস্থিত, সেস্থানে ডাগন নামে এক খানি সামান্য গ্রাম প্রথম স্থাপিত হয়। পূ এবং তপা নামক দুই ভ্রাতা এই গ্রাম সংস্থাপন করেন। ইঁহারা সম্ভবতঃ তৈলঙ্গবংশীয়, ইঁহারা বুদ্ধদেবের সমকালিক ছিলেন এবং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এই স্থানে সোয়ে ডাগন নামক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার মস্তকের কতকগুলি কেশ এই মন্দিরে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এই মন্দির আজিও রেঙ্গুনে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশে ইহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় দেবালয় নাই। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, আজিও ইহা গগন-ভেদী স্বর্ণ-চূড়া উত্তোলন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ সমীপে প্রচার করিতেছে। পুন্যরীক নামক এক ব্যক্তি ৭৪৬ হইতে ৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেগুদেশের অধিপতি ছিলেন; তিনি এই গ্রামের ডাগন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অরমান রাখিয়া ছিলেন এবং গ্রামের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্প দিন পরেই আবার ইহা পুরাতন নামে খ্যাত হয়। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেগু তৈলঙ্গ রাজাদিগের অধীনে ছিল এবং ডাগন পেগুদিগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মারা প্রথমে পেগু অধিকার করে এবং ডাগন ও তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল। ব্যানিয়াকিন্ নামক ব্যক্তির উপর প্রথম এই প্রদেশের শাসনের ভার সমর্পিত হয়; শিংশবু নামক এক তাঁহার ভগিনী ডাগনে একটী বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। শিংশবুর স্মরণার্থ আজি ও রেঙ্গুনে একটী মেলা হইয়া থাকে। কাল সহকারে ডাগন পুনরায় অত্যন্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কতকগুলি সামান্য কুটীর ভিন্ন আর কিছুই এ গ্রামে দৃষ্ট হইত না। নদীর অপর পারে সিরিয়াম নামক এক খানি গ্রাম ছিল; সে খানি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী, এ স্থানে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজ, পোর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের বাণিজ্যের কুঠি অবস্থিত ছিল। এই সকল কুঠির অধ্যক্ষদিগের পেগুর অধিপতির সহিত কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে ডাগনের শাসনকর্ত্তা মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। ইয়ুরোপীয়েরা স্ব স্ব জাতির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন এবং সেইজন্য সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত

হইত; ডাগনের শাসনকর্ত্তা পেগুর অধিপতির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগের সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন।

প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া তৈলঙ্গ ও বর্ম্মা উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিয়া ছিল; এই সময়ের মধ্যে ডাগন কখন বা তৈলঙ্গ শাসনে, কখন বা বর্ম্মাদিগের অধীনে থাকিত। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে অলঙ্গবুড়া নামক একজন বর্ম্মা নৃপতি আভা নগরী হইতে তৈলঙ্গীয় দিগকে দূরীভূত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং ডাগনে আগমন করিয়া ভগ্নপ্রায় সোয়েডাগনদেবমন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। অলঙ্গবুড়া ডাগন নগরকে নূতন করিয়া নির্ম্মিত করিয়াছিলেন; তিনি অনেক গুলি গৃহ ও রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন এবং ডাগন নাম উঠাইয়া এই নূতন নগরের নাম রেঙ্গুন রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মভাষার রেঙ্গুন অর্থে যুদ্ধাবশেষ; যুদ্ধের অবশেষ হইল মনে করিয়া তিনি নগরের এই নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই; ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমাগত এই স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিয়াছিল। উক্ত বৎসর এই নগর আবার তৈলঙ্গীয় দিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল কিন্তু অনধিক কাল মধ্যে ব্রহ্মরাজ ভোদোবুড়া এই নগর পুনরধিকার করেন।

এই সময়ে ইংরাজেরা রেঙ্গুনে একটি বাণিজ্যের কুঠি নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রথমেই ইংরাজের কুঠিতে ব্রিটিস পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান এবং চট্টগ্রাম লইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্রহ্মরাজের বিবাদ উপস্থিত হয়। আভানগরী তখন ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। কর্ণেল সাইন্‌স্ ইংরাজের দূত হইয়া আভানগরে গমন করেন এবং তাঁহার দৌত্য কার্য্যের ফলস্বরূপ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুননগরে একজন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। কর্ণেল সাইন্‌স্ রেঙ্গুন দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন; "রেঙ্গুন নদীতীরে অবস্থিত, দীর্ঘে ৩মাইল এবং প্রস্থে ১/৩ মাইল। যে স্থানটিকে প্রকৃত সহর বলা যায় তাহা চতুষ্কোন এবং বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। উত্তরে একটা অনতি বিস্তৃত পরিখা এবং তাহার উপরে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে। সহরের এই পার্শ্বে ভিতরে যাইবার জন্য দুইটি বৃহৎ দ্বার আছে; অপর তিন পার্শ্বে একটি করিয়া দ্বার রহিয়াছে। নদীতীরে কতকগুলি কুটীর এবং তিনটী জেটি আছেএবং একটি উচ্চ স্থানে ১২টী কামান পাতা রহিয়াছে; কামানগুলির অবস্থা ভাল নহে, যুদ্ধের সময় বোধ হয় কোন কাজে আসেনা। সহরের রাস্তাগুলি সরু এবং পেগুর রাস্তা অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইলেও পরিষ্কার এবং উত্তম রূপে বাঁধান। জল বাহির হইবার জন্য অনেক গুলি নর্দ্দামা আছে, নর্দ্দামার মুখগুলি তক্তা দিয়া ঢাকা। বড় বড় খুঁটি পুতিয়া মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় এবং মঞ্চের উপর সমস্ত বাস গৃহ নির্ম্মিত, ঠিক জমির উপর এ প্রদেশের লোকেরা বাস করেনা। রাজকর্ম্মচারী গণ, ধনী বণিক সম্প্রদায় এবং সম্ভ্রান্ত লোকে

সহরের অভ্যন্তরে বাস করেন, এবং হীন অবস্থার লোকেরা সহরের বাহিরে বাস করে। শূকরেরা যদৃচ্ছাক্রমে সহরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে—ইহাদিগের জন্য সহরে ময়লা থাকে না সুতরাং ইহারা সাধারণের একপ্রকার ভৃত্য। বর্ম্মারা বড় কুকুর ভালবাসে, রাস্তায় অগণ্য কুকুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্মরাজের প্রথম যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং রেঙ্গুন ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপন হয় এবং রেঙ্গুন পুনর্ব্বার ব্রহ্মরাজকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ধারাবতী রাজকুমার রেঙ্গুনের জীর্ণসংস্কার করেন এবং ইহার আয়তন দ্বিগুন বৃদ্ধি করেন। তিনি রেঙ্গুনের পরিবর্ত্তে এই নগরের নাম উকাপ্রভা রাখিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে ইংরাজদিগের সহিত দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং রেঙ্গুন পুনর্ব্বার ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়, তদবধি ইহা ইংরাজ দিগের শাসন ভুক্ত রহিয়াছে। অনেক বড় বড় রাস্তা ও বাড়ী সেই সময় হইতেই নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে।

আধুনিক রেঙ্গুন। রেঙ্গুন নগরের উত্তর প্রান্তে সেনা নিবাস অবস্থিত। পূর্ব্বে সোয়ে ডাগন নামক যে প্রকাণ্ড স্বর্ণচূড় দেবমন্দিরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই সেনা নিবাসের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধমণ্ডলীর একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান; নানা স্থান হইতে বৌদ্ধগণ এই তীর্থ সন্দর্শনে আগমন করেন। ইহার গঠন একটা প্রকাণ্ড গম্বুজের ন্যায়; চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট অনেক গুলি গম্বুজ বৃহৎ গম্বুজটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। গম্বজগুলির মস্তক স্বর্ণমণ্ডিত; সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করে। বড় গম্বুজটীর ভিতরে স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনের উপর স্বর্ণমণ্ডিত প্রস্তরের বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে,—অন্যান্য ছোট ছোট গম্বুজ গুলির ভিতর ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের মধ্যে পুরোহিত দিগের বাসের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। সর্ব্বদা ধূপ ধুনা জ্বালান হইতেছে বলিয়া মন্দিরের বায়ু অতি সুবাসিত ও স্নিগ্ধ। প্রতিমূর্ত্তির চতুষ্পার্শে রাত্র দিন দীপমালা জ্বলিতেছে এবং পুরোহিতেরা উচ্চ কণ্ঠে পালি ভাষার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছে। দূর হইতে পাঠ শুনিয়া বোধ হয় যেন আমাদিগের দেশের টোলে ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পাঠ করিতেছেন। ধূপ ধুনা পুষ্প চন্দনাদি সকলই মন্দিরের মধ্যে বিক্রীত হয়। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইল যে এই বৌদ্ধপ্রধান দেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম নামে রহিয়াছে; কার্য্যে ইহারা পৌত্তলিক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বে যে রয়াল লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ও সহরের উত্তর সীমায় অবস্থিত। এই হ্রদের চারি ধারে সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে; ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার সময় গাড়ী করিয়া ও পদব্রজে এই রাস্তায় বায়ু সেবন করেন।

সহরের মধ্যস্থলে রেলওয়ে ষ্টেশনে; এখানকার রেলওয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত, একটী প্রোম এবং অপরটী টঙ্গু (আজ কাল মান্দালয় অবধি) পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। সাধারণ কার্য্যালয়সমূহ রেঙ্গুনের মধ্যস্থানে অবস্থিত, এগুলির মধ্যে কাছারী, টাউন হল, তার ঘর, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল, রোমান কাথলিক ও আঙ্গিক্যান উপাসনালয়, কষ্টম হাউস প্রভৃতি উল্লেখের উপযুক্ত। ইহা ব্যতীত আরো কয়েকটী বড় সরকারী বাড়ী রেঙ্গুনে আছে যথা বাতুলাশ্রম, কারাগৃহ, হাঁসপাতাল, কৃষি-উদ্যান, ফেয়ার প্রদর্শিনী গৃহ, হাই স্কুল, সেণ্টজনস্ কলেজ, ডায়োসিসান স্কুল, থিওলিজিকাল কলেজ প্রভৃতি।

সহরের পূর্ব্ব দিকে নদীর ধারে কাঠ চিরিবার অনেক গুলি কারখানা আছে এবং মাঙ্কিপএণ্ট নামক স্থানে কতক গুলা কামান বসান আছে। এই স্থানে ধান হইতে খোসা ছাড়াইবার কতকগুলি কারখানা আছে।

রেঙ্গুনে একজন রেকর্ডার (Recorder) নিযুক্ত আছেন; তিনি কয়েকটী সহকারী মাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন; কেবল ফাঁসির হুকম দিতে হইলে জুডিসিয়াল কমিসনারের সহিত রেকর্ডার একত্রে বিচার করেন।

কলিকাতার ন্যায় রেঙ্গুন ও মিউনিসিপাল শাসনান্তর্গত। মিউনিসিপালিটী অনেক গুলি বাজার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে এবং রয়াল লেক হইতে সহরে পানীয় জল আনিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। রাস্তার আলো মিউনিসিপালিটী হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

রেঙ্গুনে পৌছিবার পর দিবস কোথায় যাই-বার হুকুম হয় জানিবার জন্য আফিসে যাইলাম। সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে আমাদের সকলকেই মান্দালয় যাইতে হইবে—নিম্ন ব্রহ্মদেশে ডাক্তারের প্রয়োজন নাই। তবে উত্তর ব্রহ্মদেশেরনিম্ন ভাগে টঙ্গু-ইনজি নামক একটি প্রদেশ আছে—সেখানে নূতন হাঁসপাতাল খোলা হইবে এবং একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জন ও একজন নেটিভডাক্তারের বন্দোবস্ত রেঙ্গুনের আফিস হইতে হইবে। কিন্তু—টঙ্গুইনজি কোন স্থানে অবস্থিত—নদী তীর হইতে কত দূর, জল বায়ু কিরূপ কিরূপ ডাকাতি চলিতেছে, কোন বাঙ্গালী আছে কিনা, যাইবার রাস্তা ঘাট কিরূপ এবং কি উপায়েই বা যাইতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কোন প্রশ্নেরই উত্তর আফিসের মধ্যে কেহই বলিতে পারিল না। আমার বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে সে স্থানে সম্প্রতি টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিস খোলা হইয়াছে এবং ট্রেজারি আফিস খুলিবার কল্পনা হইতেছে; কিন্তু সেখানে বড় গোলমাল চলিতেছে; সে দিন মিলিটারি পুলিসের একজন ইংরাজ ইনস্পেক্টরকে ডাকাতেরা খুন করিয়াছে; জনরব যে সেস্থানের চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ও পাহাড়। সংবাদের শেষ ভাগটী বড় আশাপ্রদ নহে বলিয়া কেহই সেস্থানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু মান্দালয় যাইলে হয়ত এই প্রদেশ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট স্থানে যাইবার হুকুম হইতে

পারে এই বিবেচনা করিয়া আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি এই স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইলাম এবং পরে জানিতে পারিলাম যে ঐস্থান পছন্দ করা ভাল হইয়াছিল কেননা উক্ত স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। একজন হিন্দু নেটিভডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া লইলাম--ইঁহার বাড়ী অযোধ্যায়, হিন্দুস্থানী কায়স্থ, ৯। ১০ বৎসর পশ্চিমে সরকারী হাঁসপাতালে চাকরী করিয়াছেন ; বয়স ২৯।৩০, বড় ভাল মানুষ —কিন্তু কিছু বেশী হিন্দু। নিজে ভেতো বাঙ্গালী, এক জন পশ্চিমে পালোয়ান সঙ্গে পাইয়া মনের ভিতর অনেকটা ভরসা হইল।

সেই রাত্রিতে রেঙ্গুন ছাড়িয়া উত্তর ব্রহ্মদেশে রওনা হইবার বন্দোবস্ত হইল। রাত্রি নয়টার সময় রেঙ্গুন হইতে মেলট্রেন প্রোম নগর যাত্রা করে—সেই ট্রেনে আমাদের যাওয়াই স্থির হইল। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বড় বাতাস উঠিল ; আমরা বৃষ্টি আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে আমাদের জিনিস পত্র গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া ছিলাম, পথে বৃষ্টিতে সকলেই ভিজিয়া গেল। বাতাসের এত জোর হইয়াছিল যে রাস্তার বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক জায়গায় গাছ সরাইয়া আমাদিগের গাড়ীর রাস্তা করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের কাপড় চোপড় খুব ভিজিয়া গেল, সেই ভিজা কাপড় লইয়া রাত্রি নয় টার সময় রেল গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ী হুস হুস করিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া চলিল। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালায় ইংরেজ বণিক সমিতির উপনিবেশ কলিকাতায় কেন নির্ব্বাচিত হইল।

বাঙ্গালায় বাণিজ্যাভিলাষে ইঙ্গরেজ বণিকগণের ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ হইতে যে সকল ঘটনা নিচয়ের পরিবর্ত্তনের পরে উক্ত জাতি কর্ত্তৃক পিপ্‌লি পাটনা এবং হুগলী প্রভৃতি স্থান সমূহে বাণিজ্য কুঠী সকল সংস্থাপিত হয়, এবং তৎপরে কি কি দৃশ্যাবলীর পরিবর্ত্তনে পরিশেষে তাহাদিগের দ্বারায় কলিকাতায় কিরূপে ইঙ্গরেজ-বণিক-উপনিবেশ আরোপিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জাতি বাণিজ্যাভিলাষী অন্যান্য বঙ্গদেশাগত ইউরোপীয় জাতির ন্যায় নদীর (ভাগীরথীর) পশ্চিম তীরে কলিকাতা অপেক্ষা অন্যান্য সমধিক সমুন্নত স্থান থাকা স্বত্বেও ঐ সকল স্থানের মধ্যে কোনটীকেও নির্ব্বাচিত না করিয়া হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্যবেষ্টিত অতীব অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি বিশিষ্ট ও ধান্য ক্ষেত্রযুক্ত ম্যালেরিয়ার আকর একটী সামান্য পল্লিগ্রামে আসিয়া কিজন্য উপনিবেশ সন্নিবেশিত করিল। তাহা ক্রমে বলিতেছি।

বাঙ্গালা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, যে সময়ে ইঙ্গরেজ বাণিজ্য করিতে বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করেন, সে সময়ে মুসলমান(মোগল)সাম্রাজ্যান্তর্গত স্থবা বাঙ্গালার মধ্যে হুগলী নদী অথবা ভাগীরথী তীরস্থ হুগলী নগরই বঙ্গদেশের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে ইঙ্গরেজ জাতির সৌভাগ্য ক্রমে কোন স্থভ ঘটনার অসম্ভাবী কারণে উক্ত বণিক-জাতী অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের ন্যায় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অথচ উহাদিগের অপেক্ষা অধিক স্থবিধাজনক স্থানে অর্থাৎ হুগলী নগরে ইঙ্গরেজ বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া স্থদৃঢ় রূপে অবস্থিতি করিতে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন; এবং উক্ত বাণিজ্য কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া স্থচারুরূপে বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন; এমন কি বণিকগণ আপনাদিগকে সকল প্রকার বিপদ হইতে নির্ব্বিঘ্ন জানিয়া ইষ্টকালয় সকল নির্ম্মাণ করিতে সাহসী হইয়া ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী কখন কাহার প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে সদয় থাকেন না। হুগলীতে কিছু দিন অবস্থিতির পর ইঙ্গরেজ ভাগ্য চক্র ঘুরিল। বাঙ্গালার নবাবের অভিমতে তাঁহার হুগলীস্থ প্রতি-নিধি শাসনকর্ত্তার বা ফৌজদারের প্রপীড়নে (যে যে কারণে ইহা ঘটে তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি, অতএব এস্থলে পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক) ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইঙ্গরেজ বণিকগণকে বাঙ্গালার বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী নগর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যদ্যপি ইঙ্গরেজ বণিকগণ হুগলী নগরে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত নগরের পরিবর্ত্তে অন্য কোন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেন না, কারণ হুগলী ইঙ্গরেজ বাণিজ্য পক্ষে দুই একটী বিষয়ে অস্থবিধা স্বত্বে ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে স্থবিধাজনক ছিল। কিন্তু যখন উক্ত বণিক গণ হুগলী নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন তাহারা যে স্থানটি তাঁহা-দিগের বাণিজ্যোপযোগী এবং বিপদ আপদ হইতে নির্ব্বিঘ্ন হইবে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন ইহা তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এস্থলে পাঠক দিগকে স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে ভাগীরথীর পথে সদা সর্ব্বদা গমনাগমন হেতু হুগলীর নিম্নে উক্ত নদীর উভয় তীরস্থ জন পদ সকলের বিষয় তাঁহারা বিদিত ছিলেন। ফল কথা স্থতানুটী গ্রাম যে তাহাদিগের বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী এবং অনেক প্রকারে স্থবিধা-জনক ছিল তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; সেই হেতু তাঁহারা শুতানুটী গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এস্থলে আর একটী বিষয় মনে রাখা উচিত যে, হুগলীর ঘটনা হইতেই নবাব ইঙ্গরেজ বণিক দিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন; সেই হেতু শুতানুটীতে অল্প দিবস অবস্থিতি করিতে না করিতেই নবাব পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইঙ্গরা-জের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এই সংবাদ পাইবা মাত্রই উহারা শুতানুটী পরিত্যাগ করিয়া হিজলীতে উপস্থিত হয়েন।

নবাব-সৈন্যের ভয়ে ভীত হইয়া শুতানুটী গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া অন্য কোন স্থানে গমন না করিয়া ইঙ্গরেজ বণিকগণের হিজলীতে যাইবার কারণ এই যে, উক্ত স্থানটী নিম্ন জলাযুক্ত এবং পানোপযোগী মিষ্টপেয় বিবর্জ্জিত হইলেও আপাততঃ নবাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভাগীরথীর সন্নিকট ব্যতিত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থান ছিল না; কারণ হিজলী স্থানটি দ্বীপাকার থাকা প্রযুক্ত ইঙ্গরেজ বণিকগণ য়ুরোপীয় সামরিক উপকরণের সাহয্যে নবাব সৈন্যের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা হিজলীর ভীষণ মারাত্মক অস্বাস্থ্যতার বিষয় অবগত থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় উক্ত স্থানে যাইতেন কিনা সন্দেহ। নবাব, ইঙ্গরেজ দিগকে হয় সমূলে বিনাশ অথবা বঙ্গদেশ হইতে এককালীন বিদূরিত করিবার জন্য যেরূপ দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, হিজলী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ইঙ্গরেজগণ নবাবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে হিজিলী অতি অস্বাস্থ্যকর ও নানা কারণে বাসঅনপোযোগী সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিতে তাহারা বাধ্য হইল। হিজলীতে অবস্থিতি করা যখন ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে উলুবেড়িয়াগ্রামে তাঁহাদিগের উপযোগী বিবেচনা করিয়া নবাবের অনুমত্যানুক্রমে উক্ত গ্রামে অবস্থিতি করিবার সঙ্কল্প করিয়া ডক্, ম্যাগ্যাজিন, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনতি কাল মধ্যেই এই স্থানটিকেও তাঁহাদিগের পক্ষে অসুবিধা জনক উপলব্ধি করিয়া পুনর্ব্বার শুতানুটী গ্রামে প্রত্যাগমনের বাসনায় নবাবের নিকট আবেদন করিলেন। আবেদন গ্রাহ্য হইল। মার্সম্যান সাহেব বলেন যে উলুবেড়িয়ার অস্বাস্থ্যতা বশতঃ চার্ণক সাহেব উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শুতানুটী গ্রামে গমন করেন। এই মতের উপর ষ্টারণ্ডেল সাহেব টিপ্পনী করিয়া বলেন যে, (১) উলুবেড়িয়া পরিত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজ গণের কিছু সুবিধা হয় নাই, কারণ হুগলী নগরের নিম্নে ভাগীরথীর তীরে শুতানুটী অপেক্ষা অধিক অস্বাস্থ্যকর স্থান একটিও ছিল না। শুতানুটী গ্রাম উলুবেড়িয়া অপেক্ষা সে সময়ে অস্বাস্থ্যকর থাকিলেও থাকিতেপারে (সম্ভবতঃ এই মতটি সম্পূর্ণ ভুল) কিন্তু উক্ত গ্রাম যে হুগলীর নিম্নে ভাগীরথীর তীরে সকল স্থান অপেক্ষা

(1) "It is stated by Marshman that the reason for Charnock leaving Ulubaria was the unhealthiness of that locality; but he certainly did not gain much in that respect by the change. Though allowed by the Nawab to choose any cite on the whole river. the salt water lake on the east, left masses of dead putrid fish as the water receded in the dry season, while Dense Jungle ran up to where Government House now stands." *Vide An Historical Account of the Calcutta Collectorate by Reginold Crafuird Sterndale p. 3.*

অস্বাস্থ্যকর ছিল এই সিদ্ধান্তটি তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক বলিয়া বোধ হয়। সে যাহাই হউক ঘটনা-স্রোতে বাধ্য হইয়া ইঙ্গরেজ বণিকগণ হিজলী উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যেখানে যাউন না কেন, যখন তাঁহারা হুগলী নগরে প্রত্যাগমন করা অসম্ভব জানিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে শুতানুটী গ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। উলুবেড়িয়া স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বলিয়াই যে ইঙ্গরেজগণ শুতানুটীতে গিয়াছিলেন তাহা নহে; এবং অস্বাস্থ্যকর হইলেও হিজলী অপেক্ষা নহে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। শুতানুটীর উপর ইঙ্গরেজ বণিক দিগের এত দূর ঝোঁক থাকিবার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল; নিম্নে আমরা সেই কারণ সমূহের উল্লেখ করিব।

ইঙ্গরেজ বণিকগণ উলুবেড়িয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শুতানুটী গ্রামে অল্প দিন অবস্থিতি করিবার পর পুনর্ব্বার নবাব কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্বের ন্যায় উহাদিগের প্রতি প্রপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং বোধ হয় পাছে ইঙ্গরেজ বণিকগণ নবাবের বিরুদ্ধে কোন রূপ বিপক্ষতাচরণ করিতে সক্ষম হয়েন, সেই হেতু হুগলীর ফৌজদারের করতলস্থ রাখিবার জন্য নবাব উহাদিগকে শুতানুটী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া হুগলী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এই সময়ে (১৬৮৮) ইঙ্গরেজ প্রতিনিধি বা এজেন্ট জব চার্ণক সাহেব শুতানুটী গ্রামে স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায়ে অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন সহ তাহার কার্য্যকারী সভার দুই জন সভ্যকে প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকা নগরে নবাবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শুতানুটীগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার জন্য ইঙ্গরেজ বণিকগণের কেন যে এত অধিক ঝোঁক ছিল, তাঁহার কারণ সমূহের মধ্যে কয়েকটি কারণ আমরা নবাব সমীপে উপরোক্ত আবেদিত পত্র মধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। উক্ত পত্রে এই কয়েকটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

১। হুগলী নগরে অবস্থিতি না করিয়া শুতানুটিগ্রামে থাকিলে উক্ত নগরের ফৌজদারের সঙ্গে কোন প্রকার সংঘর্ষণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

২। ভাগীরথীর গর্ভ ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকা পূর্ণ হইয়া আসা প্রযুক্ত বৃহদাকার বাণিজ্যতরী সকলের হুগলীনগরে আগমন করিবার পক্ষে দিন দিন সুকঠিন হইয়া আসিতেছে।

৩। এবং বৃহদাকার বাণিজ্যপোত সকলকে হুগলীনগরের পার্শ্বে লইয়া যাওয়ার পক্ষে ক্রমশঃ বিপদ জনক হইয়া উঠিতেছে। (২)

---

(2). "The object of the English in desiring to settle at Chuttaunttee was to avoid collision with the native authorities at Hughly as also on account of the gradual filling up of the river which rendered it daily more difficult and dangerous for large vessel to come up abrest of that town." Vide Stuarts History of Bengal p. 317-8 and Capdt". Broome's

উপরোক্ত কারণ কয়েকটি ব্যতীত আমরা অন্যস্থল হইতে সংগ্রহ করিয়া আর কতকগুলি কারণ পাঠকদিগকে দেখাইব। অধিক দিবস বাণিজ্যোপলক্ষে নিম্ন বঙ্গে অবস্থিতি করা প্রযুক্ত শুতানুটীগ্রামে বঙ্গে ইঙ্গরেজ-বাণিজ্য-কেন্দ্র সংস্থাপন করিবার পক্ষে ইঙ্গরেজ বণিকগণ উক্ত গ্রামটিকে অন্যান্য কি কি বিষয়ে সুবিধাজনক স্থির করিয়ছিলেন তাহা আমরা এই স্থলে বিবৃত করিব। দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশে প্রথমাগত ইঙ্গরেজ-বণিকদিগের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে এই প্রদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এরূপ একটী স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে হইবে যেখান হইতে।—

১। সমুদ্র সন্নিকট হইবে।

২। পণ্যদ্রব্যাদি সহজেই জাহাজে উঠান এবং নামান হইতে পারিবে।

৩। রাজকীয় বাণিজ্য পথ অতীব সন্নিকট হইবে।

৪। বঙ্গোপসাগর এরূপ নিকটে হইবে যে যথায় বৃহদাকার ইঙ্গরেজ বাণিজ্য তরী-সকল নির্ব্বিঘ্নে নঙ্গর করা যাইতে পারিবে।

৫। যে নদীতে বাণিজ্য করিতে হইবে উহা পূর্ব্ববঙ্গীয় আপদজনক ও শঙ্কাপূর্ণ ভয়ঙ্কর বৃহৎ নদীগুলির দোষ হইতে বর্জ্জিত হইবে।

উপনিবেশ সংস্থাপনের পক্ষে ইঙ্গরেজ বণিকগণ যে কয়েকটী গুণবিশিষ্ট স্থান অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহা উঁহারা শুতানুটীগ্রাম ব্যতিত অন্য কোন স্থানে দেখিতে পান নাই। (৩)

কলিকাতা অথবা শুতানুটীগ্রামে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্য উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা ব্যতিত কলিকাতার আংশি ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে জনৈক লেখকের পুস্তকে আর যে কয়েকটি কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিব। তিনি এই বিশেষ কারণ কয়েকটি নির্দ্দেশ করেন:—

যখন ইঙ্গরেজ বণিকগণ প্রথম স্থায়ীরূপে কলিকাতায় উপনিবেশ সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয়েন, তখন ঐ অল্পসংখ্যক বণিক অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির ন্যায় নদীর (ভাগীরথীর) পশ্চিমতীরে অবস্থিতি না করিয়া উক্ত নদীর পূর্ব্বতীরে একটী

History of the Rise and Progress of the Bengal Army. p. 19.

(৩) "Being easily accessible by sea, it was, in the first place chosen by the factors as a favourable spot for embarking and disembarking merchandise. The object in close proximity to the high way of commerce and within easy reach of the sea-board of the Bay of Bengal, where Indiamen could safely side at anchor, no spot presented so many facilities not the least being the immunity it enjoyed from the destructive agency of the large rivers of Eastern Bengal." *Vide Cooks Monthly Mail and Indian Advertiser. vol.* I. now *8 p.* 9.

সামান্য উন্নত ভূমিখণ্ডের উপর তাহাদিগের উপনিবেশ স্থল নির্ব্বাচিত করিয়া ছিলেন উক্ত লেখক বলেন যে:—

প্রথমতঃ। এই স্থানটী অনেকগুলি বহু-সংখ্যক লোক-বিশিষ্ট পল্লিগ্রামের সন্নিহিত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ। ঐ সকল গ্রাম তন্তুবায় দিগের বসতি পূর্ণ ছিল। ইঙ্গরেজ বণিক-গণ ঐ জাতির মধ্যে অনেককে ব্যবসায়ে অভ্যস্ত ও পারদর্শী জানিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে তাঁহাদিগের অধিনে বাণিজ্যকার্য্য চালাইবার জন্য নিযুক্ত করায় উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন।

তৃতীয়তঃ। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে মহারাষ্ট্রদিগের (৪) অত্যন্ত উৎপাৎ ছিল; বিশেষতঃ যাহারা ভাগীরথীর পশ্চিমপারে বসতি করিত তাহাদিগকে উক্ত জাতি কর্ত্তৃক সততঃ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। ফলে ঐ উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইঙ্গরেজ-বণিকগণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বপারে অবস্থিতি করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এবং

চতুর্থতঃ। কলিকাতার দিকে ভাগীরথীর গভীরতা অধিক থাকা প্রযুক্ত বাণিজ্যতরী সমূহ নোঙ্গর করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর উক্ত ইঙ্গরেজ বণিকগণ যে একটী সামান্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, ঐ স্থলের ঠিক নিম্নে জাহাজ নোঙ্গর করিবার পক্ষে যে প্রকার সুবিধাছিল ঐরূপ সুবিধা ভাগীরথীর নিম্নভাগে আর কুত্রাপি ছিল না। এবং কথিত ভূমিখণ্ডটি ক্রয় করিতেও উহাদিগের অধিক ব্যয় হয় নাই।

শ্রীঅঘরনাথ দত্ত।

৪)। মহারাষ্ট্রগণ লুণ্ঠনাভিলাষে সময়ে সময়ে দলবল সহ বঙ্গদেশে আগমন করিত। এই দস্যুদল (উহাদিগকে দস্যুনামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না) বঙ্গভূমে সময়ে সময়ে ধুমকেতুবৎ হটাৎ উদয় হইয়া দেশকে বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত তাহা ভারতেতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। উহারা বাঙ্গালায় "বর্গি" নামে অভিহিত হইত। উহাদিগের বিষয় বঙ্গীয় ইতিহাস পাঠকদিগের কথা দূরে থাক এমন কি বঙ্গদেশীয় অপঠিত জন সাধারণেরও রমণীগণেরও অজ্ঞাত নাই। বর্গিদিগের সম্বন্ধে একটি সাধারণ প্রচলিত বাক্য অদ্যাপিও বঙ্গীয় আবাল বৃদ্ধ ও বনিতাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অধিক কি বঙ্গীয় রমণীগণ শিশুদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য উহা অদ্যাবধিও ব্যাবহার করিয়া থাকেন:—

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুল বর্গি এলো দেশে।
টে পাকিতে ধান খেয়েচে খাজনা দেবো কিসে।"

টে পাকির পরিবর্ত্তে কেহ কেহ "বুববুলি" এবং কেহ বা "চটাপাকি" প্রভৃতি বলিয়া থাকে।

(5) "When the English first settled at Calcutta the little body of merchants instead of offering themselves on the West side of the river as all other Europeans had done before and since, determined on a very small spot of rising ground on the East side—If I remember right, their reasons for this choice were that it was situated near to several populous villages, filled with cloth maufacturers whom they wished to engage in their service that they should be free from the invasions of the maharattas, who in those days were very troublesome to those settled on the Westside of the river; that the anchorage for their ships was very good and near to the place on which they proposed to erect a little fort and the ground itself did not cost them much money." *Vide some Observations and Remarks on a late Publication Entitled Travels in Europe Asia and Africa—by J. Price.*

মৃচ্ছকটিক।

(অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি কথার শেষ।)

নাটক এবং প্রকরণে কি ভেদ তাহা বলা হইল। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আজকাল বাঙ্গালার যে সকল পুস্তক নাটক নামে প্রকাশিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই প্রকরণ। বঙ্গীয় নব্য কুলাবতংশ ৺দিনবন্ধু মিত্রই বাঙ্গালায় এইরূপ প্রকরণের প্রথম প্রবর্ত্তায়িতা। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে নাট্যের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয় না। দীনবন্ধুবাবুর হস্তেই বাঙ্গালা প্রকরণের উৎকর্ষ লাভ হয়। আজকাল নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক অনেকগুলি প্রকরণ প্রচারিত হইয়াছে বটে কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর প্রকরণগুলিকে কেহ ছাপিয়ে উঠিতে পারে নাই।

যাহাহৌক নাটক এবং প্রকরণের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য আছে এক্ষণে সেই আলোচনাতেই আমরা প্রবৃত্ত। নাটক এবং প্রকরণ এই উভয়েরই পাঁচটি সন্ধি সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিক রূপে থাকা চাই। মৃচ্ছকটিকে পাঁচটি সন্ধিই আছে এবং তাহারা কোথায় কিভাবে আছে তাহা দেখান হইল। তাহার পর "নানারস নিরন্তরম্" নাটক এবং প্রকরণ উভয়েই অবিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলি রস থাকিবে। মৃচ্ছকটিকে হাস্য, কারুণ ভয়ানক শান্ত এবং আদিম এই কয়টি রস অবিচ্ছিন্ন ভাবেই অবস্থিত। মৈত্রেয়ের কথায় হাস্য, চারুদত্তের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে করুণ, দ্যূতকারের কলহ ও হস্তি সম্ভ্রম আদিস্থলে ভয়ানক, দ্যূতকারের সন্ন্যাস গ্রহণে শান্ত এবং আদিম রসত ইহার অঙ্গী।

"পঞ্চাদিকা দশপরা স্তত্রাঙ্কা ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" নাটক এবং প্রকরণ এই উভয়েই পাঁচ হইতে দশ অবধি অঙ্ক থাকিবে। বেণীসংহার নাটকে ছয়টি অঙ্ক আছে, অভিজ্ঞান শকুন্তলে ৭টি অঙ্ক আছে আর আমাদের আলোচ্য মৃচ্ছকটিক প্রকরণে দশটি অঙ্ক আছে। আজকাল বাঙ্গালায় যেরূপ নাটকের ছড়াছড়ি তাহাতে অঙ্ক বুঝেনা এরূপ লোক অতি বিরল, কারণ আজকাল কার বাঙ্গালা নাটকগুলিতে আর কিছু থাক আর না থাক অঙ্ক গর্ভাঙ্কের অভাব নাই। তবে আমরা যখন সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি তখন সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অঙ্কের যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে এস্থলে তাহার উল্লেখ বোধ হয় অন্যায্য স্থানাপহরণ হইবে না।

অঙ্ক শব্দের অর্থ অবশ্য পরিচ্ছেদ বলিতে হইবে কারণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে উহার কোন পরিভাষা করা হয় নাই,

কেবল অঙ্কের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। যথা

প্রতি অঙ্কেই নায়কের চরিত প্রত্যক্ষ হইবে এবং রস বা ভাব উজ্জ্বল ভাবে প্রস্ফুরিত হইবে। এক একটি অঙ্কে নায়ক চরিত্রের সম্পূরক এক একটি অবান্তর কার্য্যের শেষ করা হইবে এবং সকল অঙ্কেরই গল্পের মূলের সহিত কিছু কিছু সম্বন্ধ রাখা হইবে। এক একটি অঙ্কে নানা কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে না এবং শেষ অঙ্কের শেষ ব্যতীত আর কোন অঙ্কে বীজের সংহার করা হইবে না। নাটকের কোন অঙ্কে অনেকগুলি করিয়া পদ থাকিবে না। আর আবশ্যক অর্থাৎ অবশ্য বর্ণনীয় কার্য্যগুলির বিরোধ থাকিবে না। সকল অঙ্কেই নায়কের সামীপ্য থাকিবে এবং তিন চারজনের অধিক অভিনেতার কার্য্য থাকিবে না। এক একটি অঙ্কে দুইতিন দিনের কার্য্য বর্ণিত হইবে না যে কোন এক দিনের কার্য্য বর্ণিত হইবে। নাটকের অঙ্কে দূর হইতে ডাকা, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যাদি লুট, বিবাহ, ভোজন, সাপদান, মৃত্যু, রতি, কোনরূপ লজ্জাকর কার্য্য, শয়ন, অধরপান, নগরাদির আক্রম, স্নান এবং গাত্রে গন্ধ দ্রব্যের লেপন এইরূপ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান হইবে না। এক একটী অঙ্ক অনাবশ্যক দীর্ঘ হইবে না এবং সকল অঙ্কের শেষেই অভিনেতৃগণ নিষ্ক্রমণ করিবে।

কোন একটা গল্প নাগাড় অর্থাৎ এক নিশ্বাসে বলিলে রস হয় না বক্তার ও মুখ ব্যথা, শ্রোতারও বিরক্তি। এই নিমিত্ত মাঝে মাঝে এক একটা ছেদ দেওয়া উচিত। নাট্য কাব্যের ঐ ছেদের নাম অঙ্ক। সেই অঙ্ক গুলি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা উপরে বলা হইল। আজ কাল বাঙ্গালা নাটকে গর্ভাঙ্ক বলিয়া একটা কথার ব্যবহার দেখা যায়। ঐরূপ গর্ভাঙ্ক সংস্কৃতানুযায়ী নহে। উহা একটি সম্পূর্ণ বিলাতী বস্তু। গর্ভাঙ্ক এই কথাটি সংস্কৃত আছে বটে কিন্তু তাহার অর্থ অন্য রূপ কোন এক নাটকের মধ্যে কোন এক অঙ্কে যদি অপর এক খানি আনুষঙ্গিক নাটকের অভিনয় দেখান হয় তবে তাহার নাম গর্ভাঙ্ক।

প্রস্তাবনা, বিষ্কম্ভ, প্রবেশক, জনান্তিক আকাশ অপাবার্য্য প্রভৃতি কতক গুলি কথার ব্যবহার হয়। আমাদের এ সমালোচ-নায় সেই গুলির কোন আবশ্যক হইবে না এ স্থলে তাহা পরিত্যক্ত হইল। আবশ্যক হইলে, যেখানে যাহার আবশ্যক হইবে সেই স্থানে তাহার বিষয় বলা হইবে।

এতদ্ভিন্ন নাকটাদিতে পতাকা স্থান বলিয়া একটা কৌশল দেখান হয়। কোন এক বিষয়ের চিন্তার পর কোন একটা ছল দ্বারা অন্য এক বিষয়ের ঘটনার নাম পতাকা স্থান। যেমন মৃচ্ছকটিকে চেট যখন রাত্রে বসন্তসেনা গচ্ছিত অলঙ্কার গুলি লইয়া মৈত্রের হস্তে দিয়া বলিল মৈত্রেয় এই অলঙ্কার গুলি ধারণ কর ইহা রাত্রে তোমার কাছে থাকিবার কথা তাহা শুনিয়া মৈত্রেয় বলিল হায় উজ্জয়িনীতে কি চোর নাই। আজিও এই গুলো চুরি করিয়া লইল না। যদিও মৈত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নয় যে অলঙ্কার চুরি হইলেই ভাল হইত। তিনি

তামাসা করিয়া এবং অদৃষ্টের উপর উপহাস করিয়া ঐ কথা গুলি বলিয়াছেন মাত্র কিন্তু ঐ কথার ছল ধরিয়াই যেন ঐ রাত্রে চোরে আসিয়া অলঙ্কার গুলি চুর করে। উহা একটি পতাকা স্থান।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

বনের পাখী।

কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা এক পার্ব্বতীয়া দুঃখিনী রমনীর শিশু পুত্রকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে বালকের হৃদয়ে শৈশবস্মৃতি জাগরুক হইত এবং সেই পার্ব্বতীয় পর্ণ-কুটীরে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত।

১

সুন্দর ভবন মম, আনন্দ আলয়,
সুরম্য হর্ম্মেতে চারু চিত্র শোভা পায়,
শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি, সুদৃশ্য আসন,
মণিময় হেমদীপ, বিচিত্র বসন,
সকলি তোমার বাছা, কেন তবে তুমি
ছাড়িয়া যাইতে চাহ এ সুখের ভূমি!
গহন বেষ্টিত হিম শৈল শৃঙ্গপরে
পর্ণের কুটীর তব আবৃত আঁধারে,
ভল্লুক শার্দ্দূল যথা নির্ভয়ে সঞ্চারে,
প্রেত-যোনি নানা রঙ্গে যথা কেলি করে,
নাহি দৃষ্টি হয় যথা মনুষ্যের বাস
সে স্থানে যাইতে, বাছা! কেন কর আশ!

২

না দেবী! সেথায় আছে শ্যামল প্রান্তর,
নব দূর্ব্বাদল মাঝে খেলে রবি-কর,
বসন্তের আগমনে মম ভ্রাতৃগণ
বনফুল লয়ে খেলে, সহাস্য বদন,
মধু-আশে আসে যবে মক্ষিকার কুল,
ফুলগুলি ঢাকি, সবে করে গো আকুল;
নব পল্লবিত তরু, কোমল লতিকা,
চারু শৈল অঙ্গে শোভে কুসুম কলিকা,
সুখের স্বপন সেই বাল্য-ক্রীড়া ভূমি,
ছেড়ে দাও মোরে, দেবী! যাই তথা আমি।

৩

এইত এসেছি বাছা! প্রমোদ-উদ্যানে,
নন্দন কানন শোভা বিরাজে এখানে;
বারেক নয়ন তুলি দেখ এই দিকে
ফুটে আছে কত ফুল স্তবকে স্তবকে;
আমরি গোলাব উটি, উদ্যান-ঈশ্বরী!
খেলিছে মলয় সনে মৃদুহাস্য করি;
গন্ধবহ গন্ধহরি পরান মাতায়,
তরু লতা মাথা নাড়ি কত কথা কয়;
অই শুন বাজে বাঁশী প্রমোদ-মন্দিরে,
বাঁশীরব বড় ভাল লাগে যে রে তোরে!
অই শুন করে পাখী মধুর কাকলি,
মোহন ঝঙ্কারে মন প্রাণ গেল ভুলি;
নাহিক সঙ্গীত সেথা যথা তব বাস,
সে স্থানে যাইতে বাছা, কেন কর আশ।

৪

না দেবি! প্রদোষে যবে পশ্চিম গগণ
অস্তমিত রবি-করে রক্তিম বরণ,
সহকার মূলে বসি জননী আমার

শিশু কোলে লয়ে, প্রাণে আনন্দ অপার,
করেন সঙ্গীত সেথা, কাঁপে বনস্থলী,
বন দেবী আশীষেণ প্রতিধ্বনি তুলি ;
তেমন মধুর গীত কভু শুনি নাই,
বিহগ কূজনে দেবি ! সুখ নাহি পাই ;
কোমল সঙ্গীত পূর্ণ বাল্য ক্রীড়াভূমি !
ছেড়ে দাও মোরে দেবি! যাই তথা আমি!

৫

শুন বাছা, বুকে লয়ে শিশু সুকুমার,
দুঃখের সংসার ত্যজি জননী তোমার
গিয়াছেন দেব ভূমে, চিরানন্দ যথা,
জরা, মৃত্যু, বিচ্ছেদ প্রবেশে নাহি তথা।
যে ভূমি অঙ্কিত তাঁর চরণ পরশে
এবে তুমি নাহি পার যাইতে সে দেশে ;
সে সঙ্গীত তব কর্ণে পশিবে না আর,
নীরব হয়েছে বীণা ছিঁড়ে গেছে তার !
জননীর স্নেহ নাই যথা তব বাস,
সেস্থানে যাইতে বাছা কেন কর আশ।

৬

নাহি কি সেথায় দেবী ! জননী আমার
সেথা কি সুন্দর শিশু হাসেনা গো আর ?
কিন্তু মম ভ্রাতৃগণ আছে ত সেখানে,
বন ফুল তোলে সবে আনন্দিত মনে ;
যবে হাসে পূর্ণ শশী সুনীল অম্বরে,
নেচে নেচে যায় সবে নির্ঝরিণী তীরে,
ভাসায় প্রমোদ ভেলা তটিনী উপরে,
চাঁদিনী জড়িত উর্ম্মি সহ খেলা করে;
প্রকৃতির চিত্র-পট বাল্য-ক্রীড়া ভূমি !
ছেড়ে দাও মোরে দেবী ! যাই তথা আমি

৭

না বাছা ! সোদর তব নাহিক তথায়,
না জানি কুটীর ছাড়ি গিয়াছে কোথায় ;
দারুণ সংসার জ্বালা হৃদয়ে পশেছে,
শৈশবের সুখ স্বপ্ন সব ভেঙ্গে গেছে !
ভগ্ন প্রাণ, ম্লান মুখ দরিদ্রের বেশে,
অর্থ আশে কষ্ট করি, ফেরে দেশে দেশে ;
ফুল তুলি নাহি খেলে হরিত-প্রান্তরে,
কেহ নাহি যায় এবে নির্ঝরিণী তীরে ;
সুপ্রসন্ন ভাগ্য তব হেথা তব বাস
সেস্থানে যাইতে বাছা করোনা কো আশ।

৮

তবে কি নীরব এবে সাধের কুটীর !
শূন্য-প্রাণে শৈল পরে ফেলে আঁখিনীর !
কিন্তু দেবী ! আছে সেথা সুকণ্ঠ বিহঙ্গ,
কুটীর প্রাঙ্গনে এসে করে কত রঙ্গ ;
বিচিত্র বর্ণের পাখা প্রজাপতি কুল,
রবি করে খেলা করে হইয়া আকুল ;
উচ্চ গ্রীব ক্ষিপ্রগতি প্রশান্ত নয়ন,
নির্ভয়ে প্রান্তরে মৃগ করে বিচরণ ;
উল্লাসে তটিনী নাচে তরঙ্গে তরঙ্গে,
সমীর অধীর হয়ে খেলে তার সঙ্গে ;
প্রকৃতির লীলাস্থল বাল্য ক্রীড়া ভূমি !
ছেড়েদাও মোরেদেবী ! যাই তথা আমি।

ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

মনুষ্যসমাজের শৈশবাবস্থা হইতে ধর্ম্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। হিন্দুললনাগণ ধর্ম্মের জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আজকাল উনবিংশশতাব্দীর আলোক প্রাপ্ত ভারতীয় যুবক করিতে পারেন কি সন্দেহ। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য। অধুনা নিরীশ্বরবাদী, সন্দেহবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, জড়বাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদী পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তক সমূহ পাঠ করিয়া ভারতীয় যুবক ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। এরূপ সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ পণ্ডিত অনেকে আছেন যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মূর্খ ও অর্ব্বাচিনের কার্য্য মনে করেন, কিন্তু বোধ হয় এমন কোন পণ্ডিত নাই যিনি ধর্ম্মালোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিবেচনা করেন। অনেক সন্দেহবাদী দার্পণিকগন ঈশ্বর বিশ্বাসী না হইয়াও জগতের কল্যানের জন্য ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। জগৎ হইতে ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইলে মানবসমাজ স্থায়ী হইবে কি না সন্দেহ। এরূপ সংঘটন হইলে জগতে যে নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিবে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। জগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে যখন মনুষ্যসমাজে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তখন মানবজাতির নানা প্রকার দুর্গতি ঘটিয়াছিল। ধর্ম্ম যে মানবের এক মাত্র সহায় তাহা ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুপুরুষদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। জগতের সাধু ও মহাজনেরা ধর্ম্মের জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যদি ধর্ম্মের কোন মহিমা না থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা কখনও জীবন বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইতেন না। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক তিনি কখনও আপনাকে একাকী মনে করেন না, তিনি সতত ভাবেন যে তাঁহার পার্শ্বে স্বয়ং বিশ্বপতি বিরাজ করিতেছেন। যখন ধর্ম্মবীর মহাত্মা মহম্মদ শত্রুদিগকে অজেয় মনে করিয়া তাঁহার এক অনুচরের সহিত পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন, তখন দূরে শত্রুদিগের সৈন্যরাশি দেখিয়া মহম্মদের অনুচর বলিলেন, প্রভো, আমরা একাকী রহিয়াছি, আমাদের কি উপায় হইবে। তাহাতে মহম্মদ প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায় বলিলেন, তুমি নিতান্ত মূর্খ, তুমি কি জান না যে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পার্শ্বে রহিয়াছেন, তিনি যখন আমাদের সহায়, তখন আমাদের কোনও ভয় নাই। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে যাঁহারা ধর্ম্মকে জীবনের সর্ব্বস্বধন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কখনও আপনাদের

কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলেন না এবং সর্ব্বদা মানবজাতির কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন। অন্ততঃ জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির নিমিত্ত ধর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধহইতেছে।

জগতের কোন জাতি কোন প্রকার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া সভ্যতা ও জ্ঞানের উচ্চ সোপানে অধিরোহন করিতে সমর্থ হয় নাই। জগতের ইতিহাস পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে ধর্ম্ম ব্যতিত কোন জাতি সম্পূর্ণরূপে উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মই হউক, মুসলমান; ধর্ম্মই হউক, হিন্দুধর্ম্মই হউক, বৌদ্ধধর্ম্মই হউক, আর ব্রাহ্মধর্ম্মই হউক, একপ্রকার ধর্ম্ম নিয়ম জগতের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা জানি না জগতে এমন কোন জাতির অভ্যুদয় কোন কালে হইয়াছিল কি না যে জাতি কোন প্রকার ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাসী ছিল না। মানবের মনে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত না হইলে তিনি কখনই জগতের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইতেন না। ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া যাঁহারা জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে কাহার পাষাণ হৃদয় না গলিয়া যায়? সন্দেহবাদী ও জড়বাদী নাস্তিক পণ্ডিতগণ যতই কেন চেষ্টা করুণ না ধর্ম্ম কখনই জগৎ হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে না। যত দিন জগতের স্থায়িত্ব থাকিবে তত দিন ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে না। ধর্ম্ম ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি কখনও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই এবং কখনও করিতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম যে কেবল সত্য গ্রহণে আমাদেব সহায় তাহা নয়, ধর্ম্ম আমাদেব সকল কার্য্যের সহায়। গ্যালিলিও যদি ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাসী না হইতেন তাহা হইলে তিনি সূর্য্য যে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে না এই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার কবিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এইরূপ আমরা যত এবিষয়ে চিন্তা করি ততই ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়তর হইয়াউঠে। আমরা হিতোপদেশ কর্ত্তার সহিত বলি—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মে নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেন সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

ধর্ম্মই আমাদের এক মাত্র সুহৃৎ, যে ধর্ম্ম মরিলেও আমাদের অনুগমন করে, অন্য সকল বস্তু শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ভারতে এই মহাসত্য এক কালে প্রচারিত হইয়াছিল এবং যে ভারত প্রাচীন জগতের মধ্যে পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল, কি আক্ষেপের বিষয় আজ কিনা সেই ভারতে ধর্ম্মের সেই আদর ও সেই গৌরব দেখিতে পাই না। ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় ব্যাপার হইতে পারে? এরূপ কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা ধর্ম্মে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিতে কহিতেছি কিংবা শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য

বলিতেছি। স্পষ্টতঃ বলিতে কি আমরা শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, কিংবা পরের মুখে শুনিয়া আপনার যুক্তিও বিবেকের চালনা না করিয়া কোন প্রকার মত গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমরা বলি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করা সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করি। যিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন তিনি কখনই কিছু অভাব বোধ করেন না। ঈশ্বর যাঁহার সহায় তাঁহার আবার কিসের অভাব।

ধর্ম্মনিয়মে অবিচলিত আস্থা ভিন্ন মানবের চরিত্র সংঘটীত হইতে পারে না। এই সংসারে চরিত্রবান লোকের মূল্য কত। আমরা প্রতিদিন সংসারের প্রতিকূল-স্রোতের মধ্যে পতিত হইতেছি। কার সাধ্য যে আমাদের মনকে সুস্থির রাখে। চারিদিকে প্রলোভন সকল আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যাঁহারা বিশ্বাস চক্ষে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্ম-নিয়মোপরি অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, তাঁহারা সংসারের চঞ্চল, অস্থির, প্রতিকূল প্রলোভন সমূহ ঘটনা বলির মধ্যে বাস করিয়া, বিশ্বাস, সাহস ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে ধারণ করিতেছেন এবং প্রাণপণে ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে চরিত্রবান পুরুষ ব্যতীত বিশেষ দৃঢ়তার সহিত কখনও ধর্ম্মনিয়ম অবলম্বন করিতে পারেন না। চরিত্রবান পুরুষ ব্যতীত এই সংসারের প্রতিকূলস্রোত সকলের মধ্যে থাকিয়া কখনই আপনাকে সুস্থির রাখিতে সমর্থ হন না। সুতরাং মানবের সুস্থিরতার জন্য মানবের সুখ ও সম্ভোগের জন্য. মানবের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য, এবং মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস ব্যতীত মানবের মনে বলসঞ্চার হয় না এবং মনে বলসঞ্চার না হইলে মনুষ্য কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। জগতের ইতিহাস এক বাক্যে বলিতেছে যে ধর্ম্ম ব্যতীত মানব সমাজে কোন প্রকার কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে না। ধর্ম্মবীর রাজা রামমোহন রায় সেই বলে তির্ব্বতদেশ পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় নানা প্রকার প্রতিদ্বন্দিতা সত্বেও পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল তথাপি তিতি ভীত হইলেন না এবং হয়ত তীর্ব্বতদেশীয় রমনীগণ সবিশেষ চেষ্টা না করিলে, তাঁহার অমূল্য জীবন তথায় নষ্ট হইত। ধর্ম্মের বলের নিকট কোন প্রকার বলের তুলনা হয় না। ধর্ম্মবলেই মনুষ্য বলীয়ান হয়। ধর্ম্মই মনুষ্যকে সকল সৎকার্য্যে সাহস দেয়। ধর্ম্মই মানবের

মনে প্রতিজ্ঞার বল দেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যকে সত্য নির্ণয়ের উপযুক্ত করে। ধর্ম্মই মনুষ্যের চরিত্র সংঘটন করে। ধর্ম্মই মানবের মনে আত্মশাসন শক্তি আনিয়া দেয়। ধর্ম্মই মানবের দুর্ব্বল প্রকৃতিকে জাগ্রত করিয়া তুলে। ধর্ম্মই মনুষ্যের দুর্ব্বল অন্তরে সাহস ও বল দেয়। ধর্ম্মই আমাদের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করিয়া আমাদের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ধর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্ম যে মনুষ্যের ঐহিক মঙ্গলের জন্য আবশ্যক তাহা সন্দেহবাদী ঈশ্বরের অবিশ্বাসী পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকে না। জনষ্টুয়ার্ট মিল বলেন:—

"To speak first, then, of religious belief as an instrument of social good. We must commence by drawing a distinction most commonly overlooked. It is usual to credit religion *as such* with the whole of the power inherent in any system of moral duties inculcateh by education and enforced by opinion. Undoubtedly mankind would be in a deplorable state if no principles of justice, veracity, beneficence, were taught publicly or privately, and if these vitues were not encouraged, and the opposite vices repressed, by the praise and blame, the favourable and unfavourable sentiments of mankind. And since nearly everything of this fort which does take place, in the name of religion; since about all who are taught any morality whatever, have it taught to them *as* religion, and incalcated on them through life principally in that character; the effect which the teaching produces as teaching, it is supposed to produce as religious teaching, and religion receives the credit of all the influence in human affairs which belongs to any generally accepted system of rules for the guidance and Government of human life."

পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে মনুষ্য সমাজ কখনও টিকিতে পারে না। ধর্ম্মই মানবের সমাজ সংঘটন করিয়া দিয়াছে। ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজে এত উচ্ছৃঙ্খলতা ও গোলোযোগ উপস্থিত হইবে যে তাহাতে সুচারুভাবে সমাজের কার্য্য কখনও চলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় মানবজাতি পশু ও নিকৃষ্ট জীব জন্তুসমূহ অপেক্ষা কোন প্রকারে ভাল হইতে পারেনা। ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন এবং সেই বুদ্ধিদ্বারা আমরা নির্ণয় করিয়াছি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁহার নিয়ম। জগতের প্রারম্ভ হইতে মানবজাতি ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছে। যাহা এত কালের

সমুদায় জগতের বিশ্বাস তাহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস বলা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় বোধ হয় যে কোন ভ্রান্তমত এতদিন অটল ভাবে থাকিতে পারে না। জগতের সমুদায় চিন্তা জগতের সমুদায় সাহিত্যেও জগতের সমুদায় ভাষা ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও মানবজাতির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সংস্থাপন করিতেছে। ইহা সত্বেও যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মের কোন আবশ্যকতা নাই তাঁহাদিগকে আর কি বলিব। তাঁহারা বড় দাম্ভিক ও সাহসী। তাঁহারা সাহিত্য ও ইতিহাসের অবমাননা করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, অসার যুক্তি ও দাম্ভিকতার পরিচয় দিতেছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ কবি কাউপার লিখিয়াছেন:—

"So man, the moth, is not afraid, it seems,
To span omnipotence, and measure might,
That knows no measure, by the scanty rule
And standard of his own, that is today
And is not ere tomorrow's sun go down.
The Lord of all, himself through all diffused
Sustains and is the life of all that lives.
Nature is but a name for an effect,
Whose cause is God."

পোপও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন;—

All are but parts of one tremendous whole,
Whose body nature is, and God, the Soul."

অনেকে হয়ত বলিবেন যে ধর্ম্ম আবার কি, ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম হইল, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন আবশ্যক নাই। আমরা বলি ধর্ম্ম এবং নীতি এক গ্রন্থিতে বদ্ধ। ধর্ম্ম নীতি হইতে বিভিন্ন হইবার নয়, এবং নীতিও ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হইবার নয়। যদি সকলে জানে যে ধর্ম্ম নাই, এবং নীতি ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন তাহা হইলে বোধ হয় পোপের আনারও অধিক মনুষ্য পাপ, কুরীতি ও দুর্নীতির পঙ্কিল গর্ত্তে নিমগ্ন হইবে। ধর্ম্ম আমাদিগকে অনেক কুকার্য্যে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। ধর্ম্ম শিথীল হইলে নীতিও যে শিথীল হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারেনা। যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হ্রাস হইয়াছিল, সে সমাজ হইতে নীতিও বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। অধুনা অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে নীতি কখনই ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হইতে পারেনা। নীতিকে যদি ধর্ম্ম হইতে পৃথক কর, তাহা হইলে যে সমাজ দুর্নীতিজালে জড়িত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। জগতের ইতিহাস পাঠে জানা গিয়াছে যে যখন মনুষ্য সমাজে ধর্ম্মভাব শিথীল হইয়া আসিয়াছিল তখন পাপ, অধর্ম্ম ও দুর্নীতি অপ্রতিহত ভাবে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। ইহা কেবল আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য নয়, কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের মনে এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। ধর্ম্মকে জগৎ হইতে লুপ্ত করিয়া দাও, দেখিবে চারিদিকে পাপ, অসত্য, অন্যায়, অধর্ম্ম, কুরীতি ও দুর্নীতি কলুষিত পূতিগন্ধ বিস্তার করিয়া পৃথিবীকে মানবের বসবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিবে। ধর্ম্মের প্রতি এত আঘাত হইতেছে তথাপি ধর্ম্ম অপ্রতি-

হতভাবে মানবের হৃদয়ে রাজ্য বিস্তার করিতেছে। কারসাধ্য যে ধর্ম্মকে জগৎ হইতে বিলুপ্ত করে? ধর্ম্ম কখনই জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

যাঁহারা ধর্ম্মে আস্থাবান নহেন, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখেন না। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারেন না। তাঁহারা যে কোন বিষয়ে অটল বিশ্বাস রাখিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। ঈশ্বর নাই যদি এই শিক্ষা জগতে প্রচারিত হয় তাহা হইলে মনুষ্যের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না। জগতের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত বিদ্যালোক হইতে বঞ্চিত। যদি তাহাদিগকে বলা যায় যে ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বর নাই, মনুষ্য তাহার কার্য্যের জন্য দোষী নহে, তাহা হইলে যে সমাজে নানা-প্রকার গোলোযোগ ঘটিবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি সহজেই অনুমান করিতে পারেন। অতএব হে সন্দেহবাদী নিরীশ্বরবাদী পণ্ডিতগণ! যদি তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারা এই বিস্তীর্ণ জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দেখিতে না পাও তবে তোমরা নিতান্ত অদূরদর্শী। তোমরা ইহা দেখিতেছ যে জগতের ঐহিক কল্যাণের জন্য ধর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক, তবে কেন বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য বিষয় নির্ণয় করিতে যাইতেছ। ঈশ্বর আছেন এরূপ প্রমাণ তোমরা পাওনা, কিন্তু ঈশ্বর নাই এ প্রমাণ কোথায় পাইলে। তোমরা তোমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা অসীম অপার অগম্য অনন্ত মহান্ পরাৎপর পরমব্রহ্মের বিষয় নির্ণয় করিতে যাইতেছ। বৃথা চেষ্টা তোমাদের, তোমাদের প্রলাপ বাক্যে জগৎ কখই সন্তুষ্ট হইবে না। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ইহা আমাদের মনে জন্মাইবার পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত লক্ বলেন—"the existence of a god is the most obvious truth that reason descerns." যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী-নন তাঁহাদিগের বিশ্বাস নিতান্ত ক্ষীণ বলিতে হইবেক। অনেকে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। লক্ বলেনঃ—Those are not at all to be tolerated who deny the being of God. Promises, convenants and oaths, which are the bonds of human society, can have no hold upon an atheist. The taking away of god, though but even in thought dissolves all."

ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব যাঁহারা ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে চাহেন তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে পরমেশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য আপনাদের মনকে প্রস্তুত করুণ। জগতের ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুগণ আপনাদের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের উজ্জ্বল বিশ্বাসে আপনাদিগকে মহাবলী মনে করিয়া ঘোর অসংসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য আমাদের

দেশের শিক্ষিতমণ্ডলী সাতিশয় ব্যস্ত। আমরাও সে মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করি। তবে আমরা এইমাত্র বলি যে ধর্ম্মকে সকল কার্য্যের সহায় কর। যদি দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে চাও তবে ধর্ম্মকে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে দাও। সমাজ সংস্কারই বলুন, আর নৈতিক সংস্কারই বলুন, আর রাজনৈতিক সংস্কারই বলুন, সকল প্রকার সংস্কারই ধর্ম্মের উপেক্ষা করে। তাই বলি জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনের জন্য ধর্ম্ম অত্যাবশুক। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসিন্য দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতে হয়। প্রায় সকলেই মিলের চ্যালা ও কোমতের শিষ্য হইয়া উঠিয়াছেন। কি আক্ষেপের বিষয় যে দেশের মহর্ষিগণ প্রাচীন জগতে ধর্ম্মের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, আজ কি না সেই আর্য্য মহাপুরুষগণের সন্তান সন্ততি ধর্ম্মের প্রতি একেবারে ঔদাসিন্য, এমন কি ধর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহারা আলাপ করেন তাঁহাদিগকে মূর্খ ও বাতুল মনে করিতেও কুণ্ঠিত হন না! ইহা অপেক্ষা আর কি আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে? প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি এইসকল দুঃখের বিষময় ছবি দেখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। একদিবস আমি মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে ছিলাম; তৎকালে আমার একজন পরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করায় কোন ফল নাই। ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থপুঞ্জের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই মানবের মন পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অতুলনীয় ক্ষমতা, অসীম শক্তি, অপূর্ব্ব কৌশল, মহান ভাব, অনন্ত জ্ঞান, নিরপেক্ষ বিচার ও অপার করুণার বিকাশ দর্শনে বিমোহিত এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয় ও প্রাণ প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন যে বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ নয় অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য তাঁহারা বিষম ভ্রান্ত ও অপরিণামদর্শী। বস্তুতঃ আমাদের বিবেচনায় বোধ হয় প্রকৃত বিজ্ঞান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির অপার মহিমা বিস্তার করিতেছে। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের অভূত পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অজ্ঞাত পূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য দেখিয়া প্রকৃত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের হৃদয় বিশ্ব স্রষ্টার পবিত্র প্রেমানন্দে পুলকিত হইতেছে। বাস্তবিক বলিতে কি প্রকৃত বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানবের মন পরমেশ্বরের অনন্ত ও অপার মহিমা অতি সহজে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লর্ড বেকন বলেন "A little philosophy recline man's mind to atheism, but the depth of philosophy bringeth his mind towards religion." সর্ব্বদেশীয় কবি ও দার্শনিকগণ সামান্য সৃষ্ট পদার্থ হইতে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র সত্তা অনুভব ও মঙ্গল জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া আপনাদিগকে পরম সুখি না মনে করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বাস্তবিকই সামান্য সৃষ্ট

পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ও কৌশল, জ্ঞান ও বুদ্ধি, দয়া ও ক্ষমতা যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমুদায় জগৎ তাঁহার সৃষ্টি কৌশল প্রকাশ করিতেছে। হে স্বল্প বুদ্ধি মানব! বৃথা পণ্ডিতাভিমানে স্ফীত হইয়া যদি নিজের অজ্ঞানতার তিমির ভেদ করিতে না পার তবে কেন সদর্পে প্রচার করিতেছ যে ঈশ্বর নাই? অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া তুমি আপনার তুচ্ছ ক্ষুদ্র জ্ঞানের-দ্বারা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত অপার অগম্য অনন্ত, অতীন্দ্রিয় মহান্ পরাৎপর পরম-ব্রহ্মকে নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ঈশ্বর নাই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ! প্রাচীনকালের আথেন্সদেশের দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস আপনার অজ্ঞা-নতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই আজি পর্য্যন্ত তিনি মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যিনি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি কখনই ঈশ্বরে অবিচলিত আস্থা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের স্বল্পবুদ্ধিতে এইরূর বোধ হয় যে বিজ্ঞানের আলোচনা ও বুদ্ধির পরিচালনা ঈশ্বরালোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে কোন বস্তু পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুমিত হয়। বর্ত্ত-মান সময়ের ইংলণ্ডের মহাকবি টেনিসন এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"Flower in the crannied wall
I pluck you out of the *crannies*
Hold you here in my hand,
Little flower, root and ali ;
And if I could understand
What you are, roots and all and all in all
I should know what God and man is."

বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে যে সামান্য একটী ক্ষুদ্র পুষ্পের দ্বারা ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা ও বিচিত্র কার্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা বলেন যে বিজ্ঞান বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় না তাঁহাদের তুল্য অন্ধ, ভ্রান্ত ও হতভাগ্য আর কেহই নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার।

রাজা বাহাদুর।

(উপন্যাস।)

একটা ষাট্ বৎসরের বুড়া একটী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীর সহিত পাইকপাড়ার একটী মুদির দোকানের নিকট কথা কহিতেছে। বয়সে বুড় কথায় দড় পরণে যুব? ভাব ভঙ্গিতে রসরাজ। কথায় কথায় হাসিতেছে চক্ষু জ্বলিতেছে—মুদির প্রাণ পুড়িতেছে। মুদি খরিদারদের সিকি পয়সার নুন আধ পয়সার তৈল সেই যুবতীর দিকে তাকাইয়া দিতেছে— কেহ জিতিতেছে—কেহ ঠকিতেছে। উহার মধ্যে একজন বয়বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এক পয়সার

বাতাসা লইতে আসিয়াছিল, সে বাতাসা অতি কম হইয়াছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল 'ছিরে! এক পয়সার কি এই কখানা বাতাসা? তুই খরিদারদের জিনিস দিবি না ওদের দিকে তাকাইয়া থাক্‌বি? "ছিরু বাতাসার দিকে তাকাইয়া অপ্রস্তুত—একপয়সায় ছয় সাত খান মাত্র বাতাসা দিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাতাসা দিয়া ছিরু খরিদারকে বিদায় দিল। এখন আবার যে ছিরু সেই ছিরু। যাইবার সময় কেবল রমণীটী বৃদ্ধটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া যাইল "মিন্‌সের চার কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গার দিকে পা করেছেন তবু রস কমে নি—ওমা এমন বেহায়া ও দেখিনে" এই বলিয়া চলিয়া যাইল। বুড়া কিছু অপ্রস্তুত হইল। যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "যাবি ত" যুবতী উত্তর করিল "তা আর যাব না—কিন্তু ভাই আমার বড় পয়সার টানাটানি হইয়াছে—টাকা কটা কবে দেবে'—'তা হবে—'তা হবে'—এই বলিতে বলিতে বুড়া চলিয়া যাইল। যুবতী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, যেন কোথায় যাইবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। ছিরু এত ক্ষণ গলা হাকড়াইতে ছিল তাহাতে কিছু হইল না দেখিয়া 'ও ভাল মানুষের মেয়ে এত রৌদ্রে কোথায় যাইবে একটু বসিয়া যাও', বলিয়া ডাকিল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। এবার যুবতী মুদির দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল মুদিও তাহার প্রত্যুত্তর দিল। রমণী ধীরে ধীরে মুদির দোকানে প্রবেশ করিল। ছিরু স্বর্গ হাতে পাইল।

রমণী সুন্দরী—রূপবতী—যুবতী। এক জন সুন্দরী তাহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই রূপবতী বলিবে তবে মুখ খানি তেমন 'মেয়লি' নয় বলিয়া একটু নিন্দা ও করিবে; যাহাই হউক ছিরুর দোকানে এরূপ রূপবতী কখন পদার্পণ করে নাই আজি ছিরুর দোকানে শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।

যুবতী অঞ্চল হইতে একটী পয়সা খুলিয়া মুদিকে এক পয়সার বাতাসা দিতে বলিল মুদি কতক গুলি একটা ঠোঙ্গায় বাতাসা দিয়া বলিল পয়সা আর তোমাকে দিতে হইবে না রমণী কিছুতেই তাহা শুনিল না পয়সাটী মুদির হাতে দিয়া অত বাতাসা আমার প্রয়োজন নাই বলিয়া দুই চারি খানি বাতাসা তাহা হইতে গ্রহণ করিল। মুদি জল আনিয়া বলিল 'কিছু খাবার আনিয়া দিই—দোকান অধিক দূরে নয়—এই খানেই'। রমণী বলিল 'না'।

রমণী জল পান করিয়া মুদিকে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল রাম বাবুর বাড়ী চাকুরি করিব মনে করিতেছি। তুমি কি বল? ছিরু কিছু বিস্মিত হইল। রমণী উপহাস করিতেছে—কি সত্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। ছিরু জিজ্ঞাসা করিল 'কি রামধন মুখুজ্জের বাড়ী?' রমণী উত্তর করিল 'হাঁ!'

রামধন বাবু কি 'ঝি' রাখিবেন জানি না, কখন ত রাখেন নাই এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি"

যু। 'আমি সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি না। বলি লোকটী কেমন?

ছিরু। 'খুব সৎ, পঞ্চাশ টাকার জিনিস আমি তাঁহাকে ধারে বেচিতে পারি—তা

তিনি আমার নিকট কখন কিছু সওদা করেন না। একটি পয়সার জিনিস ক্রয় করিতে হইলে বড় বাজার হইতে নগদ ক্রয় করিয়া আনেন।"

যু। 'আমি তা' জিজ্ঞাসা করিতেছি না কথা শেষ হইতে না হইতে ছিরু বলিয়া উঠিল বুঝিছি বুঝিছি—তা সে গুড়ে বালী- সোনাগাছির কত দালাল আসিয়া তাঁহার নিকট হারি মানিয়াছে। স্বর্ণবাই কত চেষ্টা করিয়াছে।" শেষ রমণীর দিকে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিল 'তা ভাই তুমি যে উপায় করেছ তা বড় মন্দ নয়। দেক্তে ও বেশ, বয়স কাঁচা, পারিলে ও পারিতে পার আর কিছু যদি না হয় ছেলেটাকেও হাত করিতে পারিবে' এই বলিয়া ছিরু একটু দুঃখিত হইল রমণী তাহা বুঝিতে পারিল। ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল 'রাম' বাবুর বাড়ীতে আমি থাকিলে তোমার সহিত রোজ দেখা করিব।

ছিরু। আমার অদৃষ্টে কি তা হবে ?— রামবাবু ঠিক নয়টায় আপিস যায়। আপিস যাইবার সময় মাঝের দরজায় চাবি দিয়া যান। আফিস থেকে ঠিক ছয়টায় বাড়ী ফেরেন বাড়ী গিয়া নিজে চাবি খোলেন। তার বাড়ীতে দুই জন দরোয়ান্। তবে ছেলেটা কিছু বয়াটে। কুলুপের একটা চাবি গড়িয়েছে তাইতে সে আনাগোনা করে।

যু। "টাকা পায় কোথায় ?

ছি। 'চাকুরি করে। ছোড়াটা বেশ পাশ টাশ করেচে। উকিলের বাড়ী বেরু- চ্ছিল। পয়সার টানে শেষ আফিসে চাকুরী করিতেছে। বাপের কাছ থেকে ত এক পয়সা ও পাইবার জো নাই।"

যু। 'মার কাছ থেকে ত পেতে পার্ত্তি।

ছি। 'মা পয়সা পাবে কোথায়। বুড়া তেমন লোক নহে। স্বয়ং সমস্ত খরচ করে। মাগীর ঠেঙ্গে একটি পয়সাও দেয় না। বুড়া বলে নাকি মেয়ে মানুষের কাছে পয়সা রাখিলে স্ত্রীলোক খারাপ হইয়া যায়। তা তাতে তোমার কিছু ভাবনা নাই। ছোঁড়াও দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। তবে— দাঁওটা—হবে কিনা বলিতে—পারি না।"

যু। "কথাটা কি জান ভাই যে বাড়ীতে চাকুরী করিব সে বাড়ীটি না জানিয়া কিরূপ করিয়া চাকুরী করিব।"

ছি। "বুঝিছি বুঝিছি। তুমি যত বোকা আমায় ঠাওরাইয়াছ আমি তত বোকা নহি তুমি রামবাবুর মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করি- তেছ। লোকে বলে মেয়েটি ডানা কাটা পরী। বয়স পনের বৎসর। তার স্বামী কিছু উপায় করিতে পার্ত্ত না বলে রামবাবু তাকে বের কিছু দিন পরেই তাড়িয়া দিয়াছেন।" কিন্তু আমি মেয়েটিকে ভাই চক্ষে দেখিনি শুনেছি—বেশ সুন্দর—বয়েস আঠার উনিশ হবে—প্রায়ই তিনটা চারিটার সময় রামবাবুর বাড়ীর দিকে যায়। আমি তার দুই তিন দিন পেছু নিয়ে ছিলুম। রামবাবুর বাড়ীর খড়খড়ীর দিকে সে কেবল চাহিতে চাহিতে যায়, কিন্তু মেয়েটাকে একবার ও দেখিনি; একবার দেক্তে তারে বড় ইচ্ছা করে। তা—তুমি কি তবে—বল না—আমায় বলিতে দোষ কি ?—আমি ত কার ও কাছে বলিতে যাইতেছি না।"

যু। "আমার বয়েস দেখিয়া ও কি বুঝিতে পারিতেছ না?—এ কাজ কি এখন আমার সাজে?"

ছিরু আরো অপ্রতিভ হইল। মনে মনে ভাবিল তবে কি সত্য সত্যই রামবাবুর বাড়ীতে চাকুরাণী বৃত্তি করিবে। শেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষ বলিল "আমার কাছে কেন থাক না?"—এই রূপ নানা কথা পরস্পর হইতে লাগিল। শেষ রামবাবুকে ছিরু রাস্তায় দেখিয়া যুবতীকে বলিল "ছয়টা বাজিয়াছে—রাম বাবু আফিস্ থেকে বাড়ী যাইতেছেন। সুন্দরী যুবতী রামবাবুর প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন। রামবাবুর নজর দোষ নাই সুতরাং যুবতীকে দেখিতে পাইলেন না।

যুবতী দেখিল রামবাবু সবল কায় শ্যাম বর্ণ পুরুষ। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হইবে। চুল গুলি অর্দ্ধেক পাকিয়াছে। পরিধান রেলির উনপঞ্চাশ, সাদা লাংক্লথের সাদা গড়নের জামা, মলমলের লম্বা চাদর। পায়ে ঠনঠনের চটী। চটী ও পায়ের অর্দ্ধাংশ ধূলায় ধূসরিত। চলিতেছেন আর চটির ধুলা মাথায় উঠিতেছে। রাম বাবু ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের অংশীদার ও কেশিয়ার। রমণী ঈষৎ হাসিয়া ছিরুকে সম্বোধন করিয়া বলিল "রাম বাবু তোমার তবে ঘড়ী—দেখিতে পাইতেছি" ছিরু উত্তর করিল উহাকে দেখিয়া আমরা নয়টা ও ছয়টা বাজিয়াছে জানিতে পারি" রমণী ছিরুর দিকে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া ও ঈষৎ হাসিয়া তবে, এখন আসি ভাই বলিয়া ছিরুর নিকট বিদায় লইল। ছিরু রমণীর পদক্ষেপ দেখিতে লাগিল। রমণী রামবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ও কিঃক্ষণ মধ্যেই ছিরুর দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন।

রাম বাবু ঠিক ছয়টা পাঁচ মিনিটে ফটকে পৌঁছিলেন। তার পর আঁকের দরজায় চাবি খুলিলেন। দরজা খুলিবার ঘড় ঘড় আওয়াজ বাড়ীর ভিতর পৌঁছিল। রাম বাবুর পরিবার ও কন্যা সসব্যস্ত হইলেন।

রাম বাবু উপরে যাইয়া তাঁহার কন্যা সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুশীলা! উপেন কোথায়? সে এখন বাড়ী আসে নাই?" সুশীলা উত্তর করিল এই আসে বলে'

রাম। 'এই না তুমি সে দিন বলিয়াছিলে তোমার দাদা এখন ভাল হইয়াছে—আজ রাত্রে কি সে বাড়ী আস্‌বে? "এই কথা না বলিতে বলিতে উপেন আসিয়া উপস্থিত হইল। রামবাবু উপেনকে দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না। কেবল সুশীলাকে বলিলেন "মা তোমার পশম আনিতে আজ ভুলিয়া গিয়াছি।" উপেন ও সুশীলা কিছু বিস্মিত হইল। তাহাদিগের মা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে ও তাহারা এ কথা জানাইল। তাহাদিগের জননী ইহাতে কিছু ভীত হইল। ভীত ও বিস্মিত হইবার কারণ কখন কোন জিনিস আনিব বলিয়া রাম বাবু আনিতে পারেন নাই এরূপ কখন তাহার জীবনে ঘটে নাই। আজ এরূপ হইল কেন? নিশ্চয়ই তাঁহার কিছু হইয়া থাকিবে। রাম বাবুর স্ত্রী রাম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অসুখ করিয়াছে কি?" রাম বাবু বলিলেন 'না'—কিছু হয় নাই এই

বলিয়া তিনি মুখ হাত পা ধুইতে যাইলেন। 'মা' ভাই ও ভগ্নী তিন জনে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল। উপেন বলিল 'আজ নিশ্চয়ই কিছু হইয়া থাকিবে। সুশীলা বলিল" আমার ও তাই বোধ হয়, দেখিলে না পিতার মুখ আজ মলিন'। জননী কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পাড়ার শ্যাম উকিল, বেনি তেজারত, মহিন দলপতি প্রভৃতি পাশার খেড় বা তাসের কাৎ আসিয়া ক্রমে রাম বাবুকে—ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বাহিরের ঘরের সেজ জ্বালা হইল। ঘরটী বেশ সাজান। অল্প পয়সায় আর কেহ এরূপ গৃহ ফিট ফাট রাখিতে পারে কি না সন্দেহ। ঘরের ছবি—ইলাষ্ট্রেট লণ্ডন নিউজের ক্রিষ্টমাসের উপহার বা তাহা হইতে গৃহীত, ইহা ব্যতীত ইংরাজী ঔষধালয়ের, লোন হাউসের, লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সিট এলমানেক ছবিরূপে গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। ঘরযোড়া পাটাতন—পাটাতন যোড়া সতরঞ্চ ও চাদর; পদ-লাঙ্গুলবিশিষ্ট সুদীর্ঘ ব্যাঘ্রচর্ম্ম চাদরের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে, ভল্লুকের চর্ম্ম পাপোশ। গৃহের এক পাশে একটি ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের ভিতর দাবা পাশা তাস প্রভৃতি বিরাজিত। রামবাবু জনকয়েক প্রতিবাসির সহিত প্রত্যেক শনিবার রাত্র দশটা পর্য্যন্ত ক্রীড়া কৌতুক করেন। আজ শনিবার; খেলোয়াড়, কাৎ প্রভৃতি সকলেই ক্রমে ক্রমে একে একে উপস্থিত। কেহ পাশা কেহ তাস কেহ দাবা বাহির করিলেন। ভাবে বোধ হইল রামবাবুর আহারের শেষ পর্য্যন্ত আর কেহ অপেক্ষা করিবেন না। ক্রীড়ার আয়োজন হইতেছে এমন সময়ে এক মস্ত জুড়ি রামবাবুর গেটে লাগিল। জুড়ি হইতে রাজা বাহাদুর নামিলেন। রাজা বাহাদুরের নাম রাজা রতনলাল সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস, আই। ইনি বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ, আমাদিগের রামবাবু কেসিয়ার। রাজা বাহাদুর গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে রামবাবুর পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। রামবাবুর পাঠগৃহটি ঠিক বৈঠকখানার পাশে। পাঠ-গৃহের আসবাবের ভিতর তিনটি গ্ল্যাসকেস। একটি গ্ল্যাসকেসে শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতিতে সুশোভিত। আর দুইটিতে চক্‌চকে ইংরাজি পুস্তকে পরিপূর্ণ। ছবির মধ্যে একখানি ওয়াটালু যুদ্ধ আর একখানি 'ক্রিমিয়ান ওয়ার'। একটি টেবিল ও চারিখানি চেয়ার, তাহার মধ্যে একখানি ইজি চেয়ার। রাজাবাহাদুর ইজি চেয়ারে কিছু ব্যস্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রামবাবুর নিকট সম্বাদ যাইল। রামবাবুর তখন অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে, রাজাবাহাদুর আসিয়াছেন শুনিয়া আর তিনি খাইলেন না—তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রামবাবুর স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ী করিতে লাগিলেন। রামবাবু তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। পরস্পর দুইজনে চুপি চুপি কি কথা হইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ বড় অধিকক্ষণ হইল না। ক্রমে উচ্চস্বরে—আরো উচ্চস্বরে আরম্ভ হইল। পাশের ঘরের লোকেরা বিস্ময়ে দরজার

কাছে আসিয়া ক্রমে ক্রমে একে একে সকলে আসিয়া দাঁড়াইল। রামবাবু ক্রন্দন স্বরে রাজাবাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"রাজা বাহাদুর, আমাকে এ বিষয়ে একটু ইসারা করিয়া বলিলে বোধ হয় আপনার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না।"

রাজা। "কেন?—ইতিপূর্ব্বে একথা কি তোমায় বলা হয় নাই—আর তুমি কি কিছুই জান না?"

রাম। "বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমি কিছুই জানি না।"

রাজা। "এখনও ভয়ের কারণ ভত দেখিতেছি না যদি তুমি—"

কথা আর শুনা যাইল না।

রাম। "আমার দ্বারা তাহা হইবে না" —"কখনই নয়—কখনই নয়—প্রাণ থাকিতে পারিব না।"

রাজা। "আপনার ভালর জন্যই আমি বলিতেছি—আপনার সে অভ্যাস এখনও যাইল না।—স্থির হইয়া শুনুন—স্থির হইয়া বুঝুন।" তাহার পর আবার দুইজনে পরস্পর চুপি চুপি কথা হইতে লাগিল, শেষ বাতুলের ন্যায় রামবাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বুঝিয়াছি—ভিক্ষা আমার পরিণাম।"

রাজা। "জালিয়াত—শঠ—প্রবঞ্চক ইহা অপেক্ষা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারে।" রামবাবুর পুত্র দরজার পাশ হইতে শুনিতে ছিলেন। তাহার পিতাকে বাড়ীতে বসিয়া একজন শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া যাইবে ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইল না। সে সজোরে কবাটে ধাক্কা মারিতে লাগিল। কবাট-অর্গলে আবদ্ধ ছিল। অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। —বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের ভাব গতিক দেখিয়া রামবাবু কাতরস্বরে বলিলেন! তুমিও কি পাগল হইলে? অন্যান্য সকলে পিছু পিছু ধরিতে যাইয়াছিল তাঁহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমার অভাগিনী জননী ও ভগ্নীর জন্য—তোমার জন্য এখনও পর্য্যন্ত তোমার পিতাকে পুলিষের হস্তে সমর্পণ করি নাই। এখনও পলাইতে বল। এখনও পলাইলে পলাইতে পারে—পলাইয়া বাঁচিতে পারে; কিন্তু নিরুদ্দেশ হইতে হইবে। নিরুদ্দেশ ভিন্ন তোমার পিতার গতি নাই" এই বলিয়া তিনি গৃহের বাহিরে আসিলেন ও "সুশীলা সুশীলা" বলিয়া উচ্চস্বরে রামবাবুর কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন। সুশীলা নিচে নামিয়া আসিয়া কবাটের আড়াল হইতে "আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিল। রাজাবাহাদুর জামার পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া সুশীলার নিকট সজোরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "সুশীলা! তোমার পিতাকে এই নোটগুলি দিয়া তাঁহাকে তুমি সরিয়া যাইতে বল, নতুবা পুলিষের হাতে তাঁহার নিস্তার নাই।" এই বলিয়া রাজাবাহাদুর লম্ফদিয়া গাড়িতে উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। গেট্ বন্ধ করিতে প্রতিবেশিরা আজ্ঞা দিল।

রামবাবুর স্ত্রী দুর্গামণী রাজাবাহাদুরের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। চক্ষু

দিয়া জল পড়িতেছিল। সুশীলা আপনি অঞ্চল দিয়া মাতার চক্ষুজল মুছাইয়া বলিল "মা! তুমিও বিশ্বাস করিলে? পুলিষে যাইতে হইবে এরূপ কাজ কি পিতা কখন করিতে পারেন? রাজাবাহাদুর নিজে কিছু করে নিশ্চয়ই পিতার নামে দোষ দিয়েছেন" এই বলিয়া সুশীলা তাহার পিতার নিকট দৌড়িয়া যাইল। রামবাবু বাড়ীর ভিতর যাইতে ছিলেন, সুশীলাকে আর বড় অধিক দূর ছুটিয়া আসিতে হইল না, সুশীলা পিতাকে কাতরস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিল "কি হয়েছে বাবা, বলনা—বাবা কি হয়েছে? দুর্গামণীও সুশীলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রামবাবু দুর্গামণীর চক্ষুর জল দেখিয়া আপন চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, রামবাবু কাঁন্দিয়া ফেলিলেন। মনোবেগ সম্বরণ করিয়া দুর্গামণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "টাকার জন্য সংসারকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি। টাকার জন্য—বড়মানুষ হইব বলিয়া তোমাদিগকে ভাল করিয়া খাইতে পরিতে দিই নাই এখন সে টাকা কোথায়? টাকা দূরের কথা বোধ হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইতে হইবে।"

দুর্গামণী—"কি করিলে এখন বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায়—বল না—বলনা—পাড়ায় দশজন ভদ্রলোক আছেন তাদের সকলেই প্রায় এখানে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে যথেষ্ট ভাল বাসেন। বলনা এখন কি করিলে রক্ষা পাও?—মা কালী রক্ষা করিবেন—হরি রক্ষা করিবেন ভাবনা কি?

রাম—"টাকা, টাকা" টাকা ভিন্ন এখন রক্ষা নাই।

দুর্গামণী—আমার সমস্ত গহণা বেচিলে কি হইবে না।

সুশীলা—আমার গহণা।

উ—আমার দুই সহস্র মুদ্রা ও আমার বন্ধুর সহস্র—

রামবাবু উপেনের কথা শুনিয়া একটু সন্তুষ্ট হইলেন—প্রাণে একটু আশা হইল, উপেন ভাল হইয়াছে, টাকা জমাইয়াছে, তাহার অবর্ত্তমানে এখন সে সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে ও করিতে পারে কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিমর্ষ হইলেন। দুর্গামণিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমার ও সুশীলার সমস্ত গহনা, উপেন ও উপেনের বন্ধুর টাকা, আমার সমস্ত ও আমার প্রতিবেশিদিগের সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিলে বোধ হয় এ মহা-সমুদ্রের এক কণা বালি মাত্র হইবে। অধিক আর আমি কিছু বলিতে চাহি না জানিও আজি হইতে তোমরা পথের ভিখারী আর আমি—" রামবাবু আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। চক্ষে জল আসিল। রাম-বাবু এ কথা গুলি কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে বলিয়া ছিলেন। বাহিরের লোকেরা এ কথা গুলি সমস্তই শুনিতে পাইয়া ছিল। তাহাদিগের মস্তকে যেন বজ্র পড়িল। সকলেই বাড়ীর ভিতর ছুটিলেন। যাহার মুখে যাহা আসিল তাহা বলিয়া রামবাবুকে গালাগালি দিতে লাগিল। বেণী তেজারৎ বলিল "সেদিন আপনাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিলাম তাহা আপনি কি করিলেন?" শ্যাম উকিল বলিল" আমার যথা সর্ব্বস্ব আপনার হস্তে,

আমাকে পথে বসাইওনা।" মহিন দলপতি বলিলেন, "আজ চার্দিন হইল কেষ্টাকে জাতে তুলিয়া যে টাকা পাইয়াছিলাম তাহা সমস্তই আপনার নিকট রাখিয়া ছিলাম তাহা কোথায় ?" রামবাবু চুপ করিয়া রহিলেন পরিশেষে বলিলেন 'সমস্তই গিয়াছে পাইবার আর কোন আশা নাই।" পাওনা-দারেরা তাহা শুনিবে কেন ? রামবাবুর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিতে লাগিল ওরামবাবু প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিলেন, মুখে কথাটী নাই ; মাঝে মাঝে যখন বড়ই অসহ্য হইতে লাগিল তখন কেবল বলিতে লাগিলেন "বলুন--- বলুন, হরি বলিবার দিন দিয়াছেন বলিবেন না ? আপনারাই আবার একদিন হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়ছেন।" বেণী তেজারৎ এই কথায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমরা কি জানিতাম আপনি এই টাকা ব্যবসায় ফেলিয়াছেন।" রামবাবু বলিলেন "তাহা জানিবেন কেন ? আপনারা জানিতেন আমার বড় জমিদারী আছে সেই জমিদারীর আয় হইতে আপনাদিগকে শত করা পঁচিশ ত্রিশ টাকা এই পঁচিশ বৎসর শুদ দিয়া আসিতেছি। আজি এই সন্ধ্যার সময় কেবল খেলিতে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে আপনাদিগের টাকা আমি আপিসের কাজে ফেলিয়াছিলাম। কাহাকে দুষিব, পৃথিবীর গতিই এই। আজ যদি আপনাদিগের আমি বলিতাম যে আপনাদিগের টাকা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে যদি চাহেন তাহা হইলে পাইতে পারেন তাহা হইলে বোধ হয় দ্বিগুণ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন না টাকা ও চাহিতেন না হৃষ্ট মনে বাড়ী চলিয়া যাইতেন। টাকা খেলাইতে আমি ভাল জানি এই বিশ্বাসে আপনারা আমার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন আমি গচ্ছিত রাখিতে বলি নাই। খেলাতে হারিয়াছি, পড়তা খারাপ, এখন আমি চোর।

এমন সময় দোবে বাড়ির ভিতর আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিড়ে ভীত স্বরে বলিল "হুজুর, পুলিষ বাড়ী ঘিরিয়াছে ! তাহারা বাড়ীর ভিতর আসিবার চেষ্টা করিতেছে। এল বলে—এল বলে।" উপেন বলিল "দ্বার খুলিয়া দিও না হাজার ডাকিলেও খুলিওনা। ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে দাও।" আর আর সকলে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামধন বাবু বাতুলের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "পুলিষ আসিয়াছে ভালই হইয়াছে—আমাকে ধরিতে দাও। যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহার সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভাবিয়াছি—অনেক রাত্র নিদ্রা যাই নাই—কেবলই ভাবিয়াছি কিসে রক্ষা পাইব। শেষ যাহা হইবার তাহা হইল। এত দিন পরে আজ আমি সুখে নিদ্রা যাইব" এই বলিয়া স্বয়ং পুলিষের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। প্রতিবেশি বন্ধু বান্ধব সকলেই রাম বাবুর কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। পাওনা দারেরা পাওনার কথা ভুলিয়া যাইল—তাহারা সকলেই দুঃখিত হইল। মহিন দলপতি বলিল 'আপনার কি বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পাইল ? পুলিষের হস্তে আত্ম সমর্পণ--পুলিষের আসামী—বন্দী হইয়া চোর ডাকাইতের সহচর হইবার বাসনা ?—এ মতি আপনার কেন হইল ?' রাম বাবু বাতুলের ন্যায় ঘাড়

নাড়িতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন "পড়তা খারাপ—সোনা মুটা ধরিলে ছাই মুটা হইবে—উপেন ফটক খুলিয়া দাও—তুমি না খুলিলে আমি স্বয়ং খুলিব—পুলিষকে আমায় ধরিতে দাও।"

শ্যাম উকিল বলিল "তোমার পরিবারবর্গের কি দশা হইবে তাহা কি একবার ভাবিতেছ না।?

রাম। "পুলিষের ও আদালতের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইলেই কি আমরা নিস্কৃতি পাইব? জগৎ আমাদিগকে কি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না?"

রাম বাবুর কথা শুনিয়া দুর্গামণির চক্ষে জল আসিল—কাতর স্বরে বলিল।'দিন বন্ধু অনাথনাথ—আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

সুশীলা পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলার পিতা অতি ক্ষীণ স্বরে সুশীলাকে বলিলেন "মা! কেন আর আমাকে কাঁদিয়া কাঁদাইতেছ। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে—কাঁদিলে কি হইবে আর বল মা?"

সুশী। "পুলিষের হাতে যাইতে তোমাকে দিব না—পলাইয়া যাও—পলাইয়া যাও?"

রাম—'সুশীলা তুমি নিশ্চয়ই পাগল, পুলিষ কি আর পলাইবার পথ রাখিয়াছে, যখন উহারা আসিয়াছে তখন পথ ঘাট বাঁধিয়াই আসিয়াছে স্থির জানিও?" উপেন বলিল "সুশীলার ঘরের জানালা দিয়া পালাইবার বেশ উপায় আছে। সুশীলার ঘরের জানালা দিয়া ঠিক বোসেদের বাহিরের উঠানে নামা যায়"।

রাম বাবু—সুশীলার ঘর দ্বিতলায়?

উপেন----"দ্বিতলায় হইলেই বা—তাহাতে কি আসিয়া যাইতেছে এই বলিয়া পিতার হাত ধরিয়া সুশীলার শয়ন গৃহে টানিয়া লইয়া যাইল ও সুশীলার নিকট খান কয়েক কাপড় চাহিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উপেন জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুর্গামনির এখন একটু সাহস হইল, বলিতে লাগিলেন "হরি রক্ষা করিবে হরি রক্ষা করিবে।"

রাম। "তবে কি পলায়ন এখন সিদ্ধান্ত কিন্তু জেল অপেক্ষা যে ইহাতে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে যাইতেছি তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছনা?"

উপেন। "এখন ও সব কথা যা'ক—আপনি কোথায় থাকিবেন কোথায় যাইলে আমরা আপনার সহিত মিলিতে পারিব?"

রাম। "কিরূপ করিয়া বলি।"

বেনি তেজারৎ বলিল—'নয়টার রেল এটা যেন স্মরণ থাকে।'

শ্যাম উকিল বলিল—"রেলে যাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু আমার নিকট কিঞ্চিৎ আছে এই বলিয়া পকেট হইতে একশত টাকার খুচরা নোট্ বাহির করিল। দুর্গামনি নিষেধ করিয়া বলিল "আমাদিগের নিকট টাকা আছে" এই বলিয়া রাজা বাহাদুর যে নোটের তোড়াটী দিয়া গিয়াছিল সেই তোড়া দিতে যাইল।

রাম বাবু সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন বাহাদুরের টাকা লইয়া পুলিষের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা পুলিষের হস্তে শতবার আত্ম সমর্পণ করা শ্রেয়। উপেন! বাহাদুরের টাকা যত শীঘ্র পার ফিরাইয়া দিও। ক্ষুধানলে মরিয়া যাইলেও তোমরা রাজা

বাহাদুরের দ্বারে উপনীত হইও না। এমন সময় যেন গেট ভাঙ্গার আওয়াজ হইল। বাস্তবিক পুলিষ ভিতরে প্রবেশ করিল। শ্যামাচরণ উকিল ছুটিয়া বাহিরে যাইল। উপেন কাপড়কয়খানিকে তাড়াতাড়ি বাঁধিয়া লম্বমান করিল, তাহার পর বোসেদের উঠানে কেহআছে কি না দেখিল, শেষ বলিল "শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন পুলিষ আসিয়া পঁহুছিল বলিয়া, উহাদের উঠানে কেহ নাই।

রাম। তোমাদের কি হইবে?

উপেন। "ভয় কি বাবা! আমি বড় হইয়াছি মা কিম্বা সুশীলার জন্য অপনাকে ভাবিতে হইবে না।

রাম। "উপেন, সুশীলা, আমি তোমাদিগের পিতার যোগ্য নহি। আমাকে আর বাবা বলিয়া সম্বোধন করিও না। তোমাদিগকে চিরকাল কষ্ট দিয়াছি, শুদ্ধ তাহা নহে আজ তোমাদিগকে পথের কাঙ্গাল করিয়া আমি সচ্ছন্দে পলাইয়া যাইতেছি। না—পলাইব না—পুলিষকে ধরিতে দাও।"

উপেন। "এস বাবা—এস—আর দেরি করিও না। শীঘ্র এস—শীঘ্র এস।"

রাম। উপেন! বাবা আমার যে পা সরিতেছে না। এরূপ অবস্থায় তোমাদিগকে কিরূপ করিয়া রাখিয়া যাই। কি বলিয়া তোমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব? "আসি"—আর কি ফিরিয়া আসিব? পুলিষের হস্ত হইতে কি পলাইয়া রক্ষা পাইব! তবে কিসের জন্য এসব আয়োজন?" এই কথা শেষ হইতে না হইতে উপেন আর কোন কথা না শুনিয়া তাহার পিতার কোমরে কাপড়ের শেষভাগ বাঁধিয়া ধীরে ধীরে জানালা হইতে নামাইয়া দিল। রাম বাবু নিচে নামিয়া উপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বোধ হয় তোমরা আমাকে দোষী ভাবিতেছ কিন্তু বাস্তবিক আমি তত-দোষী নহি। আমি ঠকিয়াছি আমাকে ঠকাইয়াছে। সত্য প্রচার হইবেই হইবে। ততদিন কি আমি বাঁচিয়া থাকিব? " এই বলিয়া কোমরের গেরো খুলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইলেন।

দ্বার কেহই খুলিল না। পুলিস দ্বার ভাঙ্গিয়া ঢুকিল। শ্যামবাবু তখন বাহিরে পঁহুছিয়া ছিলেন। শ্যামবাবুকে দেখিয়া ডেঃ কমিসনর জিজ্ঞাসা করিলেন "রামধন মুখোপাধ্যায় কোথায়?"

শ্যাম। "তিনি বাড়ী নাই।" পুলিষ কিছু আশ্চর্য্য হইল—সহজেই বুঝিল দ্বার বন্ধ করিবার কারণ একটু সময় লইবার জন্য। যাহাই হউক ডেপুটি কমিসনর বুঝিলেন আসামি পলাতক। ক্রমে অনেক লোক বাড়ীতে জমিয়া গেল। ডেঃ কমিসনর মহাশয় সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "আপনারা সকলে বোধ হয় আসামিকে পলাইতে সাহায্য করিয়াছেন।" সকলে নিস্তব্ধ।

ডেঃ কমি। নিস্তব্ধতাই ইহার প্রমাণ দিতেছে। তা বেশ—এখন কোন্ রাস্তা দিয়া পলাইয়াছেন? সকলে নিরুত্তর।

ডেঃ কমি। "তাঁর পুত্র কোথায়? তথাপি নিরুত্তর। প্রকৃত পক্ষে প্রতিবেশিরা যদিও উহার মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন কিন্তু তাহারা কিরূপ করিয়া রামবাবু পলাইয়ছেন বা উপেন কোথায়

এ সকল কিছুই জানেন না। ডেঃ কমিসনার শেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহার লোকদিগকে আলো লইয়া আসিতে বলিলেন ও তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। সকলে একেবারে উপরে যাইলেন। প্রথমেই সুশীলার ঘরে। সুশীলার ঘরটী বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া ডেঃ কমিসনার বলিলেন "এইখান দিয়া পলাইয়াছেন" এ কথাটী আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত ষোড়ষী রূপসী রমণীর ন্যায় একটী লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন। আরো বলিলেন "বাজে খবর কতকগুলা না আনিয়া যদি পলাইবার রাস্তাগুলা ঠিক করিয়া আসিতে পারিতে তাহা হইলে একটা কাজ হইত।" লোকটী কিছুই উত্তর করিল না। কেবল মাথা চুলকাইতে লাগিল।

পরিশেষে ডেপুটি কমিসনর মহাশয়, দারগা ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে থানা তল্লাসি করিতে বলিলেন ও উপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পিতার টাকা কড়ি কোথায় থাকিত?

উপেন—"তাঁহার শুইবার ঘরের লোহার সিন্ধুকে।

ডেঃ ক। "সিন্ধুকের চাবি?"

উপেন। "পিতার নিকট। তিনি ইহার চাবি কাহারো নিকট রাখিতেন না।"

ডেঃ ক। "শীঘ্র একটা কামার ডাকাইয়া পাঠাও।" শীঘ্রই কামার আসিয়া উপস্থিত হইল। সিন্ধুক ও ভাঙ্গা হইল। সিন্ধুক হইতে কেবল সব বাজে কাগজ বাহির হইতে লাগিল। চাল ডালের ফর্দ্দ, কাপড় কেনার ফর্দ্দ এইরূপ অনেক ফর্দ্দ বাহির হইতে লাগিল। ইত্যবসরে উপেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতার অপরাধ কি এখনও জানি না" ডেঃ কমিসনার হাসিয়া বলিলেন embezzlement. তফিল ভাঙ্গিয়াছেন।

উপেন—অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছেন কি?

ডেঃ কমি—"অল্প হইলে আমি আসিতাম না, ইনিস্পেক্টর আসিত। চুরির দাবি হইত।"

উপেন—যদি অল্প হয় মার ও আমার ভগ্নীর গহনা বেচিয়া ও আমার যা কিছু আছে সমস্ত দিয়া পরিশোধ করি।"

ডেঃ কমি।—ষোল লাক্ টাকা দিতে পারিবে কি?

উপেন ডেঃ কমিসনারের কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। উপেন সহজেই বুঝিল এ সমস্তই রাজাবাহাদুরের কাজ। একজন সামান্য কেসিয়ারের হাত হইতে ষোল লাক্ টাকা চলিয়া যাইল তাহার কেহ খোজ রাখিল না—হইতে পারে না। শেষ উপেন কাতর স্বরে কমিসনরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?"

ডেঃ কমি।—বিশ্বাস না করিয়া করি কি? জোয়াতে এক রাত্রে বিশ ক্রোর টাকা উড়াইতে পারে।

উপেন—"পিতা জুয়া খেলিতে জানিতেন না। আর যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন আমি বলিতে পারি পিতার ন্যায় হিসাবি লোক প্রায় দেখিতে পাইবেন না। আমার কথায় না বিশ্বাস হয় আপনি যাহাকে হউক এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন?

ডেঃ কমি। জিজ্ঞাসা কবিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এখন ও বালক, পৃথিবীতে প্রবেশ কর নাই। এইটী স্থির জানিও হিসাবি লোকের দ্বারা লোক যত ঠকে এমন আর কাহারো দ্বারা ঠকে না।" এই বলিয়া হতাশ হইয়া কাগজ গুলি ঘাঁটকাইতে লাগিলেন। শেষ বিরক্ত হইয়া কোলক্কা

উঠিয়া আসিবেন মনে করিতেছেন এমন সময় একটা কাগজের বাণ্ডিল দেখিতে পাইলেন। বাণ্ডীলটী খুলিলেন। খুলিবা মাত্র একখানি হ্যামিলটনের বাড়ীর বিল বাহির হইল। পঞ্চ সহস্র মুদ্রার একজোড়া বালা, দশ সহস্র মুদ্রার দশটী আংটী, অষ্ট সহস্র মুদ্রার এক জোড়া ইয়ারিং ও বিশ সহস্র মুদ্রার গৃহ সাজাইবার উপকরণ। আর এক খানি চারি সহস্র মুদ্রার বিলরি দাসের এক জোড়া কাশ্মিরী শাল দশ সহস্র মুদ্রার এক ছড়া মুক্তার মালা এই সর্ব্ব সমেত একান্ন হাজার টাকার বিল কিছু দিন হইল পরিশোধ হইয়াছে।

ডেঃ। কমিশনর হাসিয়া তখন উপেনকে বলিলেন "এ সব তবে কি ?"

উপেন বিল দুখানি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ডেঃ কমি। "এই না তুমি বলিতেছিলে তোমার পিতার ন্যায় সাধু সচ্চরিত্র ও হিসাবী লোক জগতে অতি বিরল ? এসব জিনিস গুলি আমি একবার দেখিতে চাই তোমার মার নিকট হইতে লইয়া এস।"

উপেন—"মার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে হইবে না এ সব জিনিষ আমরা চক্ষে দেখি নাই---বোধ হয় একথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না ?"

ডেঃ কমি। "আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করিয়া এস।" উপেন মূহুর্ত্ত মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল এ সব জিনিষ আমাদিগের গৃহে নাই।"

ডেঃ কমি। 'এখন বুঝিতে পারিলে ? উপেন—'না'।

ডেঃ। সব জিনিষেরই বাহির ও ভিতর আছে। জিনিষ মাত্রই ভিতর জানিবার উপায় আছে, কেবল মানুষের জানিবার উপায় নাই। বাহির সুন্দর—সুন্দর অতি সুন্দর। আনিতেছে খাইতেছে বেশ দিন গুজরান্ করিতেছে। ভিতর জানিবার উপায় নাই কেহ জানিতে চাহেও না, কারণ ভিতর জানিতে চাওয়া বড় দোষ। তোমার পিতা বেশ আনিতে-ছিলেন, বেশ দিন গুজরান্ করিতে ছিলেন। দশজন-লোক বেশ চিনিত বেশ বিশ্বাস করিত কিন্তু তাঁহার কার্য্য-দেখ। এই বিল দুই খানি যদি আজ সিন্দুক হইতে বাহির না হইত তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করে। নয়টায় আপিসে যাইতেন পাঁচটায় আসিতেন। বাড়ী হইতে আর বাহির হইতেন না। আপিসে কাজের ভিড় পড়িলে কেবল দুই একদিন আপিসে রাত কাটাইতেন নিমন্ত্রণ হইলে কদাচ কখন রাত্রে বাড়ীর বাহির হইতেন মোটা কাপড় পরিধান করিতেন গেরোস্ত আনা চালে চলিতেন। কাহারও পাঁচে নাই কাহারও সাতেও নাই।

উপেন—'তাঁহার চরিত্রের উপর কি আপনার সন্দেহ হয়।

ডেঃ। খুব সন্দেহ হয়। তিনটায় ছুটি, বাড়ী আসিতেন পাঁচটায়। দুই ঘণ্টা কোথায় থাকিতেন ? কাজের ভিড় একটা অছিলা মাত্র, নিমন্ত্রণ হইলে পাথরে পাঁচ-কিল। এসব গহণা এসব আস্‌বাব কোথায় যাইল ? এ রহস্যের ভিতর স্ত্রীলোক আছে তাহার কোন ভুল নাই।'

দুর্গামণি এই কথা শুনিয়া গৃহ হইতে বলিলেন "যে যাহা স্বামীকে বলিতে পারেন বলুন কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের উপর দোষ দিবেন না।"

ডেঃ কমিসনর ইহাতে কিছু অপ্রতিভ হইলেন ও বলিলেন "আমাদগের কাজ বড় খারাপ, মন্দ ভাগটা আমরা প্রথম দেখি। যাহাই হউক দুই দিন পর সমস্তই জানা যাইবে। এই বলিয়া তাঁহা[illegible]লে চলিয়া গেলেন প্রতিবেশিরাও আপন আপন গৃহে ফিরিয়া আসিল।

ক্রমশঃ।